প্রথম পাঠ

মহাশ্বেতা দেবী

অমৃতধারা
৮, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ২০শে আষাঢ়, ১৩৬৯। জুলাই, ১৯৬২
প্রকাশক : নিতাই দাস। অমৃতধারা। ৮, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯
মুদ্রাকর : তারক পাল।
দি সরস্বতী প্রেস। ১৪, চণ্ডীবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

সন্ধ্যার পাঠশালা

ঘোঘরা গ্রামে জ্যৈষ্ঠের সকালেও মেঘ ছিল। চরাচর ঢাকা। স্নিগ্ধ মেঘ। বৃষ্টি হবে কি না বোঝা যাচ্ছিল না। হরেনবাবু ঘুম ভাঙার পর মনে করতে পারছিলেন না এটা সকাল কি বিকেল। বড় বিস্ময় লেগেছিল মনে। ছোটবেলায় এ রকম কয়েকবার হয়েছে। তখন মাকে জিগ্যেস করতেন, মা! সকাল না বিকেল?

মা বলতেন, বিকেল। নয়তো সকাল।

হরেনবাবুর যখন সকাল হত, মা ততক্ষণে স্নান করেছেন, পুজো সেরেছেন, ভিজে চুল চুড়ো করে বেঁধে রান্নাঘরে পাঁচমুখো উনুনে বসিয়ে দিয়েছেন ভাত, ডাল, দুটো তরকারি, মাছ। বাবা ন'টা না বাজতে চলে যাবেন ত্রিবিক্রম রায়দের কাছারিতে। ম্যানেজার অফ কৃষ্ণপুর জেমিনদারি এস্টেট সকালে পাঁচ পদে ভাত খেয়ে বেরোতেন। উনানের রান্না নামিয়ে মা পটল, বা বেগুন ভেজে দিতেন।

মস্ত পিঁড়ি, কাঁসার থালায় ভাত, বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন। মা বসতেন পাখা নিয়ে।

সাড়ে ন'টায় খেতে বসত ছাত্রশালায় ছাত্ররা। তাদের জন্যে ডাল মাছের ঝোল। তারপরে নিজের ছেলেরা, আশ্রিত পরিজন, দাসদাসী, এখন কি ভাবা যায় মা একেক বেলা তিরিশ জনের রান্না করতেন!

স্বামী পরিত্যক্তা এক পিসি, বিধবা আরেক পিসিও এ সংসারে আশ্রিতা। রাঙাপিসিকে স্বামী পরিত্যক্তা বলা যায় না। সাভারে

তাঁর স্বামী পিসিমাকে বলেছিলেন, সতীন মেনে নিতে হবে। সতীন আসার পর পিসিমা ও তাঁর দুই ছেলে যতীশ সতীশের জীবন দুর্বিষহ হয়। বাবা একবার সাভারে গিয়ে ব্যাপারস্যাপার দেখে ভগ্নীপতিকে বললেন, এক স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে পার না, আরেকটা মেয়েকে টেনে আনলে, এটা কি করলে?

ধানের কারবারী পিসেমশায় বলেছিলেন, বিয়ে করা কেন? সেবা যত্ন আরামের জন্য তো!

—সুহাস কি তা করে না?

রাঙাপিসি বলেছিল, এরা ঘরের কাজে লোক রাখে না দাদা। একা হাতে পনেরোটা মানুষের রান্না, বাসন মাজা, আজ ডাল ভাঙো, কাল চাল কোটো, সময় পাই কোথা? আর সর্বদা রূপের খোঁটা, বংশের খোঁটা। আগে ওঁর সেবা করতাম, ছোট বৌকেও জল গামছা দিতে হয়···

—সে বড়লোকের মেয়ে।

বাবা বলেছিলেন, সুহাস কোন ছোট লোকের বোন? যাক গে, এখন তো আমি ওদের নিয়ে যাই···

—নিয়ে গেলে জানবেন এ বাড়িতে জায়গা হবে না।

সাভারে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল। সবাই জানে ও বাড়িতে বউ হয়ে ঢোকো, মরলে পরে বেরোবে। সুহাস সে নিয়ম ভেঙে চলে যাবেন?

সুহাস বলেছিলেন, তাই যাব।

বাবা বলেছিলেন, সে সব কথা পরে হবে। বর্তমানে ওর শরীরটা সারা দরকার। ছেলেরাও তো ঠিক মতো পড়ে না।

এসব কথায় বড় বিবাদ বাধে। সুহাসের বিয়ের দানে সব বাসন ফুল কাঁসার ছিল না, খাট ছিল আম কাঠের, জামাই-ষষ্ঠির তত্ত্বের মানও নেমে গেছে, এ রকম অনেক কথা।

আসার সময় রাঙাপিসি তার গয়নাও আনতে পারে নি।—ওসব সতীনকে দিয়েছে দাদা, আমার গায়ে যা আছে, তাই। পরতে

তো দিত না, জানিও না কি ছিল।

নৌকোয় বসে রাঙাপিসি কাঁদতে শুরু করেছিল। বাড়ির বড় বউ আত্মহত্যা করেছিল, মেজবউ হঠাৎ বমি করে মরে গেল, সুহাস কি বেঁচে বেরোত!

রাঙাপিসি আর ফিরে যায় নি।

সতীনের আঁতুড় তোলার নির্দেশ এসেছিল।

পিসেমশায়ের অসুখে সেবা করা যে "কর্তব্য" সে চিঠি এসেছিল। অবশেষে রাঙাপিসি আর ফিরে যাবে না, বাবা তাকে যেতে দেবে না, এ কথা বোঝার পর স্বামী লেখেন, দুশ্চারিণী ও অবাধ্য স্ত্রীকে আমি ত্যাগ দিলাম। উক্ত স্ত্রী-জাত পুত্রদ্বয়েরও আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে কোনো অধিকার রহিল না।

যতীশ দাদা ও সতীশ দাদা কৃষ্ণপুরের বাড়িতে থেকেই লেখা-পড়া শেখে ও দু'ভাই ব্রিটিশ জুট মিলে ঢুকে যায়।

মায়ের চলত রান্না যজ্ঞ। রাঙাপিসি আর বড়পিসি জোগাড় দিতেন, বড়পিসি নিজে তাঁর কিশোর অবস্থায় মৃত স্বামীর কারণে স্বপাকে নিরামিষ খেতেন। বাড়ির খাওয়াইন্সাদের পরিবেশন করতেন।

এর পরও মা "দৈনিক বসুমতী" খুলে বসতেন। ছেলেদের বসিয়ে কবিতা পড়ে, গান গেয়ে শোনাতেন।

পরে সবাই বলত, ছয়টা ছেলে, সবাই দেশের কাজে গেল, এ তোমার কারণে।

মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

—মন্দ কাজ তো করে নি।

মা ছিলেন মস্ত জমিদারের মেয়ে। গৃহশিক্ষিকার কাছে লেখাপড়া শেখেন, কল চালাতে শেখেন। হরেনবাবুর খুব মনে পড়ে, কলকাতায় মেছুয়াবাজারের বাসায় ওঁরা মায়ের কেটে দেওয়া ফতুয়া, ইজের, ওয়াড় শেলাই করেছেন কলে।

পড়শিরা বলত, এ কি ব্যাটাছেলের কাজ?

—সব কাজই সকলের গো। যার মেয়ে নেই, সে কি করবে? আমার ছেলেরা দরকারে ভাত ডাল করতে পারে, কাপড় কেচে নেয়। বিছানা পাতে, তোলে। মা আর বড় বউদি কত করবে? ঘরের কাজ যে জানে না, সে বাইরের কাজ করবে কেমন করে?

মায়ের মৃত্যুর এতকাল বাদে ঘোঘরার বাড়িতে সকাল, না বিকেল, ভুল হয়ে যাওয়া সকালে হরেনবাবুর মনে হল, অমন মায়ের যোগ্য সন্তান তো তাঁরা হন নি।

মা বলতেন, দেশ স্বাধীন করার জন্য কাজ করলেই হয় না বাবা আসল কাজ দেশ স্বাধীন হবার পরে করার কথা ছিল। তা দেখ, কেউ ভাবে না।

হরেনবাবুই কি ভেবেছিলেন?

ছয় ভাই তাঁরা—তিনজন বিয়েই করলেন না। মেজদা তো রংপুর জেলেই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন। কিন্তু ন'দা, হরেনবাবু, কেউই বিয়ের কথা ভাবেন নি। বিখ্যাত দেশসেবক দলের সশস্ত্র সংগ্রামীরা সবাই বিয়ের কথা ভাববে কেমন করে?

বড়দা, সেজদা, রাঙাদা বিয়ে করেন।

পরে সেজদা যোগ দেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে। বড়দা যুদ্ধবিরতির পর মুক্ত হয়ে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন। এজেন্সি পেয়েছিলেন বলেই ঘোঘরাতে জমিটা কিনতে পেরেছিলেন, বাড়িও তুলতে পেরেছিলেন। সে জন্যেই এখানে থাকতে পারছেন।

কিন্তু সকাল যদি হবে, সুবালা চা দেয় না কেন?

সুবালা চা এনে রাখল।

—এত দেরি করলে?

—দেরি কোতা গো মামা, ছ'টা বাজে সবে।

—দেখ কাণ্ড! সাত ভোরে উঠে সব বিভ্রম!

—আজ দেহটা কেমন?

—ওই আর কি···

সুবালা কপাল দেখে ওঁর। মাথা নাড়ে।

—না, ভাত খাওয়া চলবে।

—আর কি?

—কি খেতে চাও, বলো?

—থোড় জিরিজিরি করে কেটে একটু ছেঁচকি। আমার মা এটা খুব বাঁধতেন।

—দেখি, তাঁর মতো পারি কি না।

হরেনবাবুর ঘোঘরার জীবন খুব নিয়ম বাঁধা। হাত মুখ ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে বাইরের বারান্দায় বসে আরেক কাপ চা, মচমচে চিড়ে ভাজা, বা দু'খানা লুচি খান, কাগজ পড়েন। তারপর শার্ট গলিয়ে কেড্‌স পরে বেরিয়ে পড়েন। ডিগ্রি না থাকলেও বই পড়ে পড়ে আর অপূর্বদার সহকারীগিরি করে তিনি হোমিও-চিকিৎসা ভালোই করেন।

সকালে বসেন দীপালি স্মৃতি হোমিও হলে। একেবারে ট্রেন এলে কাগজ নিয়ে বাড়ি ফেরেন। মাকে কাছে থেকে শান্তি দিতে পারেন নি. মা মারা গেলেন রাঙাদার কাছে পাটনায়, তখন তিনি জেলে। বাড়িটার নাম "নবনলিনী"। নামের মধ্যে মা আছেন।

দুপুরে স্নানাহার, আধঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর কাগজ পাঠ। বিকেলে চা খেয়ে বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে হোমিও-চিকিৎসা করেন। সাতটার পর ওই ঘরেই সাক্ষরতা-ক্লাস করেন। হরেনবাবুর এটা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র নয়।

এটা বিধিমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা নয়।

একটি ব্ল্যাকবোর্ড ও একটি চকখড়ির সাহায্যে মলিন মণ্ডল, নারায়ণ দাস, নয়ন মণ্ডল, পারুল রানী মণ্ডলের মতো লোকদের অ-আ-ক-খ শেখানোর প্রচেষ্টা।

বিভিন্ন পার্টি'র লোকজন ওঁকে বহুকাল দেখছে। এখন ওরা জেনে গেছে ওঁকে ভয় পাবার কারণ নেই। ওঁর সিধা কথা, পরাধীন ভারতে রাজনীতি করতাম, স্বাধীন ভারতে করি নি, করবও না।

রাত ন'টা নাগাদ আরেকবার পায়খানা যান। তারপর হাত মুখ ধুয়ে দুধ, খই, কলা খেয়ে শুয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি শোবে এবং তাড়াতাড়ি উঠবে, ছোটবেলার শিক্ষা। কিন্তু সতেরো থেকে চৌত্রিশ, জীবনের এই সতেরো বছর তো নিয়ম রাখা যায় নি সব সময়ে। দেশসেবক নামক গোপন দলের তরুণতম কর্মী হরেনবাবু তখন দলের নির্দেশে সৈনিক। কখন বাইরে, কখন জেলে। তবে হ্যাঁ, ভাবলে এ সান্ত্বনাটা পান, জেলজীবন ভাঙিয়ে পয়সাকড়ি করেন নি।

শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়েন। সুবালা বলে, পুণ্যবান মানুষ, মনে ময়লা নেই, তাতেই ঘুমোতে পারচ।

—তোর মনে কি ময়লা আছে ?

—পাপ পাপ ! গোলাপ'ার কথা ভাবি !

—তা, মা হয়ে ছেলের কথা ভাববে না !

—সে ভাবে একবার ? চিঠি লেখে একটা ?

—আমি বুঝি, তুমি তোমার কর্তব্য করে যাবে, বাস্। সে চিঠি লেখে না, কেন লেখে না ?

—তোমার জন্যিই সব হল ! লেকাপড়া শিকল, পরীক্ষা দোয়ালে, তাতে চাগরি পেল। চাগরি পেতেই মাস্টারের মেয়েকে বে' করে দেশ ছাড়ল।

—আহা হা ! কানপুরও দেশ !

—অত ঝানি নি মামা ! রাজপুর, বারুইপুর, লোককান্তপুর, এগুলো হোলো দেশ ! নয় কলকাতাতেই ঝেতু !

হরেনবাবুর মনে হয়, সুবালার চিন্তা খুবই বিচ্ছিন্নতাবাদী। ওর কাছে দেশ বলতে ঘোষরা, যেটা শ্বশুরবাড়ির দেশ, এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কয়েকটি জায়গা, যা না কি ওর মায়ের বাড়ি, মামার বাড়ি, পিসির বাড়ি। সুবালাদের এক জাতি–এক প্রাণ—একতা বোঝানো যাবে না।

—সবই দেশ ! ম্যাপটা দেখাই···

—তুমি থ্যাকো আর থ্যাকাও। এবার চাল আগেবাগে কিনব মামা। জল নামলে দাম বাড়বে।

—কিনো, কিনো। পেনশানটা আনি।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাঁচশো টাকা পেনশান, সকালে রুগীপিছু এক টাকা, এই ওঁর মবলগ রোজগার। সুবালা আর উনি, দুটো পেট। চলে যায়, চলে যায়। সেদিন তিনশো টাকায় দশ কাঠা জমি কিনেছিলেন ১৯৫০ সালে। অপূর্বদা কিনিয়ে দেন। ওঁদের এখানে জমিজায়গা ছিল। এটা পতিত জমি, গোচর মাঠ ছিল।

এখন ছোট বাড়ির পাঁচিল ঘেরা জায়গায় সুবালার কলাগাছ, নারকেল গাছ, পুঁই, লঙ্কা, লাউ, উচ্ছে বাগান।

ওগুলোর স্বত্ব সুবালার। বাড়িতে খাওয়া হয়, বাকি ও বিক্রি করে আর ওঁর পরামর্শেই ডাকঘরে টাকা রাখে। সুবালা ওঁর চেয়ে সচ্ছল। সেবার চোখ দেখাতে, ছানি কাটাতে টাকা ধার দিয়েছিল।

মাইনে কড়ির কথা নেই। উনি মরে গেলে সুবালাই সব পাবে। কেননা হরেনবাবুর বড়দা, সেজদা ও রাঙাদার ছেলেমেয়েরা কেউ ঘোঘরা আসবে না, "নবনলিনী" বাড়িতে থাকবে না। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বিজয়াতে। চিঠি লেনদেনের। তাও তো আমেরিকা প্রবাসী বড় ভাইপোর টিন-এজার ছেলেরা বিজয়ার ব্যাপারটা "হাই" লিখে ছেড়ে দেয়।

সেজদা ও রাঙাদার মেয়েরা অবশ্য মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। জীবনের সায়াহ্নে হরেনবাবুর মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনজনেরা কাছে নেই, সুবালা আপন না হয়েও কাছে রয়ে গেল, জীবন কি বিচিত্র।

সুবালা বা তার স্বামী তারক মণ্ডলকে, জমি কেনার সময়ে চোখে দেখেছেন বলে হরেনবাবু মনে করতে পারেন না। অপূর্বদা ওঁকে সঙ্গে এনে নিজেদের বাড়িতে তুলেছিলেন। রেখেছিলেন দিন সাতেক।

—আমার ভাগের জমিতেই যদি যৌথ চাষ পদ্ধতিতে সমবায় করে…

—জমিদার মানুষ থেকে চাষী হবেন ?

—চাষ, সমবায় প্রথায় চাষ !

—রাখুন তো ! ব্যবসা বুদ্ধি আপনার নেই !

—আমি কেন, তুমি করতে ?

—না দাদা, আমি ও কাজ জানি না।

—কুষ্টিয়াতে তো তা মনে হয় নি।

—পার্টির নির্দেশে চাষী ঘরে ছিলাম, কোদাল কোপাতাম, তা ধরাই পড়লাম এক মাস বাদে।

—যাক গে ! জমিটা কিনিয়ে দিই।

বাড়িটাও অপূর্বদা দাঁড়িয়ে থেকে করিয়ে দেন। বলেন, আমার বলতে কিছু তো থাকবে না। তখন তোমার বাড়ি এসে থাকব খ'ন।

—বাড়ি দিয়ে কি করব ?

—ও হে ! থাকার জায়গা একটা লাগে। এ সব জায়গা সব লাইন বসবে, রেল হবে। ওষুধের এজেন্সি করে যে টাকা হয়েছে, তা থাকবে না। টাকার দাম থাকবে না। কিন্তু জমি, বাড়ি, এর দাম বাড়বে। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীরা এই বাংলাতেই থাকবে। এখনো রেল সংযোগ নেই, তাই মানুষ আসছে না। রেল লাইন বসে গেলে…বম্বে, মাদ্রাজ, দেখলে না ? সব বাইরে থেকে কাজ করতে আসে ?

অপূর্বদাদের বাড়ি ছিল দোতলা, চকমিলানো উঠোন, দু'পাশে পুকুর, পিছনে আমবাগান। অপূর্বদার খুড়িমা ওঁদের গরম লুচি, কাঁঠালের রস আর রসগোল্লা খেতে দিতেন সকালে। দুপুরে থালার চারপাশে বাটি।

—বাপ রে, এত খাওয়া যায় ?

—ওই এত হল ? অপুর বাবা তো বিশখানা লুচি খেতেন কাঁঠালের রস দিয়ে। আমকাঁঠালের গাছও ওঁর লাগানো। খাও ভালো করে খাও।

—খুড়িমা, কলকাতার ছেলে, খেতে পারে না।

—তবে তুই খা।

—দাও, আমি "না" বলব না।

—বড় পুকুরটায় মাছ ধরাই ?

—তোমার যা ইচ্ছে।

—হ্যাঁ অপু, সব গভরমেণ্ট নিয়ে নেবে ?

—নেবে তো বটেই।

জমিদারী অধিগ্রহণের কথা জমিদাররা আগেই জেনেছিল। অপূর্বদাদের জমিজমাও আগেভাগে বেনাম করে ফেলা হয়।

অপূর্বদা কলকাতায় বাড়ি কিনে থেকে যায়। ওদের পরিবার জমিদার না হয়েও জমিদার। সেই খুড়িমার নাতি এম, এল, এ। ওদের বসতবাড়ি সরকার কিনে নিয়েছিল। ওটা হাইস্কুল হয়।

ঘোঘরা স্টেশনও হয়েছে, জনসংখ্যাও প্রচুর ধান জমিই বাস্তু জমির জন্যে কিনছে মানুষ। ঘোঘরাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সরকারী বীজ নিগম, মেয়েদের স্কুল, তিনটে প্রাথমিক স্কুল, ইংরেজি মাধ্যম, নার্সারি স্কুল, যোগমায়া নার্সারি, কি নেই ?

হরেনবাবু এসেছিলেন ছাব্বিশ বছর আগে। ওষুধের এজেন্সি ছেড়ে দিয়ে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে। একটি ক্যাপসুল তৈরিতে খরচ এক পয়সা, বাজারে দাম আট আনা, তাতে হঠাৎ নৈতিকতায় লেগেছিল।

আর · বলতে নেই, মনেও ছিল ব্যাথা। ছোট দেওরকে সংসারী করাবেন বলে বড় বউদির বড় আশা ছিল।

বড়দা বলতেন, বিয়ে করবে না।

বড় বউদি বলতেন, ঠাকুরপো! বিয়ে না করলে শেষ বয়সে দেখবে কে ?

—ছেচল্লিশ বছরের বুড়োকে বিয়ে করে কে ?

—দেখাই যাক না।

—আপনার মতো রাঁধতে তো পারবে না।

—তার মতো পারবে। ন'ঠাকুরপো, মেজঠাকুরপো, ন'টাকুরপোর কথা ধরি না। মেজ তো নেই। ন'ঠাকুরপো আশ্রমে দীক্ষা নিয়ে ভালোই আছেন। আপনার জন্যেই মা ভাবতেন, আমিও ভাবি।

—দেখুন তবে।

হরেনবাবু জানতেন বড় বউদি কার কথা ভাবছেন। বড় বউদিরই এক দূর সম্পর্কের বোন, লতা। লতা স্কুলে পড়াতেন, বয়স ছত্রিশ, স্বাস্থ্য ভালো। লতাকে বিয়ে করবেন ভাবতে হরেনবাবুর খুব ভালো লেগেছিল। গম্ভীর স্বভাবের শান্ত মেয়ে। চাকরি করে ভাইবোনকে দাঁড় করিয়েছিল।

কিন্তু লতাই ওর কাছে এসেছিল।

—আপনি আমায় বিয়ে করতে চান?

—বড় বউদির ইচ্ছে তাই।

—আপনার ইচ্ছে কি?

—আমার আপত্তি নেই।

—কিন্তু আমার যে আপত্তি আছে।

—থাকতেই তো পারে। আমার বয়স…

—আমি বিয়ে করব দিলীপ দাসকে। আমরা পনেরো বছর আগেই বিয়ে করতাম। কিন্তু আমার মাথায় তখন সংসার। দিলীপ অবশ্য বিয়ে করেছিল। ওর বউ মারা গেছে…তিন বছরের মেয়ে… বুঝলেন?

—না, তবে আমার প্রসঙ্গটা আর ভাববেন না।

লতা বলল, দেখুন, আমার মা'র কাছে আপনি তার বুড়ো মেয়ের জন্যে খুব লোভনীয় পাত্র। একটা বাড়িও আছে, টাকাও কিছু আছে বলে শুনি…

—টাকা নেই। তবে বড় বউদিকে আমিই বলে দেব। আপনি চিন্তিত হবেন না।

—দিলীপের দরকার আমাকে।

—ওর মেয়েকে মানুষ তো করতে হবে··নিশ্চয়ই। আর এটাও জানি, বউ মরলে স্বামী বড় অসহায়।

—যা মনে করেন!

সে বিয়ে তো হয় নি।

ওই একবারই বিয়ের কথা মনে হয়েছিল হরেনবাবুর। তারপর আর ভাবতেই সাহস করেন নি। একবার মনে হয়েছিল, লতাকে সাবধান করে দেন। লতা পনেরো বছর অপেক্ষা করেছিল কেন? দিলীপ তো বিয়ে করেছিল। হয়তো ঠিকই করেছিল, কেননা কত-দিনে লতার ভাই বোন জীবনে দাঁড়াবে, সে জন্যে অপেক্ষা করে থাকলে সেটা অস্বাভাবিক হোত। দিলীপের বউ মরে গেল বলেই বিয়ের কথাটা উঠল? না, বউ থাকতেই দিলীপ লতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল·

বড় বউদি খুব রেগে যান।

—লতা খুব বোকামি করল ঠাকুরপো। ওর বয়স হয়েছে, চেহরা নেই। দিলীপ কতদিন ওকে সহ্য করবে? পরের মেয়েই বা আপন হবে কেন? মেয়ে তো তার দিদিমার কাছে থাকে।

পরে বুঝেছেন, লতা শহীদের রক্ত নিয়ে জন্মেছিল। ভালোবেসে শহীদ, পরিবারের জন্যে শহীদ, আবার বিয়ে করে এক শিশুর মা হবার জন্যে শহীদ—

শহীদদের মূর্তি আর তার হতচ্ছেদ্দা দেখে হরেনবাবু ভালই বোঝেন, শহীদদের আর দরকার নেই এখন।

তবু লতা শহীদ হতেই গেল।

তারপর, কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য, চোখের ছানি কাটালেন, চশমার দোকনে এক সাদা সিঁথি প্রৌঢ়া।

—লতা না?

—আপনি···হরেনবাবু?

—কেমন আছ? ভালো?

—হ্যাঁ।

—থাক কোথায় ?

লতা বলল, যেখানে থাকতাম।

—সংসারের খবর ভালো ?

—এখন তো আমি একা।

—বড় বউদি নেই, কোনো খবরও পাই না।

—খবর ! তা আপনাকে বলা যায়।

— তোমার স্বামী কি··· ?

—দিলীপ ভালই আছে। ওর শালীকে বিয়ে করেছিল। বয়সে মানানসই, মেয়েও তাকে মা বলে।

—সে কি ?

—শুনলেন তো। আমি যাই ওদের বাড়ি। বচ্চাগুলো ভালবাসে। যতদিন সংসারে আছি··তবে এবারে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। টাকা পয়সা সব দিয়ে আনন্দধাম আশ্রমে থাকব। হুগলীতে বেশ আশ্রম ! শান্তি পাওয়া যায়। আপনি কোথায় আছেন ?

—স্বগৃহে। ভালই আছি। চলি।

রাতটা ছিলেন দীপালি স্মৃতি হোমিও হলের মালিক যে ডাক্তার, তার মেয়ের বাড়ি, ওখানে থেকেই অপারেশনও করান। মেয়ের একটা মমতা আছে। তার মায়ের নামে যে ডাক্তারখানা, সেখানকারই ডাক্তার তো ! স্বামী শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, ও নিজে দেখে ছোট্ট শিশু হাসপাতালটি। ওব ছেলেও বোধহয় ডাক্তার হবে। ওদের বাড়িতে অতিথিদের জন্য একটা ঘরই আছে।

লতা বলেছিল, আপনি তো বিয়ে করলেন না, দেখে কে ?

—সুবালা।

—কোনো আত্মীয় ?

—রক্তের সম্পর্ক নেই। তবে কন্যা না হয়েও কন্যাতুল্য। আচ্ছা লতা চলি।

সুবালাও তো এসেছিল তার জীবনের চরম এক বিপর্যয়ের দিনে।

ওর স্বামী ছিল অপূর্বদের এক রায়তী প্রজার কোর্ফা প্রজা। কোর্ফা প্রজার জমিতে কোনো স্বত্ব থাকে না। সে প্রজার প্রজা মাত্র, নিঃস্ব গরিব।

তারক মণ্ডল ও সুবালা যে তাঁকে জমি কেনার সময়ে, বাড়ি তৈরির সময়ে দেখেছে, সে কথা হরেনবাবু জানতেন না। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হবার সময়ে এ বাংলায় ভূমিহীন মানুষ বাড়ল, আর ও বাংলার মানুষ এসে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়াল। সে এক সময় গেছে বটে।

সেটা ১৯৬১ সালই হবে।

হরেনবাবু সন্ধ্যার পর দরজা বন্ধ করতে যাবেন, সহসা "বাঁচান গো বাবু!" বলে একটি ঘোর কালো যুবতী মেয়ে একটি বালককে জাপটে ধরে ঢুকে পড়ে ও চেঁচাতে থাকে। তার কাঁধ বেয়ে রক্ত পড়ছে।

পিছন পিছন দৌড়ে আসে সমান কৃষ্ণবর্ণ এক ভয়ার্ত বৃদ্ধ।

—বউটাকে বাঁচান গো বাবু। আমার বেটা পাগল হয়ে গেছে বই তো নয়, ঘরে এসে ভাত না পেয়ে বউটাকে কাটতে লেগেচে।

—তুমি কে?

—আজ্ঞা কীর্তন মণ্ডল। ইনি আমার বেটা তারক মণ্ডলের ইস্তিরি বটে, উনি ওর বেটা, গোপাল।

—একে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও।

—তা ঝাব বাবু, কিন্তু আপনি একে আছ্‌য় দাও। বড় দুঃখ গো বাবু আমাব! বেটারা সব আলাদা। আর তারক কোনো কাজ করবে না, বউয়ের ওজগারে খাবে, ঘরের সাবুদ জিনিস বেচে শেষ করেচে। বউকে নিত্যি মারদাঙ্গা, হাঙ্গামা খুব বাবু। আজ ও না পালালে খুন হয়ে যেত।

—যাও ডাক্তারের কাছে যাও।

—আমি তো মগরা চলে ঝাব বাবু···

—ওকে নিয়ে যাও। তোমারই তো বেটার বউ

—সেতা অন্ন নি' বাবু। ঝ্যাংলা বুনত, খাব। তা সেতা তারক ঝেয়ে উঠবে ঝ্যামন?

পাঁচ মিনিট আগে যাদের অস্তিত্ব জানতেন না, তাদের নিয়েই ওঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়।

—ওরা থাকবে, তুমিও থাকো। একা ওর থকাটা ভাল হয় না। গাঁ দেশে মানুষ তো।

ডাক্তারের কাছে ওঁকেও যেতে হয়। সে সময়ে অপূর্বর খুড়ীমার যে নাতি বর্তমানে এম এল এ, গাড়ি চেপে গ্রামে ঢোকে, পার্টির লোকজনের সঙ্গে মিটিং করে, কঁ্যাচ করে লাল রিবন কেটে শীতলা-মন্দির—নেতাজী ক্লাব—পঞ্চায়েত ভবন—যুবা ভবন—রবীন্দ্র-নজরুল মেলা, সব কিছুর উদ্বোধন করে,—পদযাত্রায় দশ পা হাঁটে,—সেই রণজিত তখন এক ঘোর পার্টি করা যুবক, বিশ বছরের তরুণ তুর্কি।

রণজিত এসে পড়ে। পরদিন ওদের স্থানীয় নেতা হংসপদরেণুবাবুও আসেন। গোপীপদরেণু, ব্রজপদরেণু, হংসপদরেণু, তিন ভাইয়ের ছেলেরা পারিবারিক "পদরেণু" ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়ে সুদীপ, সন্দীপ, প্রদীপ, অধীপ, প্রতীপ ইত্যাদি হয়েছে। ওদের বোলবোলা ঘুচে গেছে। এখন তো ঘোষরায় ওরা কেউ থাকে না।

রণজিত, হংসবাবু, তাঁরা তখনো জানেন যে অঙ্কের নিয়মে হরেনবাবু তাঁদের লোক হয়ে যাবেন। হরেনবাবুকে ওঁরা খাতিরও করতেন।

রণজিত বলল, তারককে আর ঘোষরায় ঢুকতে হচ্ছে না। সুবালাকে দিয়ে থানায় একটা ডায়েরি করাব, আমিও দেখব। এরকম মারদাঙ্গা করলে···

সুবালা বলল, আমি ঘরে ঝাবু নি। জমি নি', জায়গা নি', শউর দেওররা উঠে ঝাচ্ছে মগরা, আমি কার ভসসায় কচি ছেলে নে' থাগব? ইনি ঝদি আচ্ছয় না দেয়, তোমরা আচ্ছয় দাও। গতরে খাটব, পেটে খাব।

তখন ধান চাল শস্তা ছিল, টাকাও কম ছিল বাজারে, আর ধনী

লোকজন আজকের মতোই খাইখরচাকে ভয় পেত। হংসবাবু বলল, খাটবে একা, খাবে দু'জন।

—হাঁসকে যে ভাত দাও, তার একগাল দিলেই কচি ছেলে, ক'টা ভাত খাবে?

—এই দেখ! হাঁসকে ভাত দিই, হাঁস ডিম পাড়ে। তোমার ছেলে···শরীর তো পাঁকাটি গো! গরু ছাগল চরাবে দু'বছর বাদে, সে ভরসাও হয় না।

হরেনবাবু দেখতে পেলেন, স্বাধীনতা আনার জন্যে তিনি দফায় দফায় জেল খাটলেও স্বাধীনতার দাবি কম নয়। স্বাধীনতা চায় স্বাধীন হংসবাবু, স্বাধীন সুবালাও তস্য পুত্রকে পেট ভাতায় দাস করে রাখতে চায়। মধুকর ঠিকই বলেছিল। শ্রেণী সংগ্রাম হয় নি, শ্রেণী-চরিত্র পালটায় নি, কাজ করতে হবে এখন।

হরেনবাবু বললেন, মা! আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারি। টাকা-পয়সা যখন যেমন পাব, তেমন দেব। খাবে, পরবে, ছেলে লেখাপড়া করবে। "মা" বলেছি, মায়ের মতো থাকবে। আমি তো ঘরেও থাকি না সব সময়ে। ওই ইস্কুলের ব্যাপারে দৌড়াই কলকাতা। কিন্তু রণজিত, হংসবাবুরা কথা দিক যে আমার ওপর যেন কোনো হামলা না করে তোমার স্বামী।

রণজিত বলল, জ্যেঠামশাই বাড়ির কর্তা। তিনি আপনাকে এনেছেন মানে আমরাই এনেছি। আপনার ওপর হামলা করবে তারক?

সুবালা বলল, আমাকে তো কাজের ঝন্যি বেরুতে হবে, তা আমারে ঝদি···

—সে আমরা দেখব। স্বাধীনতার পর এমন দাংগাবাজি সইব না।

এত কিছুর পর এসেছিল সুবালা আর গোপাল।

হরেনবাবু "মা" বলেছিলেন, সুবালা ওঁকে "মামা" বলতে লাগল। "আচ্ছয়" দেবার ঋণ শোধ করার জন্যে সুবালার যা

আকুলি বিকুলি। বাগান কোপাচ্ছে, গাছ লাগাচ্ছে, নারকোল পাতা এনে বঁটিতে চিরে ঝাঁটা বানাচ্ছে।

একদিন ও বলেছিল, গোপালের বাপ আর আসবে না।

—খবর পেয়েছ ?

—তার বড় বউয়ের কাছে গেচে।

—বড় বউ ?

—আমার সতীন! বাদায় থাকে।

তারপর আবার নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, অংসবাবুর দাদা বলো, অজির (রণজিতের ডাক নাম) গোমস্তা বলো, মেয়েছেলের বিপদ সর্বত্তর। তাতেই মামা! তুমি তো ঝানো না, তোমারে আমরা বলি দেবতা। দেবতা নইলে কেউ মোল্লাপাড়ায় ইসকুল করার ঝন্যি এমন ছুটে ছুটে কাজ করে ?

—ছেলেটাকে স্কুলে পড়াও। "ক" অক্ষর গোমাংস, তাতেই তোমাদের দুঃখ ঘোচে না। সরকার তো তোমাদের পড়াবার জন্যে ব্যবস্থাও করেছে।

ষাটের দশকটা হরেনবাবুর কর্মময় অধ্যায়।

মোল্লাপাড়া, পদোপুর, তুলসীডাঙা, ঘোঘরার আশপাশে তিনটি প্রাথমিক স্কুল সংগঠন করেছিলেন।

সে সময়ে ওঁর সঙ্গে খাটবার লোকও পেয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের মধ্যে দু'জন শিক্ষক ছিলেন। দিনকালও অন্যরকম ছিল। স্কুল অনুমোদন পেয়েছিল, শিক্ষকরা চাকরি পেয়েছিলেন। হংসবাবু মোল্লাপাড়া স্কুল উদ্বোধনকালে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন বটে। তবে রণজিতকে বলেছিলেন, হরেনবাবু কম্যুনিস্ট নয় তো ?

—মোটেই না। কেন এ কথা ?

—তুমি কি বুঝবে আজ্জি! এই যে বাগদী-ডোম-মুসলমান, এদের চোখ ফুটে যাবে লেখাপড়া শিখে, ভবিষ্যতে আমরা খাটার লোক পাব না।

—রাখুন তো! ভাত ছড়ালে কাক আসবে।

—দেখ !

সে সময়ে ওদের জাতি-পরিচয় পত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারটা যে জরুরি, তাও হরেনবাবু বোঝান।

ওরা তো বুঝত না।

—আরে, চাকরি হবে তোমাদের !

ওরা হাসত।

কিন্তু সাতাশ বছরে ঘোঘরার তপশিলী ছেলেরা বেশ কয়েকজন চাকরি করছে। ব্যাঙ্কে, সরকারি আপিসে। পূর্ব বাংলার লোক-জনের মধ্যে শিক্ষা লাভের তৃষ্ণা ছিল প্রবল। ওদের সঙ্গে সঙ্গে এপার বাংলার গ্রামীণ গরিবদের মধ্যেও কিছু আগ্রহ বাড়ে।

সুবালা অবশ্য শিক্ষার ব্যাপার দেখে তেমন খুশি হয় নি। গোপালকে বলত, ইস্কুলে যাচ্চ, ফেরার কালে কেরাচিনি আনতে ভুলবি না। ঝেয়ে তো শিকচ। ক্রস্তে বলব না, ঝাঁটা বলব। ছোড়ান্ বলব না, চাবি বলব। লেকাপড়া শিকচ কিচু ?

হরেনবাবু হাহাকার করতেন।

—ওর মাথা আছে, বৃত্তি পাবে। তারপর আরো পড়বে, আরো। তোমার তখন কত সুখ হবে দেখো।

—পড়বে কি অন্দকারে ? তাতেই তো কেরাচিনি আনতে বলতেচি। ঘরের কাজ দু'খান করতে হবে বই কি। নেকাপড়া করতেছে বলে বাবু হতে দোব না।

গোপাল তো বদলে যাচ্ছিলই। রাসু গরু চরায়, ছেঁড়া ইজের পরে। তিলক একটা নোংরা ছেলে। বিলে নেমে গেঁড়ি গুগলি তোলে। ওরা শামুক চচ্চড়ি খায়।

সুবালা ভীষণ গর্জনে বলেছিল, বটে ? দাদু আচ্ছ্রয় দেচে, তাতেই কাচা জামা পেন পরতেচ, ভাত মাচ খেতেচ। দাদু তাইড়ে দিলে তুমিও গরু চরাতে আমিও গুগলি গুড়োতাম, পরের ধান ঘরে ভানতাম।

সুবালা চাইছিল গোপাল যেন তার জীবনের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়।

গোপাল তার আপনজনদের চেয়ে নিজেকে তখনি উন্নততর জীব বলে ভাবছে।

হরেনবাবু দুটোই দেখছিলেন।

—সুবালা!

—কি হল আবার?

—তুমি যদি একটু লেখাপড়া…

—কেন?

—গোপাল তো চাইবে যে তার মা…

—নইলে ঘেন্না করবে?

—না, তা নয়।

—এৎকাল বাদে আমি পারব নি মামা। তাতে ছেলে ঝে চক্কে দেকুক। অংসবাবু তার মায়ের পাদ্যোক খায়। তার মা কোন নেকাপড়াটা ঝানে?

—তুমি বড় তর্ক করো।

—তোমারে দেকতেচে, তাতেই ওর শিক্কে হচ্চে। ও ককনো মাকে ঠেলবে নে।

—তুমি বড় শাসন করো।

—ঝে বাপের বেটা! সে ঝনা মা-বাপ বলে মায়া করে নে, বড় বউকে মায়া করে নে, আমাকে তো…তার ছিল, আনবু নি, খাব। ভাত পাতে ক্যাঁকড়া নি কেন, তপ্ত ভাতে আলু চচ্চড়ি নি কেন! ঝা থাকতু, সব খেয়ে নিতু গো মামা! নিজের সাশ্ব আর নিজের পেট বিনে চেনে নে কিছু। তারই বেটা, শাসনে রাকতে হয়।

এরই মধ্যে একদিন হরেনবাবু এসে দেখেন, সুবালার পরনে ধুতি, জবজব ভিজে চুলের মাঝে সিঁথিটি সাদা, হাতে কড় নেই, নোয়াও নেই।

—এ কি অবস্থা, সুবালা?

সুবালা গম্ভীর।

—কি হয়েছে?

—তিলকের বাপ বলে গেল, গোপালের বাপ আজ দু'দিন হয় মরে গেচে তার বড় বউয়ের ঘরে।

—ও···গোপাল কোথায় ?

—ডাগতে পাটালাম।

নিশ্বাস টানে ও গোটা কয়েক। তারপর বলে, হাজার হলেও সোয়ামি গো মামা। এটুকু আমায় কত্তে হয়। গোপালকেও ঝা হোক, কাচা নিতে হয়, অ্যামন-ত্যামন ছরাদ এট্টা পিণ্ডিদান···

—এঃ, বড় খারাপ খবর !

—তোমাকে খেতে দিই, তা বাদে নেমকম্মো কি আচে ঝেনে আসি।

—হ্যাঁ···শ্রাদ্ধ তো···

—ওই নেমকম্মো ঝ্যামন···

মোল্লাপাড়ায় জ্ঞাতিদের বাড়ি গিয়ে সুবালা ছেলেকে নিয়ে শ্রাদ্ধ করাল তারকের। পরদিন এসে আবার সংসারের হাল ধরল। গোপাল মাথা ন্যাড়া করেছিল।

গোপাল, গোপাল, ছোট স্কুল থেকে বড়ো স্কুল। তারপর ডায়মণ্ডহারবার কলেজ থেকে বি. এ. পাশ। গোপাল লম্বা প্যান্ট ও শার্ট পরে, পায়ে থাকে চটি।

হরেনবাবুই ওকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকিয়ে দেন অনেক মনের কথা বলেন।

—এখানেই শিক্ষারম্ভ তোমার, তুমি শিক্ষিত হলে। তা এই যে কাজ করছ, এটা তোমার জন্মভূমির কাছে ঋণ শোধ। তুমি শিখেছ, এবার কিছু শিক্ষা দান করো।

গোপাল নীরবে শুনে গিয়েছিল।

ততদিনে প্রথম যুগের শিক্ষক অবসর নিয়েছেন তাঁর উচ্চ মাধ্যমিক পাশ মেয়ে মমতা হল গোপালের সহশিক্ষিকা। গোপাল দেরি করে ফিরত।

—মাস্টার মশায়ের কাছে যাই, ক্লাবে যাই।

হরেনবাবু বিশ্বাস করতেন।

গোপাল ততদিনে অন্যরকম হয়ে গেছে, বাস্তববাদী। জন্মভূমির কাছে ঋণ কেন তাকে শোধ করতে হবে, তা তার কাছে দুর্বোধ্য। হরেনবাবুর আদর্শবাদী কথাবার্তাও তার কাছে দুর্বোধ্য। সেই জন্যে সে বলেছিল, দাদু! সবাই গুছিয়ে নিচ্ছে। তুমি চাইলেই কনট্রাক্টর হতে পারতে, নয় জমি কেনাবেচা করতে পারতে।

হরেনবাবু এই প্রথম এক অচেনা গোপালকে দেখেছিলেন। ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, সেটা পাপ হত রে।

—সবাই কি পাপ করছে?

—টাকাটাই কি সব?

—টাকাও তো লাগে।

—তা, তোর তো পড়তেও ঠেকে নি, আমাদের চলেও যাচ্ছে। তুই দাঁড়িয়ে যাবি, তোর মা শান্তি পাবে। আমি আর কতদিন? তোরাই তো থাকবি।

গোপাল জবাব দেয় নি।

—ঘোঘরা তো ভাল জায়গা এখন।

শহর নয়, গ্রাম নয়, ঘোঘরা গোপালের কাছে যেন জেলখানা মনে হত। গাছ থেকে নারকেল নামলে, কলার কাঁদি নামলে, উঠোনে লাউ ফললে মা ও দাদুর যে কেন আনন্দ হত, তা ও ভেবে পেত না। দাদুকে মনে হত মূর্খ।

এতদিন জেল খাটল, স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন পায়, সে দেখ কি অল্পে খুশি! যারা জেলে যায় নি, পেনশন তারাও নিচ্ছে। যারা "রাজনীতি একদা করিয়াছি" এই মূলধন ভাঙিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা করছে, দাদুর কাছে তারা "অসৎ।"

গোপাল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই পড়ছিল, মাঝে মাঝে পরীক্ষা দিচ্ছিল। পড়াশোনায় ও সত্যিই ভালো ছিল, মাথা খুব পরিষ্কার।

সে জন্যেই ও স্টেট ব্যাঙ্কে অফিসারের চাকরি পায়।

সুবালা বলল, কলকাতায় কাজ করবি ?

—এখন তো শিক্ষানবিশী কিছুকাল।

—কলকাতায় থাকবি ?

—হ্যাঁ, জায়গা একটা দেখে নেব।

—যাবি তো যা। মেয়ে দেকিচি, বে' করে বউ আমার কাচে থুয়ে যা।

—পরে, মা পরে। মেয়ে দেখেছ ?

—বকুল রে, বকুল। বাঙাল ওরা, তবে স্বজাতি। বকুলও দশ কেলাশ পাশ করেচে। সোনার পিতিমে মেয়ে, কতাবাত্তা কি নরম !

—ঘোঘরার মেয়ে !

—ঘোঘরা কি দোষ করেচে ?

—তোমাকে কি করে বোঝাই মা ? ঘোঘরায় আমার পরিচয় কি ? রণজিতবাবু বলল, বাপ মোদোমাতাল, মা পরের ঘরে খাটে, তার ছেলে হয়ে তুই অনেক দূর উঠে গেলি। এখানে আমাকে কেউ মান দেবে না। "মামা" বলো আর যা বলো, লোকচক্ষে তুমি ওনার ঝি। আর আমি অনুন্নত সম্প্রদায়ের এক মাস্টার।

এ সব কথা গোপাল বলে নি।

বলে নি, যে রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়ে, ওমলেট খাইয়ে, আবৃত্তি শুনিয়ে মমতা বসুরায় ওকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। মমতার বাবা যে জাতপাত মানেন না, সে কথাও মমতা বারবার বলেছে।

বলে নি, যে মমতা বলেছে, যে ওকে ঘোঘরা থেকে দূরে, কোনো বড়ো জায়গায় নিয়ে যাবে, ও তার সঙ্গেই চলে যাবে। ঘোঘরায় কোনো ইনটেলেকচুয়াল জীবন নেই, এখানে কেউ ইংরিজি ছবি দেখে নি, এখানে আজও ছেলেমেয়ে একসঙ্গে অভিনয় করে না।

গোপাল চাকরি পেয়েছিল।

প্রথম পোস্টিং মালদহে। হরেনবাবুরা জানেন, চাকরি করতে গেল। চারদিন বাদে জানলেন, মমতা ও গোপাল (এফিডেবিট করে এখন সে কিশলয়) কলকাতার কোর্টে বিয়ে করে চলে গেছে।

সুবালা গুম হয়ে গিয়েছিল।

গোপাল চিঠি লিখে সব জানিয়েছিল, টাকাও পাঠিয়েছিল মাকে তারপর দু'মাস বাদে এসেছিল।

মা ছেলে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল যাকে বলে! ওদের থামাতে না পেরে হরেনবাবু চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকেন। হংসবাবু বলল, এত যে ত্যাগ করলেন ওদের জন্যে, ছোটলোকের কৃতজ্ঞতা কি থাকে? দেখলেন তো?

—ত্যাগ দেখলেন কোথায়? সুবালা খেটেছে, খাটে। আমি খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, সামান্য টাকা, এর বিনিময়ে ওর পরিশ্রম কিনি।

—না, না, ওদের আপনি আপনজনের চেয়ে বেশি করেছেন। এটা আমরা বলে থাকি। গোপাল যা করল···

—অন্যায় তো করে নি। স্বযোগ্যতায় কাজ পেয়েছে, স্বনির্বাচনে বিয়ে করেছে।

—মাস্টার চারটে মেয়েকেই এভাবে এ-জাতে সে-জাতে পার করল।

—কিছুই না, সুবালাকে একটু সম্মান দিলেই···

—কে কাকে সম্মান দেয় হরেনবাবু। আপনার চোখে সকলেই মানুষ। কিন্তু স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসারের কাছে সুবালা তো আপনার ঝি! মা ঝি হোক, মেথরানী হোক, সে যে মা, এ বোধ গোপালের নেই।

—থাক, এ কথা থাক।

উনি যখন বাড়ি ফিরলেন, গোপাল শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। ওঁর খাটে ছিল সুবালার জন্য দামী ধুতি, গরম চাদর। ওঁর জন্যে ধুতি, কোটের কাপড়, ভালো চটি।

সুবালা বলল, আমাকে নিতে এসেছিল ক'দিনের জন্যে। তাই তো বলল।

—তুমি গেলে না কেন?

—ভালো কাপড় পরে থাকতে হবে। ভালো বাংলায় কতা

কইতে হবে, বলা চলবে নে আমি খাটি। ছি ছি ছি! তুই মাতা তুলে বলতে পারবি নি, ছাকো, এই আমার মা। খেটে-পিটে আমায় মানুষ করেচে! ছাকো, ইনি আমার দাদু, আপনের চেয়েও আপন; দেবতা হেনো মানুষ! তুই শুদু লজ্জা পাবি, আর সেই দেকতে আমি ঝাব?

মা ও ছেলের মধ্যে অচলাবস্থা থাকতে থাকতে চিরস্থায়ী হয়ে গেল। গোপাল আর আসেনি। মাকে টাকা পাঠায় মাঝে মাঝে। গোপালের বয়স বত্রিশ, চাকরির বয়স দশ, ছেলের বয়স চার, মেয়ের বয়স দু'মাস। নৈনিতাল বেড়াতে গিয়ে গোপাল সপরিবার ছবি পাঠিয়েছিল।

সুবালা এখন গোপালকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে হরেনবাবুকে দোষ দেয়। হরেনবাবুর ঋণ ভুলে যাবার জন্য গোপালকে দোষ দেয়। উপসংহারে বলে, বাপ যেমন, ছেলে তেমন তো হবেই।

মাস্টারমশাই মেয়েদের বাড়ি ঘুরে মোটাসোটা হয়ে ফেরেন। আর বাজারে বলেন, গোপালের মা বুঝল না। গোপাল কি সামান্য ছেলে? কি উন্নতি করছে!

হরেনবাবু শুনেও শোনেন না।

হংসবাবু থাকলে বলতেন, অত যখন হেদোচ্ছেন, যান না, বেয়ান তো হয়, গোপালের মাকে নেমতন্ন করুন, খাওয়ান দারয়ান। তৈরি ছেলেটিকে বাগাবার সময়ে বলবেন, আমি জাত মানি না। সব মিছে কথা! বেয়ানকে ডাকার সময়ে লজ্জা হয়। মনে হয় পরের বাড়ির ঝিকে সমাদর করে ডাকব?

হরেনবাবু চুপ করে থাকেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের যে সকালটা সকাল না বিকেল বোঝা যাচ্ছিল না, সে দিনটার পরদিন হরেনবাবুর কাছে একটি চিঠি এসেছিল।

মধুকরের চিঠি।

এতদিন বাদে।

খুব বাঙালী কেতায় চিঠি।

প্রতি—শ্রী হরেন্দ্র নাথ রায়,
"নবনলিনী",
ডাক+সাং—ঘোঘরা,
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ ॥

হইতে—শ্রী মধুকর বর্মন,
অদ্বৈত আশ্রম,
নন্দন রোড,
রোহিনী—দেওঘর,
বিহার ॥

"ভাই হরেন্দ্র, অগাধ এবং দুঃখজনক অবসরে কাল যাপন করিতেছি। সময় কাটাইবার একমাত্র অবলম্বন পত্র লিখন, ডাকে দেওন এবং উত্তরের আশায় পিওনের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় পথ পানে চাহিয়া থাকা।

দীর্ঘকাল যোগাযোগ নাই, আমার সমাচার কিছু বলি। কারামুক্তির বেশ কিছু পর একটি রাজনীতিক দলে যুক্ত হই। এই দল সমাজবাদে বিশ্বাসী এবং সংগঠন ভালই গড়িয়া উঠে। তবে ইহা কম্যুনিস্ট পার্টি নহে। আমাদের দেশসেবক দলের মণিলাল, নিত্যানন্দ, ছোট হরেন, সতু, এরকম অনেকেই ছিল। মণিলাল ও সতু এখনো দলে আছে। নিত্যানন্দ দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধিতে অকালে চলিয়া গেল। আর ছোট হরেন বাঁকুড়ায় এক আশ্রমবাসী।

ভাই! দেশ স্বাধীন করিবার ব্রত লইয়া দেশসেবক দলে যোগ দেই। যতটুকু দেশ সেবা করিয়াছি, তাহা ভাঙাইয়া ধনী হইবার কথা ভাবি নাই। স্বাধীনতা আনিবার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের লগ্ন হইতে দ্বিগুণ নিঃস্বার্থভাবে দেশ গঠনের কাজ করিতে হইবে তাহা বুঝিতে বৎসর কয় গেল। নিত্যানন্দের দাদা সত্যানন্দকে মনে আছে? যিনি বহরমপুর জেলে "বিসর্জন" নাটকে রঘুপতি হন?

তিনি আমাকে খাদি উন্নয়নবোর্ডে একটি চাকরি দেন। বলেন,

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া ছয়জনের পরিবার। খাইবে কি? সত্যানন্দ দত্ত তাঁহার পিতার ঔষধ কোম্পানিতে ঢুকেন। এখন তাহা বড় কোম্পানি। সত্যানন্দ দাদা উন্নবতি বৎসরে আজও বাঁচিয়া আছেন। কেওড়াতলায় ত্রৈলোক্য মহারাজ স্মরণসভায় তাঁহাকে দেখিয়াছি।

উক্ত কাজ করিতেছিলাম, কিন্তু দেশের অবস্থা দেখিয়া মন ক্ষুণ্ণ হইত। মিথ্যা বলিব না, যোগাযোগ রাখিয়া চলিতাম। কলোনিতে বাড়ি করি, এবং তিন পুত্রকেই (আঠারো বৎসর বয়সে বিবাহ করি। পুত্র কন্যার বাপ হইয়াই দলে যোগ দেই) সরকারি চাকুরিতে ঢুকাইতে সক্ষম হই। কন্যা জন্ম টেরা। সে ক্রমে নিজে বিবাহ করে। জামাই ও মেয়ে স্কুল শিক্ষক।

আমার স্ত্রী বলিতেন, আহা, "বলিতেন" লিখিব, নামের পূর্বে ৺ চিহ্ন দিব, এ কথা আমি ভাবি নাই। অথচ আজ তাহা ভাবনা নহে, কঠোর বাস্তব।

তিনিকে তোমার মনে থাকিতে পারে। তিনি বলিতেন, সাংসারিক কর্তব্য সকল দ্রুত সারিতেছ, আবার কি রাজনীতি করিবে? আমি উত্তর দিতাম না। বলা দরকার, এই অজয়গড় কলোনিতে আমাদের যৌথ পরিবারের সকলেই জমি দখল করেন। আমাদের একটি পাড়া গড়িয়া উঠে, এবং পিতৃব্যের পরামর্শে তিন পুত্রের জন্যই জমি ছিল। সকল কথা বিতং লিখিতেছি। কেন লিখিতেছি? ভাগ্নার কাছে জানিলাম (সে স্কুল পরিদর্শক) যে সে ঘোঘরা অঞ্চলে যায়। এবং তুমি জীবিত ও সকর্মক আছ।

যাহা হউক, শেষ অবধি আবার রাজনীতিতে নামিলাম। মনে আদর্শ, মানুষকে শ্রেণী সচেতন করিব, শ্রেণী সংগ্রাম হইবে, যাহারা হাতে লাঙল ধরিয়া চাষ করে, তাহারা হইবে জমি মালিক। কিন্তু হিসাবে ভুল ছিল। স্ত্রী বলিলেন, এতকাল বাদে সংসার গুছাইয়া রাজনীতি করিবে? তুমি তো ত্যাগী নও।

আমি রাজনীতি করি বলিয়া স্ত্রী দেশের একান্নবর্তী পরিবারে বহু

লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন। তাহার মধ্যেও, স্বামীর আদর্শ বুঝিবার জন্য বই কাগজ পড়িতেন, সম্পন্ন পরিবারের বধূ হইয়াও মূল্যবান বস্ত্র পরিতেন না। ইহা তাঁহার স্বভাবজাত হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়াও লাল পাড় শাড়ি ও সোনা বাঁধানো শাঁখা লোহা ব্যতীত কিছু পরেন নাই। বলিতে কি, মৃত্যুর পর পুত্ররা তাঁহাকে মূল্যবান বস্ত্রে সাজাইতে চাহিলে আমি আপত্তি করি। কন্যা বলে, মাকে যদি বলিয়াছি মা! তুমি মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করো না কেন? মা বলিতেন, তোমার পিতা যদি হাতে করিয়া আনিয়া দিতেন, হয়তো পরিতাম। তিনিও দেন না, আমিও পরি না।

তখন বুঝিলাম, তাঁহাকে আমি চিনি নাই। একখানি মূল্যবান বস্ত্র হাতে করিয়া দিই নাই। ভাবিতাম, টাকা উনাকে দেই। উনি ইচ্ছা করিলে কিনিয়া পরিতেন। পরেন না যখন, তখন ইচ্ছা নাই। হায়! জীবৎকালে কেন বলিলেন না।

যাহা হউক, রাজনীতিতে নামিয়া আমার আশা ভঙ্গ ঘটিল। ট্রেড ইউনিয়ন করিলাম। দেখিলাম, জনগণের কথা কেহ ভাবে না, আমার দলও ভাবে না। শ্রমিক স্বার্থ বড় নহে, নেতৃত্ব স্বার্থ বৃহত্তর। আর দেখিলাম, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব করিলে নানাভাবে আপস করিতে হয়। গঙ্গামাতা পেপার মিলে শ্রমিক ধর্মঘট বিষয়ক সংবাদ পড়িয়া থাকিবে। একানব্বই দিন ধর্মঘট চলে। শ্রমিকদের দাবী চার আনা মিটিল, বারো আনা অনাদায়ী রহিল। আমরা কয়েকটি দলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিলাম না। আমি দলে ত্যাগ দিলাম।

অতঃপর হইল ভোট ভিক্ষায় বক্তৃতা দিবার কাজ। প্রতিশ্রুতি যাহা দিতাম তাহা বাস্তব করিবার ক্ষমতা তো নাই, বিরোধী দল যে স্বার্থান্ধ, কায়েমী স্বার্থের স্তম্ভ, ইহা বলিয়া বাজি মাৎ করিতাম।

কিন্তু তাহাও পারিলাম না। মানুষের কাছে থাকিতাম না, বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি। গ্রামে থাকিয়া সংগঠন করিব, তেমন ক্ষমতা আমার ছিল না।

মনই বিরক্ত হইয়াছিল। অবশেষে দলত্যাগ করিলাম। কিছুকাল "বিদ্রোহী চেতনা" নামে এক পত্রিকা করি, তাহাও উঠিয়া গেল।

ঘরে বসিয়া ভাবিব মনস্থ করিলাম। কি ভাবিব? এই স্বাধীনতা কি স্বাধীনতা? দুর্নীতি দেশব্যাপী, মানুষের দুর্দশা অন্তহীন। আমরা নিজেরা ভালই আছি। যেন একদা দেশসেবার পুরস্কার লুটিতেছি। জনগণকে বঞ্চিত করিয়া চলিতেছি। ইহা লইয়া ভাবিব, মানুষকে কোনো পথ নির্দেশ দিব! কি অহমিকা ছিল আমার। স্বার্থান্ধ, মোহান্ধ, ক্ষমতা লোভী অন্ধ, অন্ধ কি পথনির্দেশ দিবে? মণিলাল, সতু, তাহারা সৎ মানুষ। কিন্তু শুধু ব্যক্তিসততার কাজ নহে। বড় কঠিন কাজ।

সংক্ষেপে ভাই, স্বাধীনতার স্বরূপ আমার বুক ভাঙিয়া দিল। স্ত্রী বলিলেন, এ জীবনে আমার কথা শুনিলে না, স্বেচ্ছায় চলিলে। এখন বিশ্রাম লও।

গৃহে দেখি, আমার কোনো প্রয়োজন নাই। পুত্ররা বাড়ি করিয়াছে। জামাতাও কাছে থাকে। গৃহে আমরা দু'জন। কিন্তু কথা বলিব, কথা খুঁজিয়া পাই না। পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, সকলে আসে। নাতি-নাতিনিতে নয়জন। স্ত্রী তাহাদের লইয়া ভালই থাকেন। আমি যেন সংসারের বাহিরে। ইচ্ছা হইল না। স্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিলেন।

তাহার পর বেশি বলিব না। পুত্রদের ও কন্যাকে বলিয়াছিলাম দেওঘর ভ্রমণে যাইতেছি। এখন মনে করিয়াছি আর ফিরিব না। "অদ্বৈত আশ্রম" বাড়ির নাম মাত্র, ধর্মাশ্রম নহে। সত্যানন্দ দাদার বেহাইয়ের বাড়ি। উঁহারা এক বড় সাধুর শিষ্য, নিয়মিত আসেন। উঁহাদের বাড়িতে আমি একটি ঘর লইয়া আছি। স্বপাকে খাই, কাপড় ধুই, বাসন মাজি। একটি আত্মজীবনী লিখিতেছি, স্বীকারোক্তি বলিতে পারো।

পুত্রদের জানাইয়াছি যে স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশানই আমার পক্ষে যথেষ্ট। অজয়গড়ের গৃহটি, আমার ইচ্ছা, স্ত্রীর নামে চেরিটেবল

ডিসপেনসারি করিয়া দিক। মধ্যম পুত্রের ইচ্ছা উহা বিক্রয় করিয়া টাকা ভাগ করিয়া লইবে। আমি উহাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছি।

ভাই হরেন, আমাদের সময়ের কতজন তো নাই। যাঁহারা আছেন, খুঁজিয়া খুঁজিয়া পত্র লিখি। প্রশ্ন করি, স্বাধীনতা কেমন, বুঝেন? যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ইহা কি তাই? যদি মনে করেন ইতিবাচক বা নেতিবাচক, বিতং জানাইবেন, কেন মনে করেন?

নানাবিধ উত্তর পাই। আবার পাই না।

অধিকাংশ জনই বলেন, উনআশি বৎসর বয়সে ওই সব ভাবো কেন? নখদন্তহীন অবস্থায় তুমি কি করিবে? আমরা কি ভাবি তাহা কে শুনিতেছে? কেন শুনিবে?

ভাই হরেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী আজ সরকারী বদান্যতায় নিখরচায় প্রথম শ্রেণীতে রেল ভ্রমণ করিতে পারে আরেকজন সহ। পাসও আছে। কিন্তু আর সে ক্ষমতা নাই যে ভ্রমণ করি, দেখিয়া আসি দেশের হালহকিকত কিরূপ। তোমাকে লিখিলাম, তুমি তোমার সময়মত এ পত্রের উত্তর দিবে। ইতি, চার বৎসরের জ্যেষ্ঠের অধিকারে নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী মধুকর বর্মন। ভাবিতে আমি সমবয়সী, বলিতে মধুকর, কিন্তু আমি জ্যেষ্ঠ। তোমার জন্ম ১৯১৩, আমার জন্ম ১৯০৯। ফরিদপুর জেলে ইহা লইয়া বিতর্ক হয়, মনে আছে।

পুঃ—যদি আস, অবশ্য একখানি ভাল বাংলা অভিধান আনিবে, দাম দিয়া দিব। পত্রের দৈর্ঘ্য মার্জনীয়। নিঃসঙ্গ বুড়ারা বেশি বকে।"

চিঠিটা পড়ে হরেনবাবু খুব বিচলিত হন। মধুকর, মধুকর, কে জানত তার জীবনটা এ রকম নিঃসঙ্গ নির্বাসনে কাটবে। স্ত্রী মারা গেলে পুরুষ মানুষ বিশেষত বৃদ্ধ বয়সে, কি অসহায় হয়ে পড়ে তা বড়দার বেলা দেখেছেন। বড়বউদি গেলেন আগে। তাঁর মতো যে আগে হবে তা কে ভেবেছিল?

হরেনবাবুরও নিয়তি, বড়বউদি বললেন, দুদিন থেকে যান। তা শুনলেন না উনি। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোঘরা ফিরলেন। বউদির মৃত্যু-সংবাদ জানার পর তারিখ মিলিয়ে দেখেছেন, উনি আসার পরদিনই বড়বউদির তলপেটে যে ব্যথা উঠত, সেটা হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে উঠে ওঁকে অজ্ঞান করে ফেলে।

অ্যাপেনডিক্স ফেটে গিয়েছিল।

এ রকমও হয়। ডাক্তার বাঁধা ছিল, ওষুধ খেতেন। এ ব্যাপারটা কেন ধরা পড়ে নি, কেন ওই বয়সে ওই অপারেশন করাতে গিয়ে অপারেশন টেবিলেই বউদি মারা যাবেন?

বড়দা বললেন, সর্বদা বলত ওর বৈধব্য যোগ আছে, সেটাই ভালো। মেয়েছেলে বৈধব্য সইতে পারে, বেটাছেলে বিপত্নীক হলে বড় কষ্ট। তা তুই যদি চলে না যেতিস···তোকে বড় ভালবাসত।

বড়দার কষ্ট চোখে দেখেছেন। মধুকরের কষ্ট চিঠিতে জানলেন।

নিঃসঙ্গতা বার্ধক্যের অভিশাপ।

হরেনবাবু অবাক হয়ে ভাবলেন, তাঁর বয়স তো পঁচাত্তর হল। এখনো সক্ষম, সচল, খুব নিয়মবাঁধা জীবন। শেষ অবধি এ রকম থাকবেন তো?

মধুকরকে তো চিঠি লিখতে হয়।

কতজনের খবর রেখেছে ও, কত যোগাযোগ রেখেছে। হরেনবাবুর এখনো ব্যস্ত জীবন। সময় কাটানো এখনো সমস্যা নয়। মধুকরের জন্যে কষ্ট হল। ওকে জবাব দিলে খাম কিনতে হয় একটা। তা নয় কিনবেন।

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীর পাস তো তিনিও পেতে পারেন। ঘোঘরাতে নোঙর ফেলে সেই যে নৌকো বেঁধেছেন, যান না তো কোথাও। পিসতুত দাদা যতীশের নাতি সীতেশ বনগাঁর কাছে মোহনডাঙায় জেণ্টলম্যান ফার্মার। সে ঘোঘরায় এসেছে, বলেছে, দাদু একবার যাবেন।

যাওয়া হয়নি। দেখা হয়নি তার খামার। সেজদার মেয়ে ইলা

বহরমপুরে এক অফিসারের স্ত্রী। সীমান্তে চোরা-চালানী ধরাই তার কাজ। সেজদা আগে ছিল অবিভক্ত পার্টিতে। তারপর চলে এল মার্কসবাদী দলে। বউদি স্কুলে প্রধানা শিক্ষিকা। সেজদা সেজদার মতো ঘুরতেন। বউদি তিন মেয়েকে নিজের স্কুলে পড়াতে পারলেন। হরেনবাবুদের পরিবারে শীলা, নীলা, ইলার মতো উজ্জ্বল ছাত্রী কেউ হয়নি।

মেয়েগুলো খুব মমতাময়ী। ছোট্‌কা, চলে এসো। ছোট্‌কা, কয়েক দিন থেকে যাও, ওরা লিখত, নিজেরাও চলে আসত। শীলা বলত, এটা যেন গ্রামের বাড়ি। পয়সা দিয়ে না কিনে শাক, নারকোল, লাউ পাচ্ছি!

হরেনবাবুই যাননি তেমন। অভিমানে চুপ করে গেছে ওরা। শীলা একটি ব্যাঙ্কে কাজ করে। চেতলায় ফ্ল্যাট কিনেছে, স্বামী এক ডেভলপমেণ্ট কনসার্নে অংশীদার। শীলার ছেলে কুইজে প্রথম হয়, মেয়ে ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ন।

নীলা যাদবপুরের কাছে একটি কলেজে অঙ্ক পড়ায়। স্বামী ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার। ওদের একতমা কন্যা ইংরিজিতে এম. এ. পড়ে।

ইলা ছিল বিজ্ঞানের ছাত্রী। ওই বলল, বিয়ে করাটা ঝামেলা, বিয়ে দাও।

অশোক রক্ষিতের সঙ্গে বিয়েটা হরেনবাবুর যোগসাজসেই হয়েছিল। নীলকমল রক্ষিতের ভাইপো, ভালো পরিবার, খুবই সৎ, দাবীদাওয়া নেই।

ইলাও বারবার যেতে লেখে। ওদের বাড়ি থেকে গঙ্গা দেখা যায়। আম ওরা কেনে না, এসো ছোটকা, ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ দেখ, শরীর সারিয়ে যাও। ওর এক ছেলে।

বড়দার বড় ছেলে বায়োফিজিসিস্ট অরুণ আমেরিকায় বাড়ি কিনে প্রবাসী। মেজ ছেলে বরুণ কলকাতায় এক বক্‌সওয়ালা। টালিগঞ্জের বাড়িতেই থাকে। অরুণের এক ছেলে, এক মেয়ে। বরুণের যমজ

কন্যা, এখনো বালিকা। ওদের একমাত্র বোন করুণা একটি স্কুলে পড়ায়, জোকার কাছাকাছি। ওর স্বামী রাইটার্সে কেরানী থেকে সুপারভাইজার হয়েছে। করুণা থাকে বাঙ্গুর হাসপাতালের পিছনে।

রাঙাদা কপালে লোক ছিলেন। বিয়ের সময়ে রীতিমতো দুই শ্যালক ছিলেন। রাঙাবউদির কপালক্রমে দুই দাদা অকৃতদার থেকেই মারা যান। বড়জন হরেনবাবুদের দাদা এ, পি, বা অ্যাকটিভ পেট্রিয়ট, বা সক্রিয় স্বদেশপ্রেমী দলের নেতা। ফলে মাঝে মাঝে কারাগারে মিলন ঘটত। কারাগারে ওঁরা কে-কার দল নিয়ে বিতর্কে যেতেন না, কিন্তু মনে জানতেন যে ওরা ভ্রান্ত, আমরা সঠিক। বড়দা বলতেন, বিয়ে টিয়ে চলবে না। পরাধীন ভারতে কতক শিশু এনে লাভ কি?

বড়দা তো এক পক্ষে সরল লোক ছিলেন। তিনি বিয়ে না করলেও কি পরাধীন, কি স্বাধীন ভারতে শিশুদের আগমন অব্যাহতই রয়েছে। বড়দা মারা যান বক্‌সারে, আর ছোড়দা মারা যান হাতিয়াতে অন্তরীণ থাকার সময়ে সাপে কেটে। শেষ অবধি রাঙা-বউদির বাবা ভালো লাভে ঢাকার সম্পত্তি বিনিময় করলেন। পার্ক সার্কাসের দোতলা বাড়ি রাঙাবউদি পেলেন। ওঁর বাবা মা ওঁদের কাছেই থাকলেন।

রাঙাদার দুই ছেলে গীতিময় ও শুভময় ডাক্তার। মেয়ে বিনতার স্বামী বিহারে আই, এ, এস, অফিসার। বিনতার একমাত্র ছেলে।

হরেনবাবু যোগাযোগ রাখতে পারুন বা না পারুন, কলকাতায় বরুণ, গীতিময়, শুভময়, শীলা, নীলা, সকলের ছেলে মেয়ে, এদের মধ্যে খুব যোগাযোগ আছে। শুনেছেন, করুণা এই পারিবারিক মিলন মেলায় যায় না। নিজের দাদা বরুণের কাছেও যায় না। করুণার স্বামীর দুই ভাই, জামাই ছোট। অনিমেষ অনিরুদ্ধকে মানুষ করেছিল। অনিমেষ ও তার বউ কল্যাণীও স্কুলে পড়ায়। দু'জনেরই একটি করে ছেলে, একটি করে মেয়ে।

ওদের যৌথ পরিবার।

যাবার জায়গা তাহলে অনেক আছে।

কিন্তু পাস, ইত্যাদি···অনিরুদ্ধই করে দেবে। দরকার পড়লে ওকেই লেখেন, জবাবও পান।

—কার চিঠি হাতে ধরে ভাবতেচ?

—আমার এক বন্ধু।

—গোপালের নয় তো?

—না সুবালা।

—না, সে চিঠি দেয় না।

—কই আর দেয়? জোড়া পোস্টকার্ড লিখেও দেখেছি। গোপাল এমন নির্মায়া হয়ে যাবে, ভাবি নি!

—বাপের মতো হয়েচে। আপনা বিনে সবাই পর। একন তো বাবুর নজ্জা হয় মাকে দেকলে। দেকি, মুশারিটা কেচে দোব, ময়লা হয়েচে।

—সুবালা!

—কি হল?

—নিজের ভবিষ্যৎ ভাবো কিছু?

—ঝেদিন এসে পা ধরিচি, সেদিন হতে কিছু ভাবি না গো মামা। তুমি বললে 'মেয়ে'। কিন্তুক মামা বড় ভালবাসত, বাপকে তো দেকি নি। মামাই সব্বস্ব করেচে। তাতেই তোমাকে 'মামা' বলি। ঝদ্দিন আচ, আমি আচি।

—পরেও থাকবে।

—সে তোমার দয়া।

—পোস্টাপিসেও তো জমেছে টাকা।

—ওই, নিসম্বুলের সম্বল।

—একটা কথা ছিল।

—কি কতা?

—দেখ, আমি যেমন পেনশান পাই, তেমন রেলে ঘোরার পাসও পাই। একবার ঘুরেঘেরে কে কেমন আছে, দেখে আসব মনে করছি। তুমি একলা থাকতে পারবে?

—খুব পারব। ঝাও না কেন, সেই হতে গাঁতি মেরে পড়ে আচ? পাঁচজনা আচে, যেতেই তো পারো।

—তুমি একলা থাকবে।

—তিলক থাগবে রেকসা নিয়ে।

—সে থাকবে?

—শোনো কতা! রেকসাও তো তোমার কতায় অজ্জিবাবু বের করে দিয়েচে। খোঁজখবর নেয়, সব্বদা আসে, ওর মা পান্তা আনে, এগসাতে খাই। তিলক ছেলে নেমোখারাম নয়।

—ওর তো সংসার আচে।

সুবালা নিশ্বাস ফেলে।

—বউ তো চলে গেচে, ঝানো। আবার বে' কত্তে চাইচে না। পাষাণী ছেলে ফেলে গেচে। তিলকরা পাড়ায় থাকে, মা ছেলে দেখে। তিলককে বললেই থাকবে।

—নারাণও…

—না না, নেশা ভাং করে। কবে যাবে?

—ছুট বলতে যাওয়া হবে না। ব্যবস্থা করতে হবে। আরে! এমনি ব্যবস্থা আছে তাই তো জানি না।

—আচে বই কি! জেল খাটল অজির জ্যাটা অপুব্ববাবু, আর অজির বাপ না কি পেনশানও পাচ্ছে। বউ নিয়ে হিল্লী-দিল্লী ঘুরচে। সে না কি ফিরি।

—তুমি এত খবরও রাখো।

—পাট্টি আপিসে শুনছিলাম।

—তুমি সেখানেও যাও?

—ঝেতে আসতে 'অ বকুল' বলি। বকুলই তো কেরাচিনটা, চিনিটা এশনে তুলে আকে। আমি নে আসি। কোমরে বাতার মাদুলি দিইছিল…

—সারল?

—কম পড়েচে। আজ নারকোলের বড়া আর সুক্তো করেচি মাচের দাম ঝ্যামন আগুন!

সুবালা নিশ্বাস ফেলে।

—ঝে ঝার পুকুর বুইজে জমি বেচতেছে। চালসের বিলটা জম নে' সুদামবাবু মাচ ফেলেচে। নইলে মাচ তো সেদিনেও ধরিচি।

—মাছের দরকার বা কি?

—মাতার কাজ কল্লে মাচ খেতে হয়। গোপাল ঝকন পড়ত ওই কত্তা বলে নিত্যি মাচ আনাতে···

সুবালা মশারি নিয়ে চলে যায়।

হরেনবাবু অনিরুদ্ধকে জোড়া পোস্টকার্ড ছাড়েন। আর মধুকরকে জবাব লেখেন খাতার পাতায়। পোস্টাপিসে গিয়ে খাম কিনে ফেলে দেবেন।

'ভাই মধুকর! বয়স জানিলাম। তবে পুরান অভ্যাসবশত নাম লিখিতেছি! 'দাদা' লেখা কঠিন। তোমার পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। দুঃখের সংবাদ দিয়াছ, তথাপি আনন্দিত হইলাম। তুমি আমাকে স্মরণ করিয়াছ। আনন্দ সে জন্যই তোমার স্ত্রীর আত্মার শান্তি কামনা করিলাম যদিচ আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না জানি না।

তুমি যাহা জানিতে চাও, তাহা এখনি লেখা যাইবে না। মনস্থ করিয়াছি, কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করিব, দেখিব, তারপর যাহা মনে করি লিখিব। একটি কথা এখনি বলিতে পারি, স্বাধীন ভারতের চেহারা যদি নৈরাশ্যজনক হয়, তাহা হইলে আমাদেরও তাহাতে দায়িত্ব আছে।

আমরা স্বাধীন ভারতে সুযোগ-সুবিধা লইলাম, ক্ষমতা বাড়াইলাম, চাকরি-ব্যবসা ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার পাইলাম, 'স্বাধীনতাসংগ্রামী', নামটি কতবার ভাঙাইলাম,—আমাদের প্রজন্মকেই বলিতেছি।

আর সর্বনাশ করিলাম! ভাবিয়া বসিলাম, দেশ ও মানুষের সকল

কাজের দায় সরকারের। আমরা 'সরকার করিলাম' বলিয়া চেঁচাই, নিজের সাধ্যসীমা মতো কোনো কাজ করি না। স্বাধীনতার পর দেশ সম্পর্কে ভাবনার মূলেই গলদ। আত্মসমালোচনা করিবার সময় তো এখনো আছে। আশ্চর্য কি, তরুণতরেরা আমাদের বুড়া বাক্য-সর্বস্ব মনে করে?

আমি রাজনীতিতে যাই নাই। কোনো কাজের কাজ করি নাই। অতীতে, এই নিরক্ষর অঞ্চলে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংগঠন করি ও ওই গুলি সরকারি অনুমোদন লাভ করে।

ঘোঘরার জনজীবনে কিছুকাল অংশ লইতাম। যেদিন দেখিলাম আমরা বাতিলের পর্যায়ে পড়িয়াছি, 'রাজনীতি' শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে দলবাজি, মানুষ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা পায় না, দলের লেবেল থাকিলে বিবেচনা পায়, সেদিন হইতে নিজেকে গুটাইয়া লইয়াছি।

সকালে এক হোমিওপেথি ডাক্তারখানায় বসি। ডিগ্রি নাই, বই পড়িয়া চিকিৎসক। রোগী পিছু এক টাকা পাই। বৈকালে স্বগৃহে বিনা ফি গ্রহণে রোগী দেখি। এবং সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা অবৈতনিক অক্ষরদান করি, পড়াই।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় আমি ঘোঘরায় সকর্মক ক্রিয়া হইয়া টিকিয়া আছি কি রূপে, তাহা বলা দরকার।

ঘোঘরায় আমি ছাব্বিশ বৎসর বাস করিতেছি। অপূর্বকে তোমার মনে থাকিবে, আমার অপূর্বদা! অপূর্বদা আমাকে গভীর স্নেহচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বিচিত্র মানুষ। ভৃত্য বেতন বাড়াইতে বলিলে মারিতে উঠিতেন। আবার সেই ভৃত্যকেই যক্ষ্মা রোগে ধরিলে যাদবপুরে রাখিয়া চিকিৎসা করাইয়াছেন। একমাত্র কনিষ্ঠা বোনের বাড়ি যাইতেন না, তাহার স্বামী গোয়েন্দা। আবার জেলের সেই রাইফার কয়েদী সুরেনকে পানের দোকান করিয়া বসাইয়া দেন।

জমিদারের বংশ, খেয়ালী ভাবে চলিতেন।

তা, উঁহার হইল 'ওরেন খেয়াল।' এক ওষুধ কোম্পানির এজেন্সি

ধরাইয়া দেন। এবং ঘোঘরাতে তিনশত টাকায় দশ কাঠা জমি কিনাইয়া দিয়া, এই একতল গৃহ নির্মাণ, সবই তিনি করেন বা করাইয়া দেন। উক্ত এজেন্সি আমিই ত্যাগ করি।

তখন ঘোঘরায় অপূর্বদার কথাই রাজাদেশ। ঘোঘরাবাসী ভাবিত, হরেন আগে ছিল গোপন বিপ্লবী দলে, এখন কি সে কংগ্রেস? না কমিউনিস্ট? এই যে স্কুল করিতেছে, শরণার্থী শিবিরে যাইতেছে, তপশীলীদের জাতি পরিচয়পত্র করাইতেছে, রাজনীতিক ভিত্তি গড়িতে চাহে না কি?

ভাই মধুকর! তাহারা এতকালে বুঝিয়াছে, এ ঘোড়া মাঠে নামিবে না, এ ক্ষুরে দাড়ি কাটিবে না, এ এক মূর্খ বৃদ্ধ। কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার নাই।

তাহারা জানে আমার সঙ্গে কোনো রাজনীতিক দলের নৈকট্য বা দূরত্ব নাই। আমি সারিয়া থাকি। এমন কি, আমার কোনো রাজনীতিক উচ্চাশাও নাই।

উহারা আমাকে মানিয়া লইয়াছে।

ভুলিও না, অপূর্বদার মাধ্যমে আমি ঘোঘরায় আসিলাম। বর্তমানে অপূর্বদার খুড়তুত ভাইয়ের পুত্র স্থানীয় বিধায়ক, ক্ষমতাসীন দলে আছেন। সে আমাকে মৌখিক সম্মান দেখাইয়া থাকে।

আমাকে কেহ ঘাঁটায় না। ইহা তাহার অন্যতম কারণ হইতে পারে।

পঞ্চায়েতের গাছ লাগালে আমি যাই, গাছ লাগাই। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ডাকিলে যাই। একটা কথা বলিব, ঘোঘরা বাসকালে দেখিতেছি যে কয়েকটি ইতিবাচক পরিবর্তন অবশ্য হইয়াছে। সাধারণ মানুষ অধিকার সচেতন হইয়াছে বর্তমানে, মুখে বোল ফুটিয়াছে, শিক্ষার প্রয়োজন বুঝিয়াছে। অর্থাৎ চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। জাতি বিষয়ে সংস্কারবদ্ধতা অর্থনীতিক চাপের ফলে কমিয়াছে। এই রকম কিছু ব্যাপার তো আছেই।

আবার ভোগবাদী মূল্যবোধ মানুষকে লোভী, নিষ্ঠুর ও অন্ধ

করিয়া ফেলিতেছে। ধনী লোকেও দানধ্যান করে না, টাকা বাড়ায়। সমাজের এক অংশে টাকা কমিতেছে, কিন্তু তাহা ব্যবহৃত হইয়া, কাজে লাগিয়া, মানুষের উপার্জনশীলতা বাড়াইতেছে না।

এইভাবে টানাপোড়েন চলিতেছে।

আমি বিবাহ করি নাই। সুবালা মণ্ডল নামে এক দুঃখী মেয়ে, (যাহাকে আমি বলি 'মেয়ে' আর যে আমাকে বলে 'মামা') আমার সংসারে কর্ত্রী। তাহার পুত্র গ্রেজুয়েট হইয়া ব্যাঙ্কে ঢুকিয়াছে। বিবাহ করি নাই বলিয়া মনে দুঃখ আছে কি না তাহা ভাবিতে আজও সময় মিলে নাই।

আমার অনুবোধ বা প্রস্তাব রাখিতেছি, বিবেচনা করো।

ঘুরিতে ঘুরিতে তোমার কাছে যাইব, তোমাকে লইয়া আসিব, ইচ্ছা হইতেছে। বাটী বড়, থাকিতে অসুবিধা নাই। অবৈতনিক স্কুল তবে দ্বিপ্রহরেও চালানো যাইবে। রিক্সাচালক, বাজার-ব্যাপারী, দিনমজুর, ধানভানারী, স্ত্রীলোকগণ, যে যেমন সময় পায়, আসে। সামান্য বাংলা, সামান্য পাটিগণিত, যে টুকু জানিলে কাজ চলে।

ইহাদের লইয়া থাকি বলিয়াই বাঁচিয়া আছি। তুমি আসিলে, থাকিলে, তোমারও ভাল লাগিবে বলিয়া মনে করি।

একই দ্বার দিয়া প্রবেশ করি, প্রস্থানও করি। তোমার ঘোঘরা ভাল না লাগিলে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিবে।

আশা করি না, পত্রের উত্তর আসা অবধি ঘোঘরায় থাকিব। হয়তো পরিব্রজ্যায় বাহির হইব। তবু উত্তর দিও। একলা আছ, সাবধানে থাকিও। একে স্বেচ্ছানির্বাসিত, তায় পত্নীশোকে কাতর, আবার বয়সও উনআশি। চেষ্টা করিয়া আর বারো বছর বাঁচিলেই একবিংশ শতক দর্শণ আমাদের ঠেকায় কে? ইতি তোমার সহসাথী ও প্রাচীন বন্ধু, শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়।'

পুঃ—ঘোঘরা নাম বিষয়ে শুনিয়াছি, বিল ও গোচর ভূমির কারণে এখানে কোনো রাজার গোগৃহ বা গোঘরা ছিল। তাহাই হইয়াছে 'ঘোঘরা'।

চিঠিটি পড়ে দেখেন। বেশ পছন্দ হয়। সযত্নে ভাঁজ করেন।

গৃহপ্রবেশের পর অপূর্বদার উৎসাহে একটা দেরাজ সম্বলিত টেবিল বসানো হয়, বাধ্যতামূলক পিঠ সোজা রাখা একটি চেয়ার। পাকা নিম কাঠের টেবিল ও চেয়ার, উই ধরে নি।

দেরাজে মধুকরের চিঠি রাখেন।

অনিরুদ্ধকে লেখেন জোড়া পোস্টকার্ড

ন'দিন সময় নিয়ে অনিরুদ্ধর চিঠি আসে।

'সত্বর চলে আসুন। বেরোবেন বলে প্রস্তুত হয়েই আসুন। পাস করানো যাবে। ঘুরে বেড়াবেন, সে জন্য ব্যাগ, জামা-কাপড় তো লাগবে।'

হরিণশিশুর মায়ায় পড়ে রাজা হলেন জড়ভরত। হরেনবাবু তো জানতেন না 'নবনলিনী' বাড়ির ওপর কি মায়া পড়েছে তাঁর। নারকেল গাছগুলো যেন ঠিক সময়ে ঝাড়ায় সুবালা। হরেনবাবুর শখের তেজপাতা গাছ থেকে কেউ যেন পট পট পাতা না ছেঁড়ে। যে চাইবে, নিজে তুলে দিও।

মায়ের ছবির পেছনের দেয়াল দেখো। স্যাঁতা লাগলেই ছবিতে ফাকুন্দ পড়বে। জেল থেকে বেরোবার পর ওঁদের গ্রুপ ছবিটিও যেন দেখা হয়। সন্ধ্যার ক্লাস চালাবে আলোক, মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। আলোক তিলকের ভাই।

তিলক সাইকেল রিক্সা তালা দিয়ে বারান্দার সামনে রাখবে। সে যেন ন'টা না বাজতে এসে পড়ে। কেরোসিন এনে রাখো, কেরোসিন। লোডশেডিং তো ঘনঘন হয়। রাতে উঠোন পেরিয়ে বাথরুমে যেও না। দরজা জানলা যেন বন্ধ থাকে। সন্ধ্যার পাঠশালা শেষ হলে ওদের বসার শতরঞ্চি যেন চৌকিতে তুলে রেখে যায়। মেঝেতে পড়ে থাকলে বৃষ্টির জল ঢুকে গোবর হয়ে যাবে।

ফল তরকারি তো তোমার। এবার বেশ করে টমেটোর বীজ ছড়াও। দামে বিকোবে টমেটো।

যে কোনো অসুবিধে হলে ডাক্তারখানায় ডাক্তার বাবুকে বোলো। উনি সাহায্য করবেন।

—এমন করচ কেন? সব ঠিক থাকবে। কৎ দিনের ঝান্তু যাচ্চো?

—কি করে বলি! ধরো দুমাস।

—ভেবো নি। ভালো মনে ঘুরে এসো।

ঘোঘরায় রটে যায় হরেনবাবু তীর্থ করতে যাচ্ছেন। তিলকের মা বলে, দেক এগবাবু! একেনে কোনোদিন শীৎলা থানেও মাতা ঠেকাল নে, একোন কোতা যাচ্চে।

ডাক্তারবাবু বলেন, মনে পড়েছে পাসের কথা? আরে, এমন সুযোগ থাকতে ঘোঘরা পড়ে আছেন? যান, যান, কাশ্মীরে যান, দক্ষিণ-ভারত দেখুন। দিল্লী-আগ্রা-খাজুরাহো-পুরী-কোণারক-হিমালয়ে নানা স্থান, ভারতবর্ষটা দেখুন! তারপর আবার বসবেন চেয়ারে, ব্রায়োনিয়া থার্টি লিখবেন।

—সরকার রেল খরচ দেবে তো শুধু।

—বাকি পয়সাও হয়ে যাবে। আমি হলে চার কাঠা জমি বেচে একটি বছর বেড়াতাম স্ত্রীকে নিয়ে।

—আপনি তো যান মাঝে মাঝে।

—হ্যাঁ, ভ্রমণ করলে মনের উদারতা বাড়ে।

ডাক্তারবাবু ভ্রমণ করেন, মেয়ের স্মৃতিতে ডাক্তারখানা খুলেছেন, প্র্যাকটিশ যথেষ্ট। অ্যালাপ্যাথ ডাক্তারটির দুই রোগী অনিনীত এনকেফালাইটিসে মারা যাওয়াতে তার ওপর মানুষের আস্থা কম। ডাক্তারবাবু ডাক্তারখানায় একটি ইনভার্টার কেনেন না, রোগীরা বসবে বলে আরেকটা বেঞ্চ কেনেন না। ঘরটি চুনকামও করান না। ভ্রমণ দ্বারা তাঁর মন খুব উদার হয় নি, তবে হরেনবাবু সে কথা বলেন না।

মোল্লা পাড়া ও পদোপুরের পুরনো লোকেরা দেখা করে যায়। তীর্থ যাত্রীকে দেখাও নাকি মঙ্গল।

সুবালা বলে, আগেকার কালে কেউ তীর্থ ধম্মে গেলে ইস্টিশানে যেয়ে কেত্তন গেয়ে বিদায় দিত।

—আমি তীর্থে যাচ্ছি এ কথা কে বলল ?

—আমিই বলিচি। কোতা ঝাবে, কেন ঝাবে, বাজার গেলে হাজার কতা। তা তীথে যাচ্চো বলতে সবাই ঝানো হালে পানি পেল।

ভজন মণ্ডল পঞ্চান্ন বছর বয়সে 'বাবা-মামা-কাকা' পড়তে শিখেছে। সে বলল, চলে আসবেন বাবু। আপনি না থাকলে আমাদের বড় নিভস্‌সা।

দেখ কাণ্ড ! হরেনবাবু ওদের 'ভসসা' হয়ে উঠলেন কবে ? ঘোষরা এমন করে শত মায়া জালে টানছে কেন ? হরেনবাবু বলেন, মায়ের নামে বাড়ির নাম। এটা এখন দেশ আমার। আসব তো বটেই।

—এট্টা চিঠি লেকাতেও তো আপনি।

—আসব ভজন, আসব !

ছিল, পোস্টাপিসে সাড়ে তিন হাজার টাকা ওঁরও ছিল। এক হাজার তুলে নেন হরেনবাবু। ক্যাম্বিসের প্রাচীন ব্যাগটিতে সুবালা গুছিয়ে দেয় পাঞ্জাবি, ধুতি, গামছা, দাঁতের মাজন, ইসবগুলের ভুসি, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, এক জোড়া রবারের চটি, আরেক জোড়া মোজাও, পোস্টকার্ড, বলপয়েন্ট আরেকটি, আর রুমাল।

হরেনবাবু সকলকে বলে যান তাঁর বাড়ির ওপর নজর রাখতে। আলোক যদিও তিলকের ভাই, এবং হরেনবাবুর সুপারিশে তার সাইকেল রিক্সা 'জয় সন্তোষী মা' হাইপোথিকেটেড টু পূর্বাশা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, তবুও সে মনে দ্বিধাগ্রস্ত ও নিয়ত চিন্তাকুল থাকে।

তার দ্বিধার মূলে আছে ভীরুতা, খানিকটা নৈতিকতাও তার বাধা, কেন না চোলাই মদ-চক্রের নিয়ন্তা খুবই নচ্ছার রকম প্রভাবশালী দু'জন লোক। এ জন্যে তারা টাকাও পায়। আলোকের টাকার দরকার খুব। চোলাই মদ চালান করলে সে টাকা পায় বেশি। কিন্তু নিয়ন্তাদের ও ভয় পায়। ও জানে যে, চোলাই মদ বইলে ও সমাজবিরোধী চক্রে পড়ে যাবে।

পারছেনা বলে গ্লানি, করার নামে ভয়, আলোক খুবই থোড়কুচো হয়ে আছে।

সে হরেনবাবুকে বলে, চুরির ভয় নে বাবু। আপনার বাড়ি ফ্যান, টি ভি, বাসন-কোসন, কাঁচা টাকা, কিছু পাবে না তা এ দিগরে সবাই ঝানে। আপনি নিচ্চিন্তে চলে ঝাও। চোরও আজকাল খবর নিয়ে আসে। ধরা পড়লে মার খেয়ে মরবে, তাও নিয্যস্। মারও খাবে, মেহনতেও পোষাবে না এমন বাড়িতে চোর ঢোকে নে। তবে ছিঁচকে চোর গামছা-ঘটি যা পায় নেয়।

হরেনবাবু অবাক। চোররা এখন এত বাছবিচার করে তা তো জানতেন না। তাঁর কাছে 'নবনলিনী' বাড়ির টিউবওয়েল, গাছ, ঘরের টেবিল-চেয়ার, সবই দামী। চোরদের কাছে তিনি 'ফালতু পার্টি?

সুবালা বলল, বকিস নি আলোক। আজকাল ডাকাত পড়তেচে, দরজা জানলা খুলে নে যাচ্চে···

আলোক প্রাজ্ঞ হাসি হাসল।

—ঘোঘরা একন টাউন। সে হতে পারে গাঁ গেরামে। কিন্তুক সেতা কার বাড়ির জানলা-কপাট-গরু নে' যায়? পাট্টিগত আক্রোশ থাগলে তেমনটা ঘটে। বাবুর ওপর কার আক্রোশ থাকবে? উনি তো কোনো পাট্টি করে নে।

—ঝা হোক, তুই এসে শুয়ে থাকিস।

—তা তো আসতেই হবে। আমি তো আটটার টেনের পর আর চালাই না রেকসা।

হরেনবাবু বললেন, কেন? যাত্রী পাও না?

—আটটার পর অন্যরা চালাবে। তকোন টেশনে থাগলে তারাও মারবে, পুলিশও মারবে। ঝারা লাইনে আচে, চুল্লু বইচে, তারা চালাবে তকোন। তারা পুলিশেরে টাকা দেয়, আমার অসাদ্ধ।

—তুমি যে দাওনা, এটা ভালো।

—দিতে তো হয়ই। থানা বলুন, পাটি বলুন, ঝে বলবে তারে দিতে হবে। চুল্লু বাইলে অনেক দিতে হয়।

—হ্যাঁ···চোলাই মদ তো এখন···

সুবালা বলল, ও পতে ঝাস নি।

—তাই ঝাই ককনো? কখন লাশ বওয়াবে। গিরিধারীর গাড়িতে তো বদনের লাশ···অন্যান্য জায়গার মতো ঘোঘরাও খুব অরক্ষিত, মস্তানকবলিত হয়ে গেছে বটে। চুল্লুর ঠেকে নিহত বদনকে মাইল খানেক দূরে পাওয়া গিয়েছিল কেন, এখন হরেনবাবু তা বুঝলেন।

—সবচে' ভয়ের হয়েচে পাট্টি। এট্টা থাগলে শান্তি। তিনটে পাট্টি মিলে অশান্তি করে দিল। চরণদাসের সঙ্গে কতা কইলাম তো অরুণবাবু শাসাল, ওর দলে যাচ্চ না কি? খুব কষ্ট বাবু, কার সঙ্গে কতা কইলাম, ঘরে নেমকম্মো হলে কারে ডাগলাম! ঝত রোয়াব গরিবের ওপর। উদিকে দেকুন রাজারাম পালের মেয়ের বে' হল, অরুণবাবু লোকজনাকে আসুন-বসুন করচে। তকন দোষ হয় নে।

সুবালা বলে, বাবুদের বিবাদ তো লোক দেকানো। ভেতরে দেক আমে-দুদে মিশে আচে। গরিবগুনোকে আগিয়ে দিচ্চে, যা, তোরা মাথা ফাটা ওদের।

হরেনবাবু ভাবলেন, কোন স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলাম, বর্তমানে স্বাধীনতার স্বরূপ কি, সেটা কত বড়ো, কি জটিল সমস্যা, সেটা সম্যক বুঝবেন কেমন করে? বোঝার প্রথম পাঠ ঘোঘরা থেকেই শুরু করতে পারতেন। সুযোগ ছিল।

আলোক কোনো গভীর ও তার পক্ষে দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় বলে, এ সব নে' তো কেউ ভাবে নে'। সদাসব্বদা ভয়ে ভয়ে থমকে থাকা। এতে মানুষ বাঁচতে পারে?

হরেনবাবুও তো ভাবেন নি। মজা হচ্চে, ভাবতে গেলেই তাঁর ওপর দলের ছাপ পড়ত। হ্যাঁ তিনিও তো আগের হরেন্দ্র রায় নেই। আর সম্ভব নয় রাত এগারোটায় খবর পেয়ে বৌবাজার থেকে পায়ে হেঁটে বাগুইআটি (বিশের দশকে ঘোর গ্রাম, গাছপালা, মোষে

ঘাসের জঙ্গল, পুকুর ডোবা, ছোট ছোট জনবসতি) গিয়ে সত্যানন্দদা'-দের সাবধান করা, নবীন পুলিশের ইন্‌ফরমার হয়ে গেছে।

সম্ভব নয় আগে পিছে তিন গয়লা নিয়ে কাঁধে বাঁক রেখে 'দই চাই' বলতে বলতে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ট্রেনে চেপে বসে নিকটতম নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানো। একবার তো আশ্রয়দাতা ওঁকে ঢুকিয়ে দিলেন তাঁর কাকার শববাহকের দলে। মড়া পোড়ালেন, স্নান করলেন, কাছা নিলেন, উদাস চেহারা করে সেখান থেকে পালালেন। সম্ভব নয় আজ, সেদিন চলে গেছে।

এখানে জনজীবনে যতটুকু জড়িয়েছেন, তার বেশি জড়াতে গেলে প্রচণ্ড বিরোধ আসত, রাজনীতিক ঘোলা জলে পড়ে যেতেন আলোক, আলোক! মনে মনে বলি।

প্রথমে গাঁ-গঞ্জের ইন্দিছিন্দিতে এমন করে রাজনীতি ঢোকে নি। সরকারি কর্মচারীরাও ছিলেন অন্যরকম। রাজনীতিক দলের বাধ্যতা-মূলক আজ্ঞাবাহক ছিলেন না। আর, রাজনীতিক স্বাধীনতা সংগ্রামী অনগ্রসর অঞ্চলে যদি প্রাথমিক স্কুল বসাতে চেষ্টা করতেন, তা হয়ে যেত।

তপশীলী মানুষদের জাতি-পরিচয়পত্র করানো যেত। বসানো যেত পানীয় জলের নলকূপ। বসানো যেত পুলিশ ফাঁড়ি (এখন থানা)।

কিন্তু ঘোঘরা যেমন বড় হতে থাকল, তেমান এটা ভোটার কেন্দ্র হয়ে উঠল।

চোলাই মদ তো মস্ত ব্যবসা।

ঠিকাদাররা রাস্তা তৈরি করতে টাকা মারে।

সাইকেল রিকসার লাইসেন্স হয় না বিনা ঘুষে।

তপশীলী ছাত্র-ছাত্রীদের টাকা মারা যায়।

দারিদ্র দূরীকরণের লোন পায় কারা?

এ সবে ঢুকতে চাই নি। প্রতিটির পিছনেই রাজনীতি ব্যবসায়ী ও অন্যদের নজর আছে।

আমার কোনো রাজনীতিক স্বার্থ নেই, সেটা জেনেই মানুষ আমাকে সহ্য করে।

বিকেলে ডাক্তারী করি, সন্ধ্যায় পাঠশালা খুলি। তোর কাকা যেদিন সই করল 'জগনাত মনডল', সেদিন আমার বুকটা ভরে উঠেছিল।

—কি ভাবতেচ মামা?

—হ্যাঁ···একটা কথা। আচ্ছা আলোক, জগন্নাথ কোথায় রে, তোমার কাকা?

সুবালা বলে, গত বছর মরল না? মরল, তুমি গেলে। সব ভুলে যাচ্চ?

—ও হ্যাঁ···কেমন ভুলে গেলাম হঠাৎ···

—ভেবে ভেবে এমনটা হচ্চে গো মামা।

সুবালা বড় মমতায় বলে, অত ভেবো না মামা। আমি বুকের পাঁজুর হেন আগলে রাকব, নিজিও সাবদান থাগব। এসে দেকবে ঝে স-ব ঠিক আচে। বলচো দু'মাস, তদ্দিনে টগর গাচে ফুল এসে ঝাবে। ও ঝে ডবল টগর লাগিয়েচ? আলোক, তুই আয় একন। মামাকে চা করে দিই।

জগন্নাথ! সন্ধ্যার পাঠশালার প্রথম ছাত্র। প্রৌঢ় মানুষটি কোদাল গামছা নামিয়ে রেখে বলেছিল, আমারে পড়াতে পার তো ঠাকুর, তবে বুজি তুমি মাস্টার বটে।

বোর্ড মুছে, শতরঞ্চি পেতে রাখত।

জগন্নাথ তো সত্যিই মারা গেছে যক্ষ্মায় দেহ পুড়ে খাক হয়েছিল। চোখ যেন জ্বলত। ছেলেদের বলত, আসপাতালে বলেচে দুধ, ডিম খাবে। ছাগলটা দুয়ে এট্টুখানি···

হরেনবাবু এক পো' দুধ রোজ করে দিয়েছিলেন। গরু শূন্য গোয়ালের এক কোণে পড়ে থাকত, ছোঁয়াচে রোগ! পদোপাড়া যক্ষ্মাশ্রম হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা যেমন, ব্যবস্থা তেমন। সেখানেই রাখা হয়েছিল ওকে।

—বাঁচব না সে তো ঝানচি ঠাকুর। কিন্তুক দুক্ষ রয়ে গেল কি ঝানো? কিচু পাওয়া হল না। পুকুরের ভাগ পেলাম না, জমির দাগ পালটে রাজারাম পাল নে' নিল, আর গাচের মতো গাচ ছিল তেঁতুল গাচটা, আমারে চিকিচ্ছা করাতে সেটা বেচে দিল ছেলেরা। এসেছিলাম ল্যাংটো ফকির, যাচ্চিও ল্যাংটো নিসম্বুলে ক্যাঙালি!

—জগন্নাথ! অত ভেব না।

সুবালা একদিন রসগোল্লা নিয়ে গেল। চেনাজানা মানুষ মরছে জানলে তার সাধের জিনিস খাওয়ালে পুণ্য।

খেতে পারে নি দুটোর বেশি।

—আহিংকে খুব। অনেক খাই, খেয়ে সেরে উঠি, কিন্তুক সে আর এবারে হবে নে। মুক খেতে চায়, গলা দে' নামে নে।

যাবার কালেও হরেনবাবু সামনে ছিলেন. দাহের খরচ তুলতে হয়েছিল পাঁচজনের দোরে। অথচ সে কথাটা এমন বিস্মরণ?

সুবালা বলে, চা খাও।

চা খান হরেনবাবু। এখন দেখা যায় মোটা কাচের নিচে চোখ দুটি বিস্মিত, অসহায়।

—তুমি শরীল ভাল রেকো। ঝাল মশলা সয় নে, গরম ভাত জুইড়ে খাও, তারা তো জানবে নে। শরীল এট্টু এমন তেমন হলে চলে এসো।

—আসব, আসব। নিজের বাড়ি, তুমি আছ…

—তোমা বিনে আমি তো ভেসেই ঝাব। এ সব গরিবগুরবো লোক কতখানি ভস্‌সা করে।

—না না, আমি এখন অনেকদিন আছি। আর বারোটা বছর তো বাঁচতেই হচ্ছে, বুঝলে সুবালা! এই শতাব্দী শেষ হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দী আসছে…

—ঝে আসবে আসুগ না কেন? তীথে যাচ্চ, তীথ চিহ্ন কিছু এনো, আনতে হয়।

সুবালার মাথা থেকে 'তীর্থ' ব্যাপারটা বের করা যায় না।

অরুণবাবু ডাক্তারখানায় বলে, তীর্থে যাওয়া ভালো, মানে ওল্ড এজে। আমি তো এর মধ্যেই অনেক দেখিয়ে দিয়েছি বউকে আপনার পাসও আছে।

—তীর্থ নয় ভাই! এখানে ওখানে…

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রিলেটিভদের দেখে আসুন। এখানে তো আপনার আপন বলতে কেউ নেই।

হরেনবাবুর বলতে ইচ্ছে হয়, ছাব্বিশ বছর যাদের নিয়ে আছেন, তারাই ওঁর আপনজন। বলেন না।

রাজারাম পালের মস্তান ছেলে বলে যায়, গোয়াটা দেখে আসবেন। ঠিক যেন ফরেন জায়গা।

'ফরেন' ভাইরাসে ঘোঘরাও আক্রান্ত।

যার পয়সা আছে, সেই 'ফরেন' জিনিস আনায় নানা সূত্রে।

অবশ্য 'জয়বাংলা' মার্কা যে সব জামাকাপড় রিকসা চালকরাও পরে, তাও তো ফরেন।

কলকাতা রওনা হবার দু'দিন আগে পিসতুত দাদা যতীশের নাতি, ক্যানিং এলাকার জেণ্টলম্যান ফার্মার (সীতেশের নিজের দেওয়া সংজ্ঞা) সীতেশ দত্তের চিঠি আসে।

'ঠাকুরদা', পিতামহ যতীশচন্দ্র দত্তের নামাঙ্কিত স্কুল হাইস্কুল হইল। এমন শুভানুষ্ঠানে আপনি আসিলে যারপরনাই খুশি হইব। পরিবারে অন্যেরা আপনাকে দেখে নাই। তাহারাও যারপরনাই খুশি হইবে। কলিকাতা ও অন্যত্র সকলকে পত্র দিয়াছি। আমার ও আমাদের প্রণাম লইবেন, অবশ্য আসিবেন।'

পিসতুত দাদা যতীশ ও সতীশ।

সতীশ সেদিনের পক্ষে দুরারোগ্য টাইফয়েড রোগে মারা যান ১৯২১ বা ১৯২২। ঢাকা শহর সে সময়ে খুব উত্তেজিত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর প্রত্যাবর্তনে। ভাওয়াল সন্ন্যাসীকে অলৌকিক শক্তিধর মনে করা হতো। সেদিন আন্দাজে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর প্রচার বিভাগ খুব কর্মদক্ষ ছিল। সন্ন্যাসীকে রোগীর বাড়ি নেওয়াও হত।

রাঙাপিসির মাথা কোটাকুটিতে সন্ন্যাসীকে আনা হয়েছিল এবং তিনি মাথা নেড়ে চলে যান। সতীশ মারা যান। রাঙাপিসিও বেশিদিন থাকেন নি আর। সতীশের তত বয়স হয় নি। জুট মিলে চাকরি করতেন।

যতীশ দত্ত দীর্ঘজীবী হন। তাঁর বড় ছেলে বিকাশের ছেলে এই সীতেশ। তিন বোনের পিঠে এক ভাই। যতীশের আরেক ছেলে মোহিত 'মোহিত গু কোম্পানি' করেছে। মোহিত সপরিবারে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা।

সীতেশ হয়ে গেল সম্ভ্রান্ত কৃষক। বয়স, তা চল্লিশই হবে।

যতীশ দাদা স্বাধানতার আগেই ক্যানিং শহরে জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন। ধানের জমি, মাছের ভেড়ি, স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সিংহের এবং স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের সমর্থক, অবসর গ্রহণের পর ব্যস্ত জীবন।

হরেনবাবুদের সম্পর্কে বলতেন, আমরা মামা মামীর দয়াতে মানুষ। তাঁরা ছিলেন দেবতা। ছেলেগুলো সব রাজনীতি করল, জেলে পচছে। তাঁরা দেখলে কি দুঃখ পেতেন।

স্বাধীনতার পর সগর্বে বলতেন, আমাদের পরিবার কি যেমন তেমন? এতগুলো ছেলেকে দেশ সেবায় দিয়েছি আমরা, সোজা কথা নয়।

তাঁর ছেলে বিকাশও জমি বেচাকেনা করত।

বিকাশের ছেলেরা ভাগাভাগি হয়ে যায়। সোমেশ ও ক্ষেমেশের খবর জানেন না হরেনবাবু।

সীতেশ সম্ভ্রান্ত চাষী। হরেনবাবু গর্বই অনুভব করেন। শিক্ষিত ছেলে চাষবাস করছে, এ তো ভালো। কৃষিতেই লক্ষ্মী।

সীতেশের কাছেই আগে যাবেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীর বিনা ভাড়ায় রেলে ভ্রমণের প্রথম ঠিকানা ক্যানিং লোকাল ধরে, অতঃপর বাসে হাজিডাঙা। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটা নিরর্থক হবে। সাউথ সেকশানে শ্রেণী ভেদ করা নিরর্থক। কিন্তু তার আগে কলকাতা।

হরেনবাবুর উৎসাহ হয়।

দুই

করুণা, কল্যাণী, অনিমেষ, অনিরুদ্ধ, হরেনবাবুকে কোথায় রাখবে, কি ভাবে যত্ন করবে, ভেবে পায় না।

করুণার ছেলেমেয়ে জয় ও জয়া, কল্যাণীর ছেলেমেয়ে কিন্নর ও কঙ্কণা অবাক হয়ে জননীদের দেখে।

করুণা তো কেঁদেই ফেলে।

ধন্যি মানুষ তুমি ছোট কাকা। এমন নিষ্ঠুর হতে পার? না থাকলে দেখতে আসতে, আমার কথা মনে পড়ে না?

সুবালা বড়ি দিত, তা জানতেন হরেনবাবু। কিন্তু সে একটি বড় চটের থলি মুখ সেলাই করে দিয়েছিল। সেটা বেজায় ভারি। ওখানে তুলে দেয়, এখানে অনিরুদ্ধ নামাল। হরেনবাবু বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে অটোরিক্সা চেপে বাড়ি এলেন। এই প্রথম অটোরিক্সায় চড়লেন।

বাড়িতে ঢুকে অনিরুদ্ধ বলল, এ থলিতে কি? লোহা লক্কর এনেছেন? এত ভারি?

—সুবালা জানে।

কল্যাণী সেলাই কাটল থলির।

নারকোল, খণ্ড খণ্ড থোড়, বড়ি, এতগুলো কাঁচা পেঁপে, কাঁচা লঙ্কা, গোটা কুড়ি কাগজী লেবু।

—সব গছের, ছোট কাকা?

—বাড়িরই। তোমরা তো যাবে না, দেখবে না। ছেলে-মেয়েরাও একটু আনন্দ পায়।

অনিমেষ বলল, মাছ ধরা যাবে?

—মাছ যদি ধরা দেয়! পুকুর আছে কারো কারো। ওঃ, কলকাতা আসিনা তো! কি মানুষ, কি ভিড়, ফুটপাথ বলতে নেই একেবারে।

—তাও তো বর্ষাকালে আসেন নি।

—আমাদের কলকাতা আর নেই কোথাও।

—ওঁর হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দাও। চা জলখাবার দাও. হাঁপিয়ে গেছেন।

দু'ঘণ্টারও কম ট্রেনে এসেছেন। যেন কত পথ পাড়ি দিয়ে নতুন কোনো দূর দেশে এসেছেন।

—তোমাদের বাড়িটার আশেপাশে…

—হাইরাইজ বিল্ডিং সব,—অনিমেষ বলে, আমরাই এখন এ বাড়ি বেচলে অনেক টাকা পাব, যে দশতলা বাড়ি উঠবে, তাতে দুটো ফ্ল্যাট পাব।

—তোমরা বেচবে না কি ?

—না, দোতলা তুলব। দু'ছেলে, দু'মেয়ে সবাই যাতে থাকতে পারে।

বাড়ির সবাই প্রণাম করেছে দেখেই হরেনবাবু মুগ্ধ। তা ছাড়া বাইরের ছোট ঘরে কাচের দুটো আলমারিতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, এঁদের গ্রন্থাবলী। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, একটি 'ছো' মুখোশ। টেবিলে ঘরে বোনা লেসের ঢাকনি। গৃহস্থ পরিবেশ।

—কি পড়ে এরা ?

—জয় আর কঙ্কণ। সেভেনে, কিন্নর আর জয়া সিক্সে। কিন্নর ক্লাসে প্রথম হয়।

—ওরা পড়ে কোথায় ?

—মেয়েরা আমার স্কুলে। ছেলেরা যোধপুর পার্কে।

—বাংলা মাধ্যম ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—যাক ! তোমরা সুস্থ আছ। ঘোষরা থেকে মায়েরা ভোরের ট্রেনে শিশুদের আনে কলকাতায় ইংরিজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতে। খুব ঝোঁক বেড়েছে।

অনিরুদ্ধ একটু হাসে।

—বাংলা স্কুলে ছেলেমেয়ে পড়াই, আমরা তো এখন খুব অনুন্নত বলে গণ্য। আসুন, হাত মুখ···

করুণা ওঁকে নিয়ে যায়। হাত মুখ ধুয়ে লুঙ্গি পরে যেন বাঁচেন। না, বাড়িটা ভালোই। পাঁচটি ঘর। উঠোনে বাতাবি লেবু ও গন্ধরাজের গাছ।

—টিউবওয়েল করেছিস?

—লোডশেডিং হলে জলের টান, কলের জল তো সময় মাপা। টিউবওয়েল থাকাতে সুবিধা অনেক ছোট্‌কা। ভালো জলটা পাই।

—রাঁধিস না কি এখনো?

—দু'জনেই করি। ঠিকে ঝি দু'জন। তারা এ-বেলা ও-বেলা কাজ করে। ছেলেমেয়েরা বিছানা তোলে, পাতে, নিজেদের বই কাপড় গোছায়। তোমার জামাই বাড়ি চালায় তো!

চায়ের সঙ্গে লুচি, তরকারি, মিষ্টি।

—এত আমি খাই না রে মা!

—খান! ওখানে তো খাওয়া হয় না।

—কে বলল? নিয়মে খাই, কেমন ফিট আছি দেখ। বয়স তো পঁচাত্তর হল।

বিকেলে ছেলেমেয়েরা ছোটে পার্কে—অনিমেষ বলে, পার্কটা আছে তবু। ছেলেমেয়েদের খেলার জায়গাই তো নেই। পাশের জমিটায় খেলত, বাড়ি উঠে গেল।

করুণা বলে, বোসো ছোট্‌কা। কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যা দিয়ে আসি।

হঠাৎ ওকে বড় বউদির মতো লাগে যেন। ওর বয়সে বড় বউদি ওর মতোই ছিলেন। করুণাও তো চল্লিশের ঘর পেরিয়েছে।

—বরুণ, শীলা, নীলা, গীতিময়, শুভময়, খবর কি সব? যে-যার মতো ভালো আছে তো?

—ভালোই আছে মনে করি···

অনিরুদ্ধ বলে, ছোট্‌কাকাকে ওঁর ঘরে নিয়ে যাও। উনি একটু

বশ্রাম করুন, তোমরা গল্প করো, আমি আর দাদা একটু ঘুরে আসি। ামাদের মামা মারা গেছেন ছোট্‌কা। কাজ ছ'দিন বাদে। একবার াই।

কল্যাণী বলে আমি রান্নাঘরে যাই।

বাড়িতে রেফ্রিজারেটার ও টেলিভিশান আছে, দেখে নেন হরেন-াবু—চারজনই চাকুরিয়া, থাকতেই পারে।

করুণা বলে, আগে জানতাম ফ্রিজ বড়লোকের বাড়ি থাকে। খন বুঝছি, আমাদের সুবিধাই হয়। রোজ বাজারে যাবে কে? দির স্কুল সকালে, আমার ও দাদার সাড়ে দশটায়। আর ও তো াড়ে দশটায় রাইটার্সে পৌঁছবেই।

—শুনি যে সবাই দেরীতে যায়?

—ও তো যায় না। মেয়েদের আমি নিয়ে যাই। পাড়ায় কটা বাস আসে, ছেলেরা যায়। প্রাইভেট বাস, স্কুল সার্ভিস দেয়। ঘরটা আমাদের, ও ঘরটা দাদাদের। এ ঘরটায় মেয়েরা থাকে, ামা কাপড় সবই এ ঘরে। এটা ওদের পড়ার ঘর। ছেলেরা রাতে ায়। এই ঘরটায় তুমি থাকবে।

—এমনিতে কে থাকে?

—কেউ না। অতিথি অভ্যাগত তো লেগেই থাকে। দিদির :পর বাড়ি ফরিদাবাদে। ওঁরা মাঝে মাঝে আসেন।

—ওরাও যায় ফরিদাবাদ?

—জয় আর জয়াও গেছে দু'বার।

করুণা ঘরে ঢোকে। ছোট খাট। টেবিল, চেয়ার, ছোট লনা, আর ছাত অবধি কাঠের তাকে অনেক বই। বাংলা, ইংরিজি।

—ঘর পছন্দ হয়েছে?

—খুব।

—বেরিয়েই বাথরুম। এ বাড়িতেই সব ঘরেই বই। বই কেনে াই, উপহারেও বই। এবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইগুলো পূর্ণ হল। মা খুব ভালবাসতেন।

—একটু গড়িয়ে পড়ি।

—হ্যাঁ ছোট্‌কা···তুমি এসেছ···

তারপর করুণা বলল, এই প্রথম আমার বাড়ির কোনো লোক বাড়িতে রাতে থাকছে, ভাবতে পারো ?

—বরুণ কি আসে না ?

—সবাই খুব বদলে গেছে ছোট্‌কা···তোমার জামাইকে তো কেউ পছন্দই করে না। অমিশুক, অহংকারী···দাদা চিঠি লেখে বটে ছোড়দা এখন পামেলা টিংকারটনের ডাইরেক্টর, লাউডন স্ট্রীটে ফ্ল্যাট ওখানে দাদাও একটা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে। তোমার জামাই তে অমিশুক নয়, তবে অত সায়েবিপনার মধ্যে অসহজ বোধ করে আমি যেতাম বরাবর, ছেলেমেয়ে নিয়েই যেতাম। হঠাৎ একদি বউদি বলে বসল, করুণা, কাপড়টা বদলে নেবে ? আমার ম মাসিমা এসেছেন।

—কাপড়ে কি দোষ করল ?

—তাঁতের কাপড়, অথচ দামী নয়.

—বউমা এ কথা বলে ঠিক করে নি . .

—তারপর দেখি, নেমতন্ন করলে ছোড়দা একা আসে, বউ ব ছেলেমেয়ে আনে না। দিলাম একদিন ছোড়দার কথায় তার সঙ্গে ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে। পরদিন ফিরে এসে জয় বলে, আর যাব ন মা। মিমির বন্ধুরা এসেছিল, সব ইংরিজিতে কথা। তারা বলল ওরা কে ? মিমি বলল, আমার পুওর কাজিন ওরা

—পুওর কাজিন !

—ভাবো ! রাগে অপমানে···গেলাম ওখানে। বললাম মিমিকে তোমরা কি শিখিয়েছ ? আমার ছেলেমেয়ে পুওর কাজিন ছোড়দা তো অপ্রস্তুত। মিমি ছোট্ট মেয়ে, আট বছর বয়স, বলছে যে মা তো তাই বলে। ওদের তে ভালো জামা নেই, গাড়ি নেই, আর ওন্‌লি বেংগলি পড়ে।

—বরুণটা কি বলদ হয়ে গেছে ?

—বউদিই কি এরকম ছিল? তারপর থেকে ওদের এড়িয়েই লি। মনে লাগে। তোমার জামাই ওদের কাছে বোকা। টাকা রতে জানে না।

একটু থেমে করুণা বলে, ছেলেমেয়েদের তো প্রাণপণে আগলে লি, যাতে প্রকৃত মূল্যবোধ শেখে। তবে দিনকালের যা প্রভাব, রাও বড় হয়ে ওদের বাপকে "টাকা করো নি, বোকা" বলতে পারে। ভাগবাদী সমাজ ছোট্‌কা···

—এই দেখ! সকলের সঙ্গে দেখা করে যাব একবার···আমাকে দখলে বরুণের মেয়ে···

-না, তোমার একটা, যাকে বলে গ্ল্যামার আছে। আদর্শবাদী, াধীনতা সংগ্রামী, সিম্প্‌ল লিভিং, ইত্যাদি।

—কার ছেলে বরুণ, তা মনে রাখে না!

—ওই প্রশ্নটা আমারও। ঠাকুমার কথা শুনেছি, মাকে দেখেছি, াবা কাকাদের দেখেছি···তাদের ছেলেমেয়েরা···ভালো কথা, 'কাকার আশ্রম থেকে কি গিয়েছিল কেউ তোমার কাছে? রা বিবেকানন্দের জন্মদিনে আশ্রমের পঁচাত্তর বছরের উৎসব রবে·

—যায় নি তো কেউ?

—যাবে। পারলে যেও ছোট্‌কা। আমি দু'বার গেছি খুব াল লাগে পরিবেশটা।

করুণার চুলে পাক ধরেছে। বড় বউদির চুলেও তাড়াতাড়ি পাক রেছিল।

—শীলা, নীলা। ওরা?

—শীলা তো ব্যাঙ্কের অফিসার। ব্যস্তই থাকে। ওর স্বামী চেম্বার ফ কমার্সে—ক্যামাক স্ট্রীটে দু'বোন বাড়ি কিনেছে। নীলা কলেজে ড়ায়, ওর স্বামী কোল ইণ্ডিয়ায়।

—ওদের ছেলেমেয়ে একটি করে?

—শীলার এক মেয়ে, নীলার তো এক ছেলে। দু'জনেই মেয়ে,

ছেলে রেখেছে হস্টেলে, ঋষি ভ্যালিতে। পশ্চিমবঙ্গে থাকলে না লেখাপড়া হয় না।

—ইলা বহরমপুরে?

—হ্যাঁ। স্বামী কনট্রাকটার। ইলার ছেলে নৈনিতালে। ইলা একবার দেখে এসো। ও খুব লেখে। সেবার আমরা গেলা দেখলাম মুর্শিদাবাদের সব দেখার জায়গা।

—রাঙাদার ছেলেরা?

—খুবই ভালো প্র্যাকটিস। গীতিময়ের বউ বিউটি পার্ল চালায়। ওর ছেলে লা মার্টিনিয়েরে পড়ছে। শুভময়ের বউ ক ইনটেরিয়র ডেকোরেশান। শুভময়ের ছেলেমেয়ে হল না। বিন তো পাটনায়, স্বামী আই এ এস। ছেলে হাজারিবাগ সে জেভিয়ার্সে পড়ছে। বিনতা এদিকে আসেই না।

—ওদের মধ্যে যাওয়া-আসা আছে?

—খুব। প্রতি মাসে এর বাড়ি নয় ওর বাড়ি খাওয়া-দাও হয়।

ঈষৎ হেসে করুণা বলে, আমিই খুব দলছুট হয়ে গেছি। শাল বলে, দিদি, তোর একটা বাঙালী উন্নাসিকতা হয়ে গেছে। আ উত্তর দিই না। শুধু মনে হয়, বাড়িতে বাবারা, মানে তোম রাজনীতি করলে সবাই। লেখাপড়া তো আমরা সবাই বাংলা স্কুলে করেছি। মেয়েরা বেলতলা, ছেলেরা বালিগঞ্জ গভরমেণ্ট স্কুলে। তা কি কোনো অসুবিধে হয়েছে?

—দেশে নাম করার মতো সব মানুষই তো ভার্নাকুলার স্কু পড়েছেন।

—শুধু ইংরিজি স্কুলের ব্যাপার নয়। বাড়ি, গাড়ি, টাকা, শা পার্টি, এগুলোই যেন সব। বুঝতে পারি না। আমরা একান্নে আ এটাও নাকি খুব অচল এখন।

—এইসব ধারণা তো ঠিক নয়। তোমার মা কতজনের ভ সহ্য করে গেছে।

—বাবাও শেষ জীবনে খুব একলা হয়ে যায়। বুড়ো বয়সে মানুষ চায় মানুষের সঙ্গ।

—সত্য কথা।

—আমি এখন আর ভাবি না। ছেলেমেয়ে মানুষ হোক, আর কিছু নয়।

—তোরা তো ভালই আছিস।

করুণার মুখ আলো হয়ে যায়।

—তা আছি। বছর বছর পুজোর ছুটিতে আমরা বাড়ির সকলে বেড়াতে যাই। ওদের পরীক্ষা থাকে ছুটির পর, ফিরতে হয়। তবু দিল্লীর দিকটা, রাজস্থান, অজন্তা ইলোরা, দক্ষিণ ভারত, অনেক বেড়িয়ে নিয়েছি।

—ভ্রমণ তো খুব ভালো। তা···ওদের নিজেদের যে যার সংসারে সম্প্রীতি তো আছে?

—বোধহয়! তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে ওদের?

—এইটে আশ্চর্য, কাছে থাকি না, ভাবি না। কিন্তু মনের মধ্যে তো থাকে। এখন···সকলের কথাই মনে হচ্ছে।

—তুমি ভেবো না তো।

করুণা সস্নেহে বলে, তুমি যেদিন বলবে, ওদের আগে জানাব। একেক জনের বাড়ি নিয়ে যাব।

—আগে ঘুরে ফেরে আসি।

—কত ঘুরবে ঘোরো না। তোমার জামাই তো আমাদের ট্র্যাভেল গাইড। "ভ্রমণসঙ্গী" নিয়ে বসে আছে। তুমি কোনদিকে যেতে চাও বললেই ও সব বুঝিয়ে দেবে।

—ভালো কথা, শাঁতেশের চিঠি পেয়েছিস?

—ওই স্কুলের ব্যাপারে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। পিতামহের নামে স্কুল, ভালই তো।

—আমাদের তো এসে বলে গেছে।

—যাবি তোরা?

—এখন তো অসম্ভব।

—যাক, তোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে ?

—আসে, "পিসি পিসি" বলে। মাছের ব্যবসাও তো করে বলে শুনেছি। সোমেশ ক্ষেমেশকে ও দারুণ ঠকিয়েছে। ওরা একজন শিবসাগরে, আরেকজন ভাইজাগে কাজ করে। সীতেশ ওদের জমিজমায় ঠকিয়েছে। সোমেশের বউ আবার আমার জায়ের মাসতুতো বোন।

—পৃথিবীটা বড়ই ছোট।

—তা, তুমি ছোট্কা, ঘুরতে যাচ্ছ বলে আমার কাছ থেকে সামান্য টাকা নেবে কিন্তু।

—টাকা আছে রে মা।

—তবুও নেবে। বাবা নেই…আছ বলতে তুমি…মেয়ের কাছে নেবে না কেন ?

—নেব রে মা ! অমন করে বললে…

—তোমার বাড়িটার কি করবে ?

—সুবালা বসবাস করবে, আর তোর ঠাকুমার নামে একটা কিছু…দাতব্য চিকিৎসালয়…

—খুব ভালো হবে ছোট্কা ! সুবালাদি তো থাকবেই। ও তোমার জন্যে যা করে।

—হ্যাঁ…আর কি ! ওর ছেলে গোপালটা তো মানুষ হল না…

—অ ছোট্কা ! "মানুষ" শব্দটার মানেই তো পালটে গেছে এখন। তুমি গোপালের কথা বলছ ? তোমার দাদাদের ছেলে-মেয়েদের দেখ না ! দেশের জন্যে তোমরা জেল খাটলে, কাজ করলে …এরা কেন এমন হয়ে গেল ? আগে তো এমন ছিল না। ক্রমে ক্রমে…তুমি তো কত টাকা করতে পারতে…

—না রে মা ! স্বভাবেই নেই। তা ছাড়া আমি তো ভালো আছি। সকালে দোকানে বসি, বিকেলে বাড়িতে রোগী দেখি, সন্ধ্যায় চালাই সন্ধ্যার পাঠশালা।

—তোমার কথাই আমরা ছেলেমেয়েদের বলি। বলি, যে তোমরাও একদিন অন্তত কিছু মানুষকে দাদুর মতো লেখাপড়া শেখাবে। ওরা তো চারজনেই উৎসাহী।

—ওটা কি, টি ভি চলছে ?

—হাঁ, দাদা খবর শুনছেন। তুমি যাবে ও ঘরে ? টি ভি তো দেখ না।

—বাড়িতে শিক্ষার্থী ছেলেমেয়ে…

—খেলা দেখার নেশায় বাপ জ্যাঠা কিনেছে। আমরাও দেখি। ছেলেমেয়েরা দেখে, কম দেখে।

—চোখের পক্ষেও খারাপ।

—তোমার চোখ টোখ কি দেখাবে ?

—না, সব ঠিক আছে।

—চলো ও ঘরে। খাও ক'টায় ?

—ন'টা নাগাদ। রাতে তো…

—হ্যা, দুধ খই খাও। সেবারও তো থেকে গেছ। অবশ্য চোখ বাঁধা থাকত।

—করুণা, সেবার কিছুই লক্ষ্য করে দেখিনি।

—চোখ নিয়ে তখন…আজ একটু খেও। দাদা বাজার করে এনেছে।

—করুণা, দু'একদিন হল আমি যেন মাঝে মাঝে বড্ড ভুলে যাচ্ছি সব। সেবার ছেলেমেয়ে ছিল কোথায় ?

—দাদা আর দিদি ওদের নিয়ে পুরী গিয়েছিল। তুমি এলে, আমরা থেকে গেলাম।

—দেখ, একেবারে বিস্মরণ !

—হ্যাঁ ছোট্‌কা, শরীর ভালো আছে তো ? এই যে ঘুরতে যাচ্ছ…

—শরীর·· ভালো। তবে বাড়ির ছেলেমেয়েদের পরিণতি শুনে দুঃখ পেলাম। দোষটা তো আমাদের সকলের মা। স্বাধীনতার পর

স্বাধীনতা হয়ে গেল পুঁজি, সবাই সে পুঁজি খাটাতে আর ধনী হবার দিকে মন দিল।

—"সবাই" নয় ছোট্কা।

—আহা, "সবাই"টা কথার কথা।

—তারপর?

—স্বাধীনতার পর তো মানুষের সেবা, দেশ সেবার দরকারটা বেশি ছিল। প্রাচীন মূল্যবোধের ভালোটুকু গেল। ভোগবাদী মূল্যবোধ গড়ে উঠল, ফলে এরকম গণ্ডগোল। এ একটা নতুন সমাজ মা। দেশের সঙ্গে যোগ নেই। যাক গে, চলো যাই।

—তোমার ঘুম ধরেছে।

—তাও ধরেছে।

—বাথরুমে তো যাবে একবার।

—মনে থাকেও তোর।

—চলো। তারপর যা খাবে খেয়ে শুয়ে পড়ো। ও তোমার রেলের পাস-টাস সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। একটা ছবি তুলতে হবে, তোমাকে যেতে হবে।

খেতে বসে বড় বড় পার্শে মাছ দেখে হরেনবাবুর মনে হয় ঘোঘরাতে তাঁরা চুনো-চাপটা ছোট মাছই খান। দু'শো মাছ তিনি আর সুবালা।

—জিগ্যেস করতেও ভয় করে, দাম কত?

—ষাট টাকা।

কল্যাণী বলে, আমাদেরও আপনার জন্যে আজ এ মাছ খাওয়া হল। আমাদের প্রত্যহ দিনে নিরামিষ, রাতে মাছ। মাংস মাসে একদিন।

—হরেনবাবু বলেন, আজ ভাবা যায়? লবণ হ্রদে এসব মাছ কত উঠত, জলের দাম মনে হয় আজ। আর বড় বউদি যা রান্না করতেন, অমৃত!

—আপনি রোজ মাছ খান?

—ওই যেদিন যেমন হয়।

—সুবালাদি' তো যত্ন করে!

—মায়ের মতো।

কয়েকদিনে পাস হয়ে যায়।

অনিরুদ্ধ বলে, মূল্যবান পাসপোর্ট পেয়ে গেলেন ছোটকাকা। "ভ্রমণসঙ্গী" রেডি, আরো খবরাখবর রেডি। এখন ধরুন অক্টোবরের শেষ। কেমন জায়গায় যাবেন, শীতের পোশাক লাগবে কিছু।

অনিমেষ বলে, এ সময়ে সমুদ্রের ধারটা ভাল।

কল্যাণী বলে, দক্ষিণ ভারত খারাপ কি?

অনিরুদ্ধ বলে, কাশ্মীর থেকে কামাখ্যা, হিমালয় থেকে রামেশ্বরম যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবেন।

জয়া বলে, কি মজা!

জয় বলে, দাদু পাসে যাবেন?

—হ্যাঁ।

জয় খুবই কৌতূহলী।

—দাদুকে কেন পাস দিল? আমরা তো টিকিট কেটে যাই। দাদু কি রেলে চাকরি করতেন?

অনিমেষ বলে, তোমার দাদু স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, কত বছর জেল খেটেছেন, ভারত সরকার ওঁকে সে জন্যে পেনশান দিয়েছে, পাস দিয়েছে। স্কুলে সগর্বে বলবে সবাই আমাদের দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী, আর ওঁর মতো হতে চেষ্টা করবে।

—কি করে? সায়েবরা তো পালিয়ে গেছে। দাদু, তোমরাই তো তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, তাই না?

—এ বড় জটিল প্রশ্ন দাদুভাই।

—তুমি কি বন্দুক দিয়ে সায়েব মারতে?

—সব কথা বলব একদিন।

করুণা বলে, একটা ছুটিতে দাদুর কাছে চলে যাব। তখন বসে যত গল্প পারো শুনো। সুবালাদিদি রান্না করবে, আমাদের ছুটি। আমরাও গল্প শুনব। সত্যি ছোট্‌কা, তোমাদের কথা আমরাই কত কম জানি।

কল্যাণী বলে, একটা বই লিখুন। দেশের মানুষ তো জানল না আপনাদের কথা।

অনিরুদ্ধ বলে, ফার্স্ট ক্লাস পাস। প্রথমে কোথায় যাবেন তাই তো বললেন না।

হরেনবাবু ঈষৎ হেসে বলেন, কাজিডাঙা।

—শেষ অবধি কাজিডাঙা?

—এই তো শুরু।

করুণা বলে, খুব ভালো। স্বচক্ষে দেখে এসে বলো তো, শুনি।

—সাঁতেশ তো যা বলে গল্প মনে হয় না।

অনিরুদ্ধ বলে, গল্প হলেও সত্যি।

—গল্প কোথায়? সবই তো সত্যি।

—ব্যাগে ঢুকেছে পুরো হাতা গরম গেঞ্জি। অ ছোট্‌কা। ও সব জায়গায় জোলো ঠাণ্ডা। শরীরটা টনকো রেখেছ, হঠাৎ যদি বাত ধরে যায়? মোজা দিলাম, আর এ সোয়েটারটা প্রায় নতুন।

—বাঁদুরে টুপি আর মাফলার দিলি না? আরে, ঘোষরাতে কি ঠাণ্ডা কম? ঠাণ্ডা লাগার ধাত একটা থাকে। আমার সে ধাত নয়। অনেক দিস না মা।

—আলোয়ানটা রাখো।

—কিনে দিলি?

—দিলাম। তোমার জন্যে যা করা উচিত, তা কি করি? ওদের কথা সাতকাহন বললাম, নিজেও তো খুব স্বার্থপর হয়ে গেছি। কতটুকু ভাবি নিজের বাইরের দুনিয়া নিয়ে?

ফিরে যাবার পথে ওদের দেখে যাবেন, করুণা শৈশবেই খুব ভালবাসার কাঙাল ছিল, এখন যেন আরোই হয়েছে। বরুণরা যে

যে খুব পালটে গেল, সে, দুঃখটা করুণার বাজত না, যদি করুণার বাপ' কাকারা স্বার্থপর সুযোগসন্ধানী হতেন। তাঁরা তো তেমন ছিলেন না।

অনিমেষ বলছিল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যাদের ভোল পালটে গেল, তাদের কি পরাধীন ভারতেই কোনো আদর্শবাদ ছিল? থাকলেও তার মূল খুব গভীরে ছিল না।

ছিল, কারো কারো ছিল অনিমেষ, অনেকেরই ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর যে কাজ করার দরকার ছিল, প্রকৃত দেশপ্রেম ছাড়া তা করা যায় না। প্রাক স্বাধীনতায় দেশপ্রেমী, উত্তর স্বাধীনতায় পকেট-ক্ষমতা ও ভোট গোছানি, এমন হল বলেই সর্বনাশ। দেশকে তো আমরণ ভালবাসতে হয়। ভালবাসা ব্যতীত কিছু হয় না।

ট্রেনে কয়েকজন মা কয়েকটি শিশুকে নিয়ে ফিরছে। ওরা নিশ্চয় ইংরিজি মাধ্যম স্কুলে যায়। করুণার দেখাতেও ভুল আছে। দামী শিক্ষার মোহ সমাজের এ স্তরকেও গ্রাস করেছে। একটি মা বলছে, স্কুলে যদি কিছুই না করায়, শুধু হোম-টাস্ক দেয়, পারা যায়?

আরেকজন বলে, পারতেই হবে।

তৃতীয় মেয়েটি বলে, দেশের স্কুলে যদি প্রাইমারিতে ইংরিজি শেখাত, আমি কলকাতায় মেয়ে পাঠাতাম না ভাই, বাচ্চাটাকে এতক্ষণ ছেড়ে থাকা বড় অসুবিধে।

—ইংরিজি ছাড়া যে কাজকর্মও পাবে না।

হরেনবাবু ভাবেন, মোহ আছে, যুক্তিও আছে। এবার থেকে রবিবারটা প্রাথমিক সন্ধ্যার পাঠশালায় ইংরিজিটা চালু করতে হবে। ঘোঘরার প্রাথমিক স্কুলগুলোর ছেলেমেয়েরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরিজি শুরু করতে গিয়ে খুব মার খাচ্ছে। ঘোঘরাতে ইংরিজি কোচিং সেন্টারের সে জন্যই রমরমা। কিন্তু সকলে তো গৃহশিক্ষক রাখতে পারে না, কোচিং ক্লাসে দিতে পারে না। ভীরু মিনতিতে সোনারানী বলেছিল, ইংরিজিতে মোটে পারচে না ছেলে। কোচিনে দিলে মাসে

চল্লিশ টাকা, দেব কোতা থেকে। ওর বাপ সকল সময় বলতেচে, তুই বাবুর বাড়ি খাটিস, আমি গেরেজে পাই তিনশো টাকা। পাঁচটা মুক খেতে, মেয়ের বে'র ধার শোদ হল না। ছেলে পড়াবার শক ক্যানো ? ইস্কুল ছাড়িয়ে দে। ওদের পেটের ভাত কামাই কত্তে হবে।

সোনারানীর বড় সাধ ওর ছেলে স্বপন কুমার মণ্ডল, পিঃ হারাধন মণ্ডল, খানিক দূর পড়বে, হাতের কাজ শেখার ইস্কুলে যাবে, তাহলে ছোট কারখানাতেও কাজ করতে পারবে! না, ইংরিজিটা চালু করতে হবে। শুধু সঙ্গে যদি কাউকে পেতেন। ঘোঘরাতেও মিনি-মাগনা জনশিক্ষায় ভলান্টিয়ার হতে কেউ আসে না। তাঁকে খুব বাহবা দেয়। এসে হাত ধরে না।

ক্যানিং স্টেশন পৌঁছে যায়। সীতেশ স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল, সঙ্গে দুটি লোক।

তিনি নামতেই সীতেশ "দাদু" বলে পায়ের ধুলো নেয় এবং পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি যুবককে লক্ষ্য করে বলে, আমার বাবা জমি-জায়গা করেছিল, শোষণ করত যারা বলে, তারা দেখুক আমার দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী! ছোঃ! আমি নাকি শোষণ করি। শোষণ-বাদী বলছো বলে, শোধনবাদী তো নই। যাক গে!

হরেনবাবুকে সে একটি রিকশায় চড়ায়. নিজে বসে। তারপর বলে, নিজের রিকশা!

—রিকশাতেই যাওয়া যাবে ?

—এইটুকু। আমার ম্যাটাডোরে নিয়ে যাব। তোমার আশীর্বাদে এটুকু···

চলতে চলতে হরেনবাবু বলেন, পিতামহের নামে স্কুল করেছ যখন, তখন অবস্থা তো···

সীতেশ মাংসল হাসিতে বিগলিত। গায়ে টেরি পাঞ্জাবি, দামী ধুতি, শাল।

-ইস্কুল অবশ্য সরকারই করল। প্রাইমারিটা ঠাকুদ্দা করিছিল,

তা বাদে খেড়ো ঘর থেকে দালান হল। তা বাদে দিলাম পাশেই জমি। ভদ্দরতা করে ঠাকুদ্দার নামটা বহাল রেখেচে। সতীশ দত্ত কি সোজা লোক ছিল? হাঁকুড় মাল্লে বাঘ পালাত।

--সেই স্কুল উদ্বোধন?

—হ্যাঁ দাদু। এমেলেকে দেকবে। আমায়িক মানুষ বটে। ছেলেরা ধল্ল, ফাংশান করে দিন সাঁতেশ দা। ফাংশানও হচ্চে, কলকাতার আর্টিস্ট গান গাইবে, কমিক করবে, আর নাটক করবে ক্লাব থেকে। হাই স্কুল ছিল না, হাই স্কুল হোল টিচারদের কোয়ার্টার, সব ব্যবস্থা।

—স্কুলও কি উদ্বোধন করতে হয়?

—স-ব উদ্বোধন কত্তে হয় দাদু। এমেলে আমাদের...হয় সভা, নয় ফাংশান, নয় উদ্বোধন। কর্মযজ্ঞ চলচে তো! বেকার ছেলেরা লোন পাবে, ভূমিহীন জমি পাবে, দশটা মেয়ে ধানভানারি সাহায্য পাবে,—সব তাতে সভা হবে, ফটো উঠবে, কাগজে বেরোবে...

—এ জন্য সভা কেন? এগুলো তো সরকারের কর্মসূচী মতো... তা, তোমার অঞ্চলে তাহলে খুব কাজ হচ্চে?

—যতেষ্ট, যতেষ্ট তবে কি শত্তুরতা করে যদি কিছু লোক বলে কাজে ফাঁকি পড়চে, টাকা চুরি হচ্চে...

--তুমি কি অঞ্চল প্রধান?

—কিচু না, কিচু না। চাষাভুষো বলতে পার।

ম্যাটাডোর, কিন্তু যাত্রীবাহী গাড়ি।

—তিনটে চলচে। দেক, ঠাকুদ্দা, বাবা, মা, তিনজনের নামে তিনটে গাড়ি। প্যাসেঞ্জার, মালমোটরা, সব যাচ্চে। লাইফটা পাবলিক সার্ভিসে। সোমা আর খ্যামা তো সেটা দেকল না মোটে।

—তোমার সন্তানাদি কি?

—ওকেনেই মেরে দিয়েছে কপাল। তিনটেই মেয়ে। মেয়ে নাড়ি জানলে কি বে' করি?

—ছেলেমেয়েতে তফাৎ কি?

—আচে, আচে দাদু। একন কাজপাগলা হয়ে করে যাচ্চি, সবই পরের ঘরে যাবে···

ম্যাটাডোর "যতীশ স্মৃতি ভবনের' সামনে দাঁড়ায়। সীতেশ বলে, ভিউ দেকেচ ?

হ্যাঁ, ভিউ বটে। অনিরুদ্ধ বলেছিল "গল্প হলেও সত্যি।" মস্ত কম্পাউণ্ড পাঁচিল ঘেরা, দোতলা বড় বাড়ি। সীতেশ বলে, ঠাকুদ্দার তৈরি, আমি বাড়িয়েচি মাত্তর। দূরদশশি লোক ছিলেন। বাড়ি রে, পুকুর রে, গোয়াল রে, কাজিডাঙার নাম যতীশ নগর হলে ঠিক হত।

সীতেশ সক্ষোভে বলে, তোমার ভাইপো ভাইঝিরা দেকলে আমার শান্তি হত। আমার ঠাকুদ্দা তোমাদের অন্নে মানুষ, কিন্তু পরে তিনিই যে কেউ কেটা হইছিলেন সেটা ওরা দেকলে···যাগ্ গে, তুমি যে এলে এটা মস্ত কতা। এসো।

হঠাৎ সীতেশ সগর্জনে চেঁচায়। দু'জন দৌড়ে আসে ও হরেন-বাবুর ব্যাগটি নিয়ে যায়। সীতেশ বলে, আমার বাড়ি সব্বদা কারেণ্ট থাকে। কোলস্টোরেজ আর বাড়ি। কারেণ্ট গেল তো জেনারেটার।

—এত সম্পত্তি কি তুমিই করলে ?

—সম্পত্তি আর কোতা দাদু ? বাবা এসব বুজতেন না। আমি শেষে মাতা দিলাম। এ কোনো সম্পত্তি নয়। কোনো মতে চলে যাচ্চে। তোমাদের বাড়ির যে কতা শুনিচি···এট্টা দুক্ক, এত চেনাজানা ছিল, তুমি কিচু কল্লে না।

হরেনবাবু ভুরু কুঁচকে বলেন, আমার বাবা তো বড়লোক ছিলেন না। যতীশদাদা তো জানবেন। বাবা যা মোটা চালে চলতেন। তা, বড়লোক হবার কথা তো আমরা ভাবি নি···

সীতেশ বলে, না না, ওদের সব কলকাতায় সম্পত্তি, তার দাম কত! আমরা তো গাঁয়ে পড়ে আচি। তবে সল্ট লেকে জমি পেইচি, বাড়িও করব। ঠাকুদ্দা সব্বদা বলতেন, মামা বাড়ির ভাতে মানুষ, ওদের সমান হতে হবে···

যতীশ দাদার এই বিত্তবান হবার পেছনে কি ছিল গোপন ঈর্ষা ?

ঈর্ষা, হিংসা, একেক পরিবারকে আত্মীয়স্বজনের চেয়ে ওপরে উঠবার শক্তি যোগায় বটে। হরেনবাবুর মা তো ওঁদের আর নিজের ছেলেদের তফাৎ করতেন না।

—সমান হওয়া দেক। সম্পত্তি করিচি। ভাইরা এডুকেটেড, তবে হ্যাঁ দেশ স্বাধীন করা···

—স্বাধীন দেশেও তো দেশ সেবার দরকার থাকে. রাশিয়া জারের শাসনমুক্ত হয়ে তবে দেশ গড়ল। চীনের ইতিহাস, ভিয়েত-নামের ইতিহাস···

—কিচু জানি না দাদু।

—তেভাগা আন্দোলনের কালে ঠাকুর্দা এখানে?

—না, জমিজমা ছেড়ে পালিয়েছিল। পুলিশ আসতে তবে গ্রামে ফেরে। এই যে রাণু, আমার বউ। প্রণাম করো, মেয়েরা শান্তশ্রী, শুভশ্রী, দীপশ্রী। রাণুর ভাই কলেজে বাংলা পড়ায়, নাম রেকেচে। প্রণাম করো সব।

সবাই প্রণাম করে। সুসজ্জিত বসার ঘর। দেয়াল ঘড়ি ফরেন, রেডিও ফরেন, টিভি তো চলে না, এসে যাবে ক্রমে।

—দেয়ালে গাঁথা আলমারিতে নানা আকারের বোতল। অফিসার, পুলিশ, এমেলে, পাঁচ রকম লোক আসচে, সবই রাখতে হয় আমাকে। হলস্টিন গরু কিনিচি, দুধ খাও, বেচো। অঢেল দুধ। তোমরা গাঁ গেরামের এ চেহারা দেখনি।

—আগে দেখি নি। এখন দেখছি।

—ওঃ, তুমি যদি চাইতে সে সময়ে···দশটা ট্যাক্সি পারমিট বের করে নিলেও আজ মাসে ক'হাজার টাকা আসত। পাঁচশো টাকা পেনশানে কি চলে? আমার কুকুরের পেছনেই পাঁচশো বেরিয়ে যায়! গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি, কুকুর রাখতেই হয়।

—পাঁচশো টাকা অনেকের কাছে ফরচুন।

—তা তো বটেই।

যথেষ্ট গয়না ও দামী নাইলনে (ফেরেন নাইলন ছাড়া পরে না সুসজ্জিত বেঁটে বউটি ওঁকে নিয়ে যায় ঘরে।

—এ ঘরে আপনি থাকবেন।

বড় ঘর, বড় পালঙ্ক, টেবলে প্লাস্টিকের ফুল, দেয়ালে বংশলতিক ফ্রেমে বাঁধাই, ঝুলছে। কিছু ফোটো। এক মন্ত্রীর পাশে সীতেশ।

—ফেরি ঘাট উদ্বোধন করেছিলেন।

—কাল একটু ঘুরে-ঘেরে দেখতাম।

—আমার শালা নিয়ে যাবে।

সীতেশ খাবার টেবলে বসে দুঃখটি জানায়।

—আমি তোমার ভগ্নিপোত, আমার অসাদ্ধ কি আচে বলো কতজনকে ভাত কাপড় দিচ্চি, তোমাকেও দিতে পারি। রাজনীতি কত্তে চাও, বড় পার্টিতে এসো। তা সে আগে করল এক কাগজ কাজ শুদুমুদু সরকারকে গাল পাড়া। তা বাদে দিল বইয়ের দোকান তাও কেউ জ্বালিয়ে দিল। বড়টা মেজটা দিব্যি কলেজে আর আপিসে চাগরি কচ্চে, ইউনিয়ান কচ্চে। আপনার নাতবউ ভাই বলে অস্থির। তাতে আমার কাচে এনে রেখিচি। দোব কোনে এট্টা কাজে। লেকাপড়া জানে, মেয়েদের পড়ায়, আমার স্পীচগুনো লিকে দেয়।

—তোমাকে কি এত স্পীচ দিতে হয়?

—দাদু? মাসে এট্টা দুটো। ও খেটে পড়ে লিকে দেয়, তাতে আমার স্পীচের কত নাম হয়েচে।

—তোমার সেক্রেটারি বলো?

—যা বলেন! তোতনকে সঙ্গে দোব। সব দেকাবে।

—ফাংশান কবে?

—পশশু। খান, মাচ খান। আমার ভেড়ির মাচ। এ রকম চিংড়ি আপনি দেকবেন না। দেকবেন বা কি করে, মাচ চালান হচ্চে, ব্যাং চালান হচ্চে, সাপ-গোহাড়গেলে সব মেরে চামড়া চালান হচ্চে। তোতনকে তো বলি, মিডিলম্যান হয়ে যা, পয়সা ঢেলে আসবে।

—কাল থেকে নাতবউ, রাতে আমায় খই দুধ দিও। শরীরটা ঠিক আছে, আহারে সংযম রেখে।

নাতবউ সপ্রতিভ হেসে বলে, এ বাড়িতে সে হবে না দাদু। আপনার নাতি সগালা এক দিস্তে লুচি খাবে, দু'বেলা ভাত পাতে মাচের তরগারি চার পাঁচটা চাই…

সীতেশ আঙুল তুলে বলে, পাচ্চো, খেয়ে যাও। দাদুরা এগাকালে যতোষ্টো খেয়েচে বলে টনকো আচে।

—তা খেয়েছি। কলকাতায় বসেই খেয়েছি। বাজার সস্তা ছিল, অঢেল জিনিস, টাকা ছিল না অবশ্য। তা নলপুরে যখন ইনটার্ন ছিলাম, ষাট টাকা অ্যালাওয়েন্স আদায় করেছিলাম। টাকা পেটে খেয়ে, মানুষকে দিয়ে তার পরেও জমে যেত। সে এখন গল্প কথা।

—ঠাকুদ্দা বলতেন। মাচে দুদে ছড়াছড়ি।

—যতীশ দাদা খাইয়ে ছিলেন। সে কারণে আমার মায়ের খুব প্রিয়। "যতীশকে খাইয়ে আনন্দ", মা বলতেন।

সীতেশ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, সে সব দিন আর নেই দাদু। একন হা অন্ন জো অন্ন। বাদার মানুষ আশ পুরিয়ে মাচ খেতে পায় না।

—সে তোতন কোথায় ?

—লাইব্রেরি বন্দ হবে, তবে ঘরে আসবে।

সীতেশের বউ বলে, নিরিমিষ খায়, কি জেদী ছেলে গো ! চোক খারাপ, মাচ খা। না, এগ টুকরো মাচ খাবে না। দেকলেই বুজবেন, কে বলবে আমার ভাই !

—তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ?

—কেষ্টনগর।

সীতেশ বলে, বাবার বাধ্য ছিলাম, আর্লি ম্যারেজ করে ফেললাম। সোমা ক্যামা অবিশ্যি পরে বিয়ে করেচে।

—কেষ্টনগর, কেষ্টনগর, পূর্ণ চক্রবর্তীকে চেনো ? আমাদের চেয়ে একটু ছোট হবে…স্বাধীনতাসংগ্রামী…

—তোতন জানতে পারে। আমার তো চোদ্দ বছরে বে' হইছিল অত জানি না।

—সে কি সীতেশ? নাবালিকা বিবাহ?

—মেয়েছেলে দাদু! যকন জুটবে, তকনি দেবে। আমি তো এদেরে সতোরো আটারো হতে না হতে পার করব। লেকাপড়া? বে'র পরে কোরো!

—তোমার মুখে এই কথা? রাজনীতি করো···

—রাজনীতির সঙ্গে মেয়ের বে'র সম্পক্কো কি? তা ছাড়া যে সব্বনাশ চঞ্চল পালের মেয়ে কল্ল! চাগরি করত কলকাতায়, হাসপাতালে সোশ্যাল ওয়ার্কার, বাংলাদেশের এক মুসলমান ছেলেকে বে' করে বাংলাদেশে চলে গেল - এ সব সামনে ঘটলে মেয়েরা কি সাওস পাবে না? বংশের নামটা কোতা যাবে?

সীতেশ এমন করতে থাকে, যেন ওর ঠাকুর্দা সম্পত্তিমনস্ক যতীশ দত্ত নন। যেন সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন কোনো বংশ ওদের।

—কি, জানি! বড় বড় ঘরেও তো হচ্ছে।

—সে বলতে পারো। বড় ঘরে সাজে। আমাদের ঘরে হলে···

হরেনবাবুর হঠাৎ নিদারুণ ক্লান্ত লাগে। সীতেশ ওঁকে বড়ই নিরাশ করছে বার বার। যতীশদা'র সঙ্গে ওর তফাৎ কোথায়?

—ক্লান্ত লাগছে সীতেশ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে মীরা! দাদুকে নিয়ে যা···অন্দরে সব মেয়েছেলে রেকিটি দাদু···বেটাছেলে ঢোকালে সব্বনাশ হয়। বাড়িতে মেয়েরা আচে···বাতরুমে জল পাবে, পাম্‌প বসিয়ে নিয়েচি তো···বরুণরা দেকল না, সব ক্যালকাটা কম্‌ফার্ট···

সবই বিত্তশালী ব্যাপার। শুধু মশাটা বড় বেশি। মীরা ওঁকে হাতে জল ঢেলে দেয়, উনি শুলে মশারি গুঁজে দেয়। এমন ফিনফিনে নাইলন মশারি দেখেন নি হরেনবাবু। এমন গদী তোশকেও শোন নি। করুণাকে বলতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যায়।

ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা অনেক দূর চলে এসেছেন। তোতন ওঁকে ওর দিদির নির্দেশমতো সীতেশের বৈভব দেখিয়েছে। অবশেষে নতুন অনুদ্বোধিত স্কুলের কম্পাউণ্ডে বসলেন ওঁরা বারান্দায়। তোতনের রং শ্যামল, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, প্যাণ্ট ও শার্ট খুব সাধারণ. কথা বলে নিচু গলায়।

—এত সম্পত্তি করেছে সীতেশ।

—ওঁর ঠাকুর্দা শুরু করেন। সে সময়ে সম্পত্তি বাগানো তো কঠিন ছিল না। শুনেছি তেভাগার পর বহু কৃষকের জমি জবরদখল হয়। উনি অবশ্য পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর থেকেই কে নিরুপায় হয়ে ডিস্‌ট্রেস্‌ সেল করছে খবর নিয়ে জমি খরিদ শুরু করেন।

—ইশ্‌! আচ্ছা, সীতেশ কি রাজনীতি করে?

তোতন বলে, ১৯৭৭ অবধি ওঁরা এক ধরনের রাজনীতি করতেন অবশ্য সেটাও ভাল করে না। ব্যাপারটা হল, যে যখন ক্ষমতায়, ওঁরা তখন তাদের সমর্থক। কর্তাদের তুষ্ট রাখেন, মাছের ভেড়ি। হিমঘর, ধানী জমি, কয়েকটা পুকুর, ম্যাটাডোর, সব করে যাচ্ছেন। জমিজমার ব্যাপারেও বড় রেফারি। এই যে স্কুল! প্রাথমিক স্কুল তো জমিদার আমল থেকেই ছিল। উনি স্কুলশুদ্ধ জমি খরিদ করেন, এও ঘটনা। নতুন চালাঘর তুলে দিলেন, স্বনামে নাম দিলেন। সীতেশদা আবার জমি দিলেন, জোর করে চাঁদা তুলে স্কুলের নামে ইট ফেললেন এবং সরকার স্কুল করে দিল।

—তবু তো স্কুল হল।

—হ্যাঁ, তবে স্কুলের জন্যে আন্দোলন অনেক কালের। চঞ্চল পালের বাবাই অনুমোদন করান। সীতেশদা পাকা ফসল গোলায় তুললেন।

—আমি জানতাম না কিছুই।

—ওই লোকটাকে দেখুন। অ বলরাম!

শীর্ণকায়, উজ্জ্বল চোখ, পাকানো শরীর একটি আধা বয়সী লোক এগিয়ে আসে।

—কি বলচো গো দাদা!

—তোমার জমির গল্পটা বলবে এনাকে?

—কি বলব? তুমি তো ঝানো সব।

—এই বলরাম, আর ওর মতো ত্বশো বলরাম, নদীর আড়ে ঘর বেঁধে থাকে, মাতলা থেকে ঝিনুক তোলে, দিনমজুরি পেলে করে এই অবস্থা। পঞ্চায়েত বাঁধসারাই কাজে এদের দিয়ে মাটির কাজ করায়, টাকা মারে লাখ লাখ। তা বলরামদের নিয়ে চঞ্চল পাল হইচই তুলেছিল। কার্য কারণ যাই হোক, সহসা সীতেশদা ঘোষণ করল যে বলরাম সহ পাঁচ জনকে এক বিঘা করে জমি দেওয়া হবে তা হোল। ওরা পাট্টা পেল। সে জমি চাষ করবে, না সেচ, না বীজ, না সার। আর হাল বলদ নেইও, ভাড়া করবে সে পয়সাও নেই।

—তাই তো! জমি পেলে ভূমিহীন আর তা থেকে ফায়দা ওঠাতে পারে না।

—কোথাও পড়েছেন?

—পড়েছি, কিছু দেখছিও।

—সীতেশদা অফিসিয়ালি কোথাও নেই। আন অফিসিয়ালি সর্বত্র আছে। ওকে টপকে কোনো সরকারী কর্মচারী কাজ করতে তু'বার ভাবে। যাক, চঞ্চল পাল ওদেরই কর্মী। কিন্তু তাকে ল্যাং মারা দরকার ছিল। সবিতা ওই দীপক আলমকে বিয়ে করাতে চঞ্চল পাল অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্চে প্রচারের সুবিধে হোল। এদিকে পাঁচ জন জমি পাওয়াতে যারা পেল না তারা ক্ষুণ্ণ হল।

—হ্যাঁ···হবার কথা। ওদের দেবার মতো জমি নেই?

এ কথায় বলরাম ঈষৎ হাসে। তোতন বলে, জমি দিতে পারত এরা গরিব তপশীলী, মুসলমান গরিব, হিন্দু গরিব, কিছু আদিবাসী পাড়াও আছে। সরকারী স্কীমে টাকাও আসে। এরা কিন্তু কোনো সাহায্য পায় না। জমি না হোক, কুটির শিল্প, ধানভানা-ছাগল মুরগি হাঁস পালন, কত কি করতে পারত। কিছুই করে না।

—জলের কতাটা বলো।

—খাবার জল পায় না গ্রামকে গ্রাম। লোনা জায়গা। আগে পানীয় জলের আলদা পুকুর থাকত। খুব উঁচু পাড়। পাড় ধসে গেছে, মেরামতি নেই, একটা টিউবওয়েল বসাতে এখানে বাইশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা লাগে। যত কল স্যাংশান হয়, ক্ষমতাশালী লোকেরা ঘাপ করে। কয়েকটা টিউবওয়েল···

—আমরা সেই যে পুকুরে চ্যান, তার জল খাচ্চি, অসুকে ভুগচি, বড় দুক্ষ আমাদের।

—অথচ সুন্দরবন উন্নয়ন হচ্চে। জলের দামে টাকা আসছে। সুন্দরবন যে কত সুন্দর, তা জেনে যান।

—ভাবা যায় না এ সব।

—তা, সেদিন শুনলাম চঞ্চল পালের কাছে, বলরামের জমিটা সীতেশদা'র শ্রদ্ধেয় দাদা রাসুবাবু নিয়ে নিচ্চে। সীতেশ দা' মধ্যস্বত্বভোগী।

—কি রকম?

—বলরামরা জানে না লেখাপড়া। দু'বছর আগের তারিখ দিয়ে দলিল হোল যে বলরাম তীর্থে যাবে বলে ওর শ্বশুর নরেশকে জমি নিঃশর্তে বিক্রি করছে। যে জে. এল. আর আপিস বলরামকে পাট্টা দেয়, সেই আপিসই শ্বশুরের নামে মিউটেশান করাল। এখন শ্বশুরের কাছ থেকে রাসুবাবু কিনছে। বলরামকে যে পাট্টা দেয়া হয়, তাতে কিন্তু লেখা নেই যে পাট্টা জমি হস্তান্তর করা চলে না।

—সে তো ছাপা থাকবে?

—চঞ্চলবাবু বলে ছাপা নেই।

বলরাম ঈষৎ স্মিত মুখে শুনে যায়। যেন আর কারো বিষয়ে কথা হচ্ছে। এখন ও তোতনকে গভীর মমতায় বলে, তোমার মনটা ভালো, এত খবর নিচ্চ, এমন কাতর হচ্চো। ও কতা ছাপা থাগলে বা বলরাম কি কত্ত? আলিপুর যেত? হাইকোর্ট করত?

হরেনবাবুকে বলে, বাবু! সরকার আমি হেন নোকদের জমি

দিচ্ছে হেতা হোতা। দক্ষিনে অনেক থানায় একই ঘটনা। জমি মোরা রাকতে পাচ্চি না, রাকতে দিচ্চে না।

—সবই বাবুরা নিয়ে নিচ্ছে ?

—বাবু ঝা, সব পাট্টি তা, পঞ্চায়েত তা, গরিবের কেউ নেই। শুদু জমি! ভগমানও চায় নে জমি চাষ করি, চাইলে সময়ে জলটা দিত। চাষের সময়ে হয় শুগনো নয় বাঁদ ভেঙে জল ঢুকে সব পচেহেজে···তুচ্ছ করো না গো দাদা! আমাদের জন্যি তুচ্ছ কচ্চো কেন? যে কত্তে যায় তারে এরা নিকেশ করে ছাড়ে। জানে না মারল তো ভাতে মারল।

বলরাম চলে যায় নিজের কাজে।

—সীতেশ কোথায় নেমে গেছে ?

—এ জন্যে তো আপনারাও দায়ী। না ?

—সকলেই···

—স্বাধীনতা সংগ্রামী! কয়েকজনের নামেই ঢাকবাদ্যি! জমিভূমিবান মানুষরাই তো দেশে ঘরে জমি রাখতেন, প্রজাদের বঞ্চিত করতেন···শ্রেণীস্বার্থ তো ভোলেন নি। সেসব ঘর থেকেই অনেকে আপনারা···গরিব রয়ে গেল গরিবের জায়গায়। আর স্বাধীনতা আসার পর স্বাধীনতা ক্যাশ করল সেই জমিভূমিবান লোক, শিক্ষিত লোকরা, দেশের সমস্যা বাড়তে বাড়তে এখন তো বারুদের পাঁজা। সীতেশদা' একা নামে নি। ওরা ট্র্যাডিশান থেকে এসেছে, রাজনীতি থেকে এসেছে, অবশ্য যে রাজনীতি ভারতবর্ষ জুড়ে ছোট বড় সীতেশদা' তৈরি করে, সেটা কোনো রাজনীতি নয়। আপনারাই শুধু সংগ্রাম করেছেন? স্বাধীন ভারতে তেভাগা—কাকদ্বীপ—তেলেঙ্গানা সংগ্রাম কেন হয়েছিল তা ভেবেছেন? বহু সাধারণ মানুষ জেল খেটেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে, সবাই পেনশান পায় নি। এসব ভেবেছেন কখনো ?

—ভাবিনি একথা মিথ্যা হবে। ভেবেছি, ভাবছি, স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছি, এ তো সকলের পাপ। "স্বাধীনতা" শব্দের অর্থ কি দাঁড়াবে কেউই ভাবলাম না।

—যাক গে, আপনাকে এত কথা বললাম···

—সে জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ তোতন। আচ্ছা, তোমার একটা ভালো নামও তো আছে?

—কল্যাণময় বসু, ব্যবহার করি না।

—কি করতে?

—শুনেছেন তো। দিদি কোনো কথা চেপে রাখতে পারে না। আমার দিদি···জানেন কি ফিউডাল ব্যাপার। চৌদ্দ না হতে বাবা বিয়ে দিল, ক্লাস টেনে উঠেছিল। পড়াশোনায় ভালো ছিল, পরীক্ষা দেয়া হল না। গান গাইত···আজ অবশ্য কিছু বোঝার উপায় নেই।

—এখানে থেকে কি কিছু করবে?

তোতনের চোখ হাসে।

—সীতেশদার ভাষণ লিখব না চিরকাল।

—সত্যি, ভাষণ লেখার লোক চাই!

—আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক কয়েকটা ছক বাঁধা ভাষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখি।

হরেনবাবু হেসে ফেলেন।

—ধরুন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গান্ধীজী, নেতাজী, পনেরোই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারি, একটা ছকে রেখেছি। মার্কস, লেনিন, সীতেশদা লেলিন বলে, নভেম্বর বিপ্লব, একটাই চলে। আবার রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত-সোকাল সাহিত্যিক ব্রজবল্লভ নস্কর, একটা ছক। আর বাঁধ-স্কুল-যাত্রা উৎসব-ক্রীড়া প্রদর্শনী-সরস্বতী পুজো-দুর্গাপুজো-পদযাত্রা ইত্যাদি যে কোনো উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একটাই ছক চলে।

—লিখতে তো হয়।

—সব ছাপানো আছে এক হাজার করে। চারটে ছকে চার হাজার। রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের নাম দিয়ে একটা প্যারা রাখি। সেটা থাকল, বাকি সব উদাত্ত ভাষণ, দিই কেটে কেটে পেস্ট করে। যাকে বলে পারমুটেশন কম্বিনেশন, বা যাই বলেন।

—সীতেশ কি বোঝে না?

—উনি কি কিছুই পড়েছেন যে বুঝবেন? শুনুন, এখানে রাসুবাবু, সীতেশদা, ও সি, অঞ্চল প্রধান, কেউই কিছু পড়েন না। একমাত্র বি ডি ও খুব পড়ে। কিন্তু সে কথা জানাতে চায় না।

—কিন্তু তোমার কি হবে তোতন?

—আমার? এসব ভাঁড়ামি করে যাচ্ছি, সময় কাটাচ্ছি। কেষ্টনগরে এখনি ফেরা যাবে না। কিন্তু এ জায়গাটাও খুব টানছে··· বলরাম শত শত· ·সেদিন একজনের ওপর ধার ছিল বলে "ডাকাত" ঘোষণা করে পিটিয়ে মেরে ফেলল। সীতেশদা সব কিছুতে থাকে, কিছুতেই থাকে না। লোকটার বউ মরে যেতে মিছিলে যেতে পারতনা, পঞ্চায়েতে গিয়ে নিষ্ফল বিবাদ করত, আমরা কেন কাজ পাব না···ছেলেমেয়েগুলো বলরামদের পাড়ায় চলে গেছে।

—ওরা ভাত দেয়?

—না আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম তো বহুকাল শেষ। ওদের সংগ্রাম তো ফুরোয় না। ভাতের সংগ্রাম। ওরাও মাতলা থেকে ঝিনুক তোলে।

—তুমি এভাবে কতদিন থাকবে?

তোতন ঈষৎ হাসে।

—একদিন হঠাৎ মাতলা পেরিয়ে চলে যাব বাসন্তী। এখানে একটা লোক খুব ইনটারেস্টিং। শামসুল মণ্ডল। সর্বদা দেখবেন সরকারী আইন মতে কার কি প্রাপ্য, কে কি পেল না, তাই নিয়ে দৌড়াচ্ছে। দল বিচার করে না, যদিও নিজে একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক। আমি যাদের দেখেছি, তার মধ্যে এই লোকটাই মরিয়া হয়ে দৌড়য়, আইনমতো পাওনা চায়, চাওয়ায়। ও "স্বাধীনতা" শব্দটাকে অর্থময় করতে চেষ্টা করে।

—ওর দলে যাবে?

—না। দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস নেই।

—তবে?

—বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খুলতে চেষ্টা করছে, সেখানে একশো টাকার

মাস্টার হতে পারি, নয়তো পূর্ণবাবুর মতো যে প্রাইমারি স্কুলটা বারো বছর চালাচ্ছে, যে স্কুল অনুমোদন পাচ্ছে না, সেখানে মাস্টারী করতে পারি। ইংরিজি কোচিং খুললে বড়লোক হয়ে যাব এই ভয়েও কথা ভাবছি না, এইসব আর কি!

—বড়লোক পছন্দ নয়?

—না। ছোটবেলা থেকেই দেখছি। আমাদের যৌথ পরিবার। বাবা কাকা সীতেশদাকে কিনতে পারেন।

—সে বাড়িতে তুমি···

—বাবাই বলেন, কল্যাণময় নয়, কলঙ্কময়। স্বাভাবিক। বাড়িতে আমি তো ব্যতিক্রম।

—মা আছেন?

—না। কিছুকাল হল···চলুন উঠি। সীতেশদাকে হলস্টিন গরুর কথা বলবেন, কিন্তু বলরামের কথা বলবেন না। এ সব ও পছন্দ করে না। আমার—আপনার কিছু হবে না, তবে বলরাম মারা পড়বে।

—স্বাধীনতার এত বছর পর···

—বলরামরা চিরকালই দুঃখে থাকে।

—ভালো কথা, পূর্ণবাবু মানে কার কথা বললে?

—পূর্ণ চক্রবর্তী। বয়স বাহাত্তর। বছর দশেক ধরে চন্দার বিল নিয়ে আন্দোলন করছেন। এবার বিলটা সংস্কার করবে সরকার··· জেলেদের সমবায়···একটা অরগানাইজিং স্কুল···

—কোথায়।

—মুর্শিদাবাদে।

—কালো, লম্বা, রোগাটে, নস্যি নেয় খুব?

—হ্যাঁ, চেনেন?

—দাঁড়াও, বাপের নাম মহিমারঞ্জন?

—তিনিই।

ঠিকানাটা দিও তো। যেতে হবে একবার। এক সঙ্গে জেলে

থাকতাম···তোমাকেও বলা রইল, ঘোঘরা চলে এলে কাজ দিতে পারব। কাজ অনেক। একলা পারি না। খুবই চিন্তা হয় মাঝে মাঝে। পূর্ণ! পূর্ণ ইনটার্ন, আমিও ইনটার্ন, জলপাইগুড়িতে রাজানগর থানা···

—কাজ? কি কাজ?

—বলব, বলব। চলো।

উদ্বোধনের আগেই সীতেশের বাড়ি ওর শ্বশুরবাড়ির লোকে ভরে ওঠে। দোতলার ভালো ঘরটিতে এম. এল. এ বিশ্রাম করবেন। থাকবেন ক্যানিংয়ে জামাইয়ের বাড়ি। হরেনবাবুকে খুব খাতির করে সীতেশ। বলে, স্বাধীনতা সংগ্রামী কাকে বলে দেখুন একবার। কি নির্লোভ! যেন সন্নিসী।

শ্রদ্ধেয় রাসুদা নমস্কার করেন।

এ. এল. এ এসেই বলেন, মিটিং একটা করা দরকার ছিল, তা এই সভাতেই সেরে দোব। রাসুবাবু! কোনো ডেপুটেশান, গণ-দরখাস্ত নয়।

—সার, বাঁধের কথা তো বলতেই হবে।

—বলব, বলব। যেটা আপনাদের বোঝাতে হবে, চাই চাই বলে পাবলিক চেঁচাবে, তাদের দাবীও ন্যায্য। আমরা সেগুলো বিবেচনা করছি, করব, দেখব। এখন প্রচণ্ড অর্থাভাব, প্রবল বিরোধিতার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। হুট্ করে কোনো বড় কাজে হাত দেয়ার আগে···

—বলছি, বোঝাচ্ছি, বোঝে কই?

—কয়েকটা বাঁধ এবারই হবে।

—ওরা বলছে জলনিকাশী ব্যবস্থা চাই। এবার বর্ষায় জল ঢুকে জল মোটে বেরোয় নে, চাষ মার খেল। জল নিকাশের কি করা যায়···

—সে তো আপনারা দেখবেন, বুদ্ধি দেবেন, প্ল্যান হবে, কাজ হবে ক্রমে ক্রমে···

—ব্যাঙ্ক লোনের ব্যাপারটা···?

—কিছু লোক পেয়েছে, আরো পাবে।

এ সময়ে সীতেশ বলে, সার, এই যে আমার দাদু, মানে পিতামহের মামাতো ভাই, মানে হরেন্দ্রনাত রায়, মানে সংগ্রামী স্বাধীনতা। খুব নিল্লোভ লোগ, ঘোঘরাতে কৎ কি কচ্চেন বলার কতা নয়।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

—কোন্ পার্টি করেন?

—কোনো পার্টিতেই নেই।

—রণজিতবাবুকে চেনেন?

—রণজিতের কাকাই আমাকে এখানে বসত করান। রণজিত আমার স্নেহভাজন ছেলে।

—কাজ টাজ করছে? আমার এলাকায় আমি তো, যাকে বলে কর্মযজ্ঞ লাগিয়ে দিয়েছি। কেমন দেখছেন? আপনারা তো স্বাধীনতাসংগ্রামী, আর আমরা হলাম জনগণের কর্মী!

—এত কম দেখেছি যে বলা উচিত নয়। তবে আপনাদের এদিকে যে পানীয় জলের অভাব এত···

—ছিল। এখন থাকবে না।

এম. এল. এ সম্ভবত হরেনবাবুকে মহতী জনসভা মনে করেন ও গলা তুলে বলেন, বিরোধীদের চক্রান্ত, তাতে কি আমাদের ঠেকিয়ে রাখা যায়?

—না। আপনারা এখন শক্তিমান।

—পানীয় জল! হবে, নলকূপ বসবে।

—আগের মতো গ্রামের লোককে দিয়ে পানীয় জলের পুকুর কাটিয়ে উঁচু পাড়ের বাঁধ দিলে হয়তো খারাপ হত না! নলকূপ মানেই বিকল হবে···

—না না। পেছনে হাঁটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া সে সব পুকুর

থেকে দূষণ ছড়াতে কতক্ষণ? মানুষ কিভাবে ব্যবহার করবে সেগুলো?

—তা বটে। হরেনবাবু অল্প হাসেন।

—থাকছেন তো?

—না না, আমার আর্জেন্ট কাজ···

—ফাংশানটা দেখুন!

রাম্নুবাবু বলেন, হ্যাঁ, দেখবেন বই কি!

ফাংশান উপলক্ষে সীতেশের বাড়িতে ভোজ চলে। অন্নপূর্ণা কেটারার মাছ মাংস দই মিষ্টির বান ডাকিয়ে দেয়।

বলরামরাও আজ আমন্ত্রিত।

সীতেশ সহসা সদাশয় হয়ে বলে, থাক থাক। ওরাই তো খাবে। আমার চক্ষে, জানলে দাদু, ধনী দরিদ্র কোনো ভেদাভেদ নেই। ঘরেও আমি কাজের লোকেদের মাচ দিই।

বাসন্তীর শামসুল মণ্ডল আসে এবং অঞ্চলের দাবিদাওয়া সম্পর্কে এম. এল. এ'কে একটি গণদরখাস্ত ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। হরেনবাবুকে বলে যায়, অবহেলা কারে বলে দেখে আসবেন যেয়ে। ত্রয় কাজ করে নে, করলে শুধু চুরি। খাবার জল দেয় নে, বাসন্তী থানা শুকোচ্চে। আর জল হলে জলনিকেশী নেই। মত্তে চাষী, ভাগচাষী, দিনমজুরের মরণ।

হরেন রায় তোতনকে বলেন, এরা পেছন পানে হাঁটবে না, পুকুর সারাবে না, নলকূপ দেবে।

—দেবে না। চার আনা দেবে, বারো আনা দেবে না।

—সেকালে পুকুরই তো···

—ভাবছি পোকার চাষ করব।

—পোকা!

—হ্যাঁ, কীটপতঙ্গ। কীটনাশকে সব মেরে ফেলে। অথচ কেন্না পোকার খাদ্য হল শস্যনাশক মাজরা পোকা, শোষক পোকা। সুন্দরী ফড়িং তো চেনেন. তারাও শামা পোকা, শোষক পোকা খেয়ে ফেলে।

কীটনাশক কীটের কথা আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘই জানাচ্ছে। আমরা শুনছি না।

—কীটনাশক ওষুধ ব্যবসা কোথা যাবে?

—হ্যাঁ, তারাই থাকবে। আর প্রকৃতির বুক থেকে কীট, প্রাণী, পতঙ্গ সরে যাবে। নেচারে ব্যালান্স আজ রাখতে পারে নেকড়ে মাকড়সা, চার মাড়িযুক্ত মাকড়সা, ঘন্টা মাকড়সা, অর্ব মাকড়সা, লিংক্স মাকড়সা, লাফানে মাকড়সা, কেরা পোকা, সুন্দরী মাকড়সা। এরা ধানের শত্রু মাজরা পোকা, চুঙ্গি পোকা, শামাপোকা বা শোষক পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, সাদা ডেঁপু পোকা খেয়ে ফেলে।

—দেখ!

—নেচারে ব্যালান্স রাখত সাপ। বর্তমানে তার চামড়া পণ্য। সাপ নেই, ইঁদুর প্রতি বছর কি পরিমাণ শস্য হানি করে। দেখে যাচ্ছি সব।

—তোতন, আমার বয়স হয়েছে। স্বাধীনতা শব্দের অপব্যবহার শুধু নয়, পৃথিবী জুড়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনাশ, কত বিরোধী শক্তি চারদিকে।

—এদেশে তো হবেই। কোনো সুস্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলন নেই, খাদ্যের-জলের-কাজের-শিক্ষার-রাস্তাঘাটের দাবিতে—একদা ছিল।

ছিল, ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন বলে হরেনবাবু কেন ভেবেছিলেন ওগুলো তাঁর সংগ্রাম নয়? কেন ছিলেন নিরাপদ দূরত্বে দর্শকের ভূমিকায়? খাদ্য আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, নুরুল ইসলাম মরে গেল, সে সময়ে হরেনবাবু ওষুধের এজেন্ট, প্রাক্তন জেল-বন্ধুদের বাড়ি যান। নিজেদের পথের ও মতের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কত আলোচনা, আর অন্যদের সমালোচনা করেন। এরকম অনেক কথাই মনে পড়ে, একটি পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়াতে আন্দোলন, এমন কত!

—আপনার প্রজন্মটা আমাদের কাজে এল না। তবে হ্যাঁ,

সেকথা বহরমপুরের স্বদেশ ভট্টাচার্য বিষয়ে বলা যাবে না। স্বদেশবাবু বুড়ো বয়সে…সত্তরের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল…ভাবলে এখনো বিস্ময় লাগে।

—সে আন্দোলন কি ঠিক ছিল ?

—যারা কিছু জানে না তাদের কি সমালোচনা শুনব, কেন শুনব ? এখন অবশ্য তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যুগ, একদা আন্দোলন করেছিল বলে আজ সে বিষয়ে কতজন নীরব থাকার যুগ…

—তুমি ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছ।

—না, প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি এক ন্যাড়া কানকাটা, আপনি এক অক্ষম বৃদ্ধ, আপনাকে বলছি। দেখুন, তত্ত্ব ছেড়ে মাটির কাছে না এলে গরিবরা সব বলরাম হয়ে যাবে। একাংশ হয়েছে রাজনীতিক দলের মদত ভাঙিয়ে মধ্যসত্বভোগী। চলুন যাবেন তো আজকে ? পূর্ণদার কাছে ?

—যাব, যাব।

—বলবেন, তোতন এসে যাবে।

—তুমি না নদী টপকে চলে যাবে ?

—যাব, ইচ্ছে আছে।

তোতন সদুঃখ হাসে।

—নদী তো খেয়া পেরোলেই পেরোনো যায় না। পেরোলাম, পৌঁছলাম, বয়স্ক শিক্ষা স্কুল করব, ইংরিজি শেখাব ভাবি, কিন্তু কয়েক শত পরিবার ঝিনুক তুলে যায়। গ্রামের পর গ্রাম পুকুরের জল খায়, মেয়েরা ধানভানানি কাজ পায় না। সেখানে আমি শুধু শিক্ষক হয়ে থাকব, না আবার জড়িয়ে পড়ব ? বলরামদের খুঁজে বের করব, দেখব ও দেখাব ভূমিহীনে ভূমিদান প্রচেষ্টাও কেমন ব্যর্থ হচ্ছে। আমার মনেই যে অনেক প্রশ্ন, এবং সে সংশয়ের নদী পার হয়ে কেমন পার পাব তাও জানি না।

হরেনবাবু গভীর আন্তরিকতায় বলেন, পাবে তুমি তোতন। তোমরা না পেলে চলবে কেন ?

সীতেশের শ্বশুর বলেন, থাকলেন না, গল্পই হল না। যাবেন আমার ওখানে।

—দেখি···

—আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়েই যত জ্বালা।

—কেন, ও তো চমৎকার ছেলে।

রাণু ওঁর ব্যাগ গুছিয়ে দেয়। সীতেশ ওঁকে একজোড়া উৎকৃষ্ট ধুতি দেয়, হরিণের চামড়ার চটি। বারবার বলেন, বরুণদের আসতে বলবেন দাদু। শীতকালে হরিণ খাইয়ে দোব। তাছাড়া সিদে গাড়িতেও আসতে পারে।

কল্যাণীদের নাম করে না।

শুধু বিদ্রূপ করে বলে, অনিরুদ্ধর টেক বড় বেশি। যেন ও সাধু, বাকি সবাই চোর। সল্টলেকের জমিটা ওই যে করে দিতে পারত।

—এত স্থাবর সম্পত্তি বাড়াবে কেন? মেয়ে তো তিনটি মোটে।

—সগলারে তো সমান দিতে হবে। আর ক'টা বচর। মেয়েদের বে' দোব। তা বাদে পাবলিক যদি ছাড়ে, তবে দু'জনা যাব তীথ দেকতে। গয়ার কাজটা···আচ্চা, পিত্তি-পুরুষের পিণ্ডি দিলে পিণ্ডদাতা মরে যায়?

—শুনিনি তো কখনো।

—ইদিকে তেমনটা হচ্চে বটে। রাণুবাবুর দাদা ওই কাজ করে বাদা যেয়ে সপ্পঘাতে···আবার নয়নবাবুও জ্যেঠির সম্পত্তি পেয়ে পিণ্ডি দিতে গেল। পক্কাঘাত! সম্পত্তি ভোগ কত্তে পেল না।

—জানি না সীতেশ।

—আপনি বাপ-মার পিণ্ডি দেননি?

—না রাণু।

রাণু সদুঃখে মাথা নাড়ে।

—কত্তব্য কাজ তো। মেয়েরা, পেন্নাম করো। এই যে দেকলে এ মহাভাগ্যি। আশীব্বাদ করুন যেন পালটি ঘরে পড়ে।

—আমি বলি, লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। তাহলে নিজে একটা জোর পাবে!

—সে কপালে ব্যাপার। লেকাপড়া শিকেও আমার মামাত বোনটা তো বাঁচেনি। কোপ মেরে মারল।

তোতন বলে, বধূহত্যা, কন্যা ভ্রূণ বিনাশ, পণের জুলুম, সব পাবেন এখানে। ব্যাকোয়ার্ড জায়গাটি এসব বিষয়ে খুবই ফরোয়ার্ড।

—সে অভিশাপ তো সর্বত্র।

সাঁতেশ বলে, যুগের নিয়ম। চলো চলো দাদু, তোমায় পোঁচে আবার এট্টু যেতে হবে। মন্দিরতলায় কি হ্যাংগামা হয়েচে। মাতা দিতে হবে।

আগামী নির্বাচনে সাঁতেশ হবে নির্বাচিত প্রার্থী।

ট্রেনে বসে হরেনবাবু ভেবে পান না কলকাতায় বুড়ি না ছুঁয়ে বহরমপুর চলে যাবেন কিনা।

না, দুঃখ পাবে করুণা।

তাছাড়া সুবালাকেও চিঠি দেয়া দরকার। সে এ কয়দিনেই ভাবতে লেগেছে যে মামা গেল কোথায়! "তীর্থে যাচ্ছে" বলে সে বড়ই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। তার মুখে এমন কথাও শোনা গেছে, হালফেশানী ব্যাগ বাক্স নে' ঘরে ঘরে লোক আসে। গোপাল তো আসতে পারত। তোমারো সেই আন্তিকেলে সুটকেশ। এবারে ভালো এট্টা ব্যাগ কিনো।

তখনকার দিনে কেনা "রাজবন্দীর ট্রাঙ্ক ও বেগের দোকান" থেকে তৈরি করানো সুটকেশ, ব্যাগ। যাকগে সুবালা যদি জানত তিনি কেমন তীর্থ ঘুরছেন!

চার

বরুণদের সঙ্গে দেখা এ যাত্রাতেও কঠিন হয়। করুণা বলে, সকলকে একসঙ্গে জোটানো খুব কঠিন।

—দরকার বা কি!

করুণা হেসে বলে, পরিবারে খুবই বিভ্রান্তি। ওদের ধারণা, তোমার সম্পত্তি আমাকে দিয়ে যাচ্ছ।

—আছে, আছে, সম্পত্তি।

—থাকুক।

—আমি তো মুর্শিদাবাদ যাব রে মা।

—ইলার কাছে?

—না না, মুর্শিদাবাদের উত্তরে। আমার সঙ্গে জেলখানায় ছিল, াকে বলে খুব দুঃসাহসী কর্মী ছিল। খুব···সেসব কথা ভাবতে গলে···

—লিখলে না কেন? তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে সেসব কথাও ারিয়ে যাবে।

—কে লেখে মা?

—তুমি ওখানে যাবে?

হরেনবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়।

—দেখ, গোপন সংগঠনে ছিলাম। জনগণের সঙ্গে থাকব, সেবা রব, তেমন কাজ তো কর্মসূচীতে প্রাধান্য পায়নি। জনগণের জন্য াধীনতা চাই, এটা ছিল স্বপ্ন। কিন্তু স্বাধীনতার পর যেন কাজ জে নেয়নি অনেকে, জীবন্মৃত, মৃত, ধর্মপথে গুরু ভজনা, কেউ বা র্থের ভজনা করল। কিন্তু পূর্ণ কাজ করছে।

—তাঁকে দেখতে যাবে?

—হ্যাঁ। স্বাধীনতার পর দেশ ও মানুষের এক চেহারা দেখে লাম। পূর্ণ না জানি কি দেখায়।

অনিরুদ্ধ বলে, এটাই তো তীর্থদর্শন।

—আমার কাছে তো তাই।

—তারপর কোথায় যাবে ছোটকা?

—দেখি।

কল্যাণী বলে, আজকাল সবাই আর নিজেরাই নিয়ে আছে। আপনাকে দেখেও শান্তি।

—সতীশ অতুল বৈভব করেছে।

অনিরুদ্ধ বলে, চিরকালই করছেন। ওঁর ঠাকুর্দাও ছিলেন ওইরকম। উনিও সেই ট্রাডিশন সমানে রেখে চলছেন।

করুণা বলে, শনি-রবিবারটা থেকে যাও। ওদের ডাকি।

নিশ্বাস ফেলে বলে, তোমায় নিয়ে এখন জোর বিতর্ক। আমার কাছে কেন উঠলে! আমি তোমায় মনোপলি করে রেখেছি কেন, এই সব!

—খুব নির্বোধ কথাবার্তা সব। দেখ, সীতেশের ওখানেই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

তোতনের কথা ওদের বলবেন না। তোতন প্রকৃতিকে সাহায্যকারী পোকার চাষ করতে চায় সেকথা বললে বুঝবে কে? সেসব পোকার নামই কি এরা জানে?

তিনি ধানের খবর রাখেন না, চাল কিনে খান। "ধান" শব্দের সংজ্ঞা যে কত ব্যাপক, তা তো জানতেন না।

মনের ভিতরের মন বলে, জানতে চেয়েছিলে?

তোতনও কৃষক নয়। অথচ ধানের জন্যে তার যে প্রবল উদ্বেগ, সে তো সত্যি।

—ওরা এলেও হাঁপিয়ে উঠবে, তবে দু'ঘণ্টা সময় তো ভাল লাগতেও পারে।

এসে পড়ে ওরা শনিবার। করুণাদের বাড়ির সামনে সার সার গাড়ি।

বরুণ, দীপা, মিমি।

ব্যাঙ্ক অফিসার শীলা বলে, ওর স্বামীকে হঠাৎ জাপান যেতে হোল।

শীলার বোন নীলা এবং তার কোল ইণ্ডিয়া স্বামী যুগলেই এসেছে।

ডাক্তার গীতিময়ের বিউটিপার্লার স্ত্রী মিতালি বলল, ওর তো চেম্বার, আর ছেলে ভি ডি ও দেখছে।

শুভময় ও তার বউ অন্তরা ঢুকতে ঢুকতেই বলে, আজ আমাদের বাড়ি চলো ছোটকা।

সবাই প্রণাম করে। শীলা বলে, করুণাটাকে বকে দেবে তো ছোটকা। বাড়ির একটা প্রোগ্রামে যায় না।

বরুণ মেয়েকে বলে, মিমি প্রণাম করো।

মিমি বলে, দাদু, তুমি না কি ভীষণ ফাইটিং। হনুমানের মতো গদা মারতে পারো?

দীপা তাড়াতাড়ি বলে, মিমি! দাদু তো রামায়ণ দেখেন না। সত্যি ছোটকা, রামায়ণটা যে কি ভালো! শীলা বলে, কি ব্যাপার ছোটকা, আমরা কি কেউ নই? আমি তো তোমায় ধরে নিয়ে যাব।

দীপা বলে, করুণা! জয় আর জয়া কোথায়?

—পড়ছে ওরা। মিমি যা না ওদের ঘরে।

—ওদের ঘরে শুধু বেংগলি বুক।

—তাই দেখ্ না।

—তুমি তো বলো বেংগলি ডেড ল্যাংগুয়েজ।

—বড় পাকা হয়েছ।

—পিসি, তোমার টি ভিটা কালার নয় কেন?

—সাদা আর কালো তো ভালো রে!

—কল্যাণী বলে, ওরা পরে পড়বে। চলো মিমি খেলা করবে। ঘরে চলো।

বরুণ আর গীতিময় হরেনবাবুর কাছে বসে।

—ছোটকা, কতদিন আর একলা থাকবে?

একলা কোথায়? কত মানুষ আসে!

—তাহলেও ডাক্তার···নার্সিং হোম তো নেই।

—আমার তো শরীর ভালই।

—বাড়িটা বড়ই, না?

—মাঝারি।

—তোমার পর বাড়িটা কি করবে?

—বাড়ি তোমাদের ঠাকুমার নামে। তাঁর নামে কিছু করে দেব সুবালা অবশ্য যাবজ্জীবন থাকবে।

—তুমি তো এখানেই থাকতে পারো।

—না রে, কলকাতা ভালো লাগে না।

মিতালি হঠাৎ বলে, ভিলেজ তো ভালো। খুব পীসফুল, আর মানুষরা খুবই ভালো।

নীলা ঝঙ্কার দেয়, ছাই! ভিলেজে কান্ট্রি হাউস করতে গিয়ে আমার দেওর যা ঠকল।

অনিরুদ্ধ আর অনিমেষ এসে বসে।

—তুমি নাকি ট্রাভেল করছ ছোটকা?

—হ্যাঁ, দেশ বেড়াচ্ছি।

—সীতেশের ওখানে গেলে?

—হ্যাঁ। তোমাদের বারবার যেতে বলেছে।

—প্রচুর সম্পত্তি করেছে শুনি।

—প্রচুর।

বরুণ বলে, যতীশ জ্যেঠা খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনিই স্টার্ট দিয়ে গেছেন।

হরেনবাবু বলেন, বরুণ! ওকে বুদ্ধিমান বলে না। আমাদের কালে গরিবকে ঠকিয়ে টাকা করাটা ঘৃণ্য ছিল।

শুভময় বলে, গরিব কোথায় ছোটকা? আমার চেম্বারে আমি তো গরিব দেখি না।

অনিরুদ্ধ ঘরে ঢোকে।

—গরিবরা কি আপনার ওখানে যায়?

বরুণ বলে, গরিব নেই তা বলি না। শুভটা যে কি বলে! তবে থ্যাংস টু দি গভরমেন্ট, গরিবী খুব কমে গেছে। এটা মার্কেট দেখলেই বোঝা যায়।

হরেনবাবু শুকনো গলায় বলেন, না। গরিবী হটেনি। বাড়ছে। বেকারি বাড়ছে। এটা ঘটনা।

বরুণ বলে, তবু প্রস্পারিটি বাড়ছে।

অনিরুদ্ধ ঈষৎ হাসে।

—একদিকে বাড়ছে, একদিকে কমছে।

নীলা, শীলা, মিতালি, দীপা ও অন্তরা আজ এ বাড়িতে হরেনবাবুর কাছে আসছে বলে সবাই তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে।

বরুণ ও শুভময় এবং নীলার বর পরেছে ধুতি পাঞ্জাবি।

করুণা বলে, কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের।

দীপা কল্যাণীকে বলে, বাচ্চারা ?

—ওদের খেতে বসাচ্ছি।

—মিমি যেন বেশি না খায় ভাই।

—না, যেমন পেটে ধরবে তাই খাবে।

—কি করেছেন ?

—ভাত, মাছ, মাংস, চাটনি।

—ছোটকা সব খাবেন তো ?

—খই দুধ খান। আজ একটু খাবেন।

নীলা বলে, কেন যে এত করতে গেলেন !

করুণা বলে, ছোটকার জন্যে এসেছ, সামান্য না রাঁধলে চলে ? ভটকি মাছ তো সবাই খাও।

বরুণ বলে, ভেটকি আর ফুলকপি তো ?

—হ্যাঁ, তাই করেছি।

বরুণ খুব ভাবাপ্লুত হয়ে পড়ে।

—মা খুব ভালো রাঁধতেন ওটা ··ছোটকা ! বাবা আর মাকে কানো আরাম দিতে তো পারিনি···

—বড়দা বড়বউদি তো আরাম চিনত না। বড়বউদি···সেজ বউদি···তারা যে কি মানুষ ছিল !

হরেনবাবু সগর্বে বলেন, ছেলেরা জেলে তাই মা গহনা, দামী শাড়ি

পরেন নি। বড়বউদি সেজবউদি কি ঘরের মেয়ে সব! কিন্তু স্বামীরা পলাতক বা অন্তরীণ বা জেলে, তারাও পারত শাঁখা আর লাল পাড় কাপড়।

বরুণ ভাবাবেগে বলে, গ্রেট!

শুভময় বলে, ওসব দিন চলে গেছে ছোটকা।

—তোরা সেই বাপ-মার সন্তান!

নীলা হঠাৎ খুব হাসে।

—না ছোটকা। সে সব কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি। একা করুণা ভোলেনি, সেজন্যে আমরা সবাই খুব জেলাস্। আবার সবাই বলি, করুণাটা যে কি। অনিরুদ্ধ ইচ্ছে করলেই কত টাকা করতে পারে...সিমেণ্টের পারমিট দিতে পারে...

অবাক হয়ে ও মাথা নাড়ে।

—ইলার যে কতো টাকা......বিনতাদির স্বামীটা যে কি করাপটেড...

হরেনবাবু মাথা নাড়েন।

—এগুলো ঠিক নয়।

নীলা তেমনি সহজভাবেই বলে, ছোটকা! তোমাদের ছেলেমেয়ে হয়ে আমরা যে এরকম, এটা কিন্তু নতুন কিছু নয়। দু'চারজনকে বাদ দিলে ছেলেদের দিকে চাইলে তাদের বাপ-মা বাম রাজনীতি করেছে তা বোঝার উপায় নেই। কম্পানি করছে, বক্সওয়ালা হচ্ছে, শিল্পপতি হচ্ছে, দু'নম্বরী করছে। বাবা কেন বলত, কংগ্রেসে যত দুর্নীতি, এরা অন্যরকম? কেন বলত বাবা? ছোটকা, আমরা এ রকমই।

করুণা বলে, বুঝেছি, খেতে চলো সব।

কল্যাণীদের শোবার ঘরে মেঝেতে সবাই বসে খাওয়া। আজ কলাপাতা, মাটির খুরিতে অম্বল।

বরুণ বলে, লাভলি! শুভময় বলে, অম্বরা! এবার আমরাও...

অম্বরা অল্প হাসে, বেশ তো!

নীলা বলে, হবে না বরুণদা এ পরিবেশ পাবে কোথায়? ছোট্‌কা, বড়জ্যেঠিমা, সকলকে এক থালায় ভাত মেখে খাওয়াতেন, বেশ মনে পড়ে।

বরুণ বলে, বাবা মা'র নামে আই মাস্ট ডোনেট সামথিং সাম হোয়্যার।

করুণা বলে, আরেকটা মাছ নাও।

আনন্দময় ভোজন পর্বের পরে বিদায় নেবার পালা। এবার উপহার বেরোতে থাকে।

—ছেট্‌কা এ ফ্লাক্স ভাঙে না

—এটা ট্রাভেল ব্যাগ।

—ধুতি এবং শাল।

—টর্চ, ফাস্ট এইড বক্স।

—নরম চটি, তোয়ালে।

—শুকনো কিসমিস, কাজু, বাদাম।

করুণা বলে, চকোলেটগুলো?

—বাচ্চারা খাবে।

শীলা বলে, হঠাৎ কিন্তু চলে যাব।

—আমার দরজা তো খোলা।

—ওই সুবালা মহিলা…

—কি?

—গুছিয়ে নিলেন।

—ছি ছি শীলা!

—ওই হোল!

ওরা চলে যায়।

করুণা বলে, যাক, ছোটকার কল্যাণে এ বাড়িতে সবায়ের পায়ের ধুলো পড়ল।

—বড়ই হতভাগা সব!

—উপহারের যে পাহাড় ছোট্‌কা।

—রেখে দে সব। সত্যি বউদিরা কেমন ছিলেন, ছেলেমেয়ে সব···

—ইলা তো সোনা কেনে মাঝে মাঝে। আর বিনতাদি কলকাতায় বাড়ি, রাঁচিতে জমি, কি যে করছে! ওর স্বামী দিল্লিতে মাসে তিনবার দৌড়য়।

অনিরুদ্ধ বলে, সবাই করছে, যার মন নিচ্ছে। আমার পিওন তো আমাকে রোজ কিনতে পারে। বউদির মাছ আর তোমার মুরগি, দারুণ উৎরেছে।

কল্যাণী বলে, এবার তুলে ফেলি স·

হরেনবাবু বলেন, খরচও হল খুব।

অনিরুদ্ধ বলে, রাখুন তো!

—কাল মুর্শিদাবাদ।

—সফর শেষ?

—বলা যায় না।

—বহরমপুর যাবার পাঁচ ছ'টা ট্রেন, সত্তরটা বাস। নিশ্চিন্তে ঘুমোন।

—বাসই ভালো। যাব তো কান্দী।

—পথ চেনেন?

হরেনবাবু হাসেন।

—বর্ষার রাতে স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়েছিলাম। সে কি আজ?

সঙ্গে পূর্ণ ছিল, কালী ছিল, কালী তার টেক নেম। সে যে মাজদিয়ার অপূর্বকুমার দে, তা জানতেন না। বাবা মোক্তার, ফরিদপুরে প্র্যাকটিস করতেন। ডাকাতি করবেন রামপ্রসাদ ত্রিবেদীর বাড়ি, ওরা সেপাই রেখেছিল। ডাকাতি করা যায় নি। কালীর ছাতিতে গুলি লাগে। পালিয়ে এসে বর্ষার ভাগীরথীতে নৌকো চাপলেন। কালী বলল, আমি বাঁচব না। মাথাটা কেটে দূরে পুঁতে দিন। লাশ ফেলে দিন জলে। মাথা দেখলে···

কাতানের কোপে তার মাথা কেটে···

দু' বছর বাদে ফরিদপুরে স্বদেশী মোক্তার ভগবতীচরণদের বাড়িতে দেয়ালে কালীর ছবি।

—জ্যেষ্ঠ পুত্র। অপূর্বচরণ দে। আজ দুই বছর গৃহত্যাগী। ছবিটা গ্রাজুয়েশনের পরে···চেনেন ?

—না, দেখিনি।

ওর মা বলেছিলেন, আছে, বেঁচে আছে। দেশ স্বাধীন হলে ঠিক চলে আসবে।

দেশ স্বাধীন হলেও কালী যে আসবে না, সেকথা হরেনবাবু জানতেন পূর্ণর সঙ্গে আবার দেখা যশোর জেলে। ডেটিনিউ দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতেন। পূর্ণ সর্বদা "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" আবৃত্তি করত।

পূর্ণ ঠিক বুঝেছে : দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে। কিন্তু দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার লঙ্ঘন করার কাজ তো অসমাপ্ত, কি বলল পূর্ণ। চনার বিল। ছিল, চালসের বিল ঘোঘরার কাছেই ছিল। সেটা যে মনোযোগের বস্তু তা তো ভাবেন নি হরেন। হরেন কি নিজেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলছিলেন ?

কিন্তু একথা নিশ্চয় অন্যেরাও ভাবছে, যারা তরুণ। তাদেরর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে হত। কিন্তু তাও জীবনের সায়াহ্নে অসম্ভব।

অনিরুদ্ধ ওঁকে বোঝায়।

—বাসে টানা যাওয়া খুব কষ্টকর শুনুন, বহরমপুর যান ট্রেনে। তারপর রিকসা নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে যাবেন। অনেক বাস পেয়ে যাবেন।

—সেই ভালো।

—উপহার তো অনেক পেলেন।

—সবই থাকুক। কিসমিস মনক্কা তোমরা খাও। ফ্লাস্কটা পরিবারকেই দিলাম, ভ্রমণ যখন করো। ট্রাভেল ব্যাগও তোমরা

রাখো। টর্চ আর চিকিৎসার বাক্সটা থাকুক আমার। আর ধুতি ও শাল ঘোঘরাতে দেবার লোক আছে।

—তুমি কিছু নেবে না?

—অধিক জিনিস দেখলে ভয় লাগে রে মা। তোমার ঠাকুমা বলতেন, দুটোয় চলে তো তিনটে কিনো না। মা খুব সাদাসিধা… তোমার বাবা পরে একটু পাতলা ধুতি পরত। তোমার মায়ের পরনে দামী শাড়ি আমি তো দেখিনি।

অনিমেষ বলে, ফেরার কালে এখানেই তো আসবেন? এটা এখন হেডকোয়ার্টার।

—আসব হয় তো। এখন বহরমপুরের ফার্স্ট ক্লাস টিকিট…ইশ্! কেউ যদি যেত।

করুণা বলে, খুব ইচ্ছে করছে।

অনিরুদ্ধ বলে, ছুটি নাও, চলে যাও।

—ওদের না পরীক্ষা?

—দেখ, যেতে চাও চলে যাও। সবদিক গুছিয়ে যেতে হলে যাওয়া হয় না। কথামৃত পড়োনি? এক চাষী সংসার গোছাত, সন্নেসী হবে বলে। তা শুনে আরেক চাষী বলল, সর্ব্বস্ব গুছিয়ে রেখে সন্নেসী হওয়া যায় না। সন্নেসী হতে হলে এইভাবে যেতে হয়। বলে সে সেই মুহূর্ত্তে সন্নেসী হয়ে গেল।

কল্যাণী ঈষৎ হেসে বলল, ঠাকুরপো! এসব গল্প আমরা খুব ভক্তি ভরে শুনি। কিন্তু যে যায়, তার পরিবারের কি হয়? উত্তর কাশীতে, জানেন ছোটকা, এক সাধু বিদেশে যান, ভোগে-রাগে থাকেন। একমাত্র ছেলেকে গেরুয়া দিয়েছেন, সে বেচারাকে ঠাঁই দেন না। ছেলের মা ঠাকুমা বর্ধমানের গ্রামে থেকে গেছেন, ওত গরিব, প্রার্থনা গুরু, গেরুয়া খুলে নাও, ওকে ফিরিয়ে দাও। ছেলেটার অবস্থা অনাহারে অনাশ্রয়ে কি করুণ! ওই সন্নেসী তো এক সংসার ছেড়ে গেরুয়া ভাঙিয়ে সম্পত্তি করছেন। সংসার করে যারা তাদের গৃহাশ্রমই ধর্ম।

—বৌদি! বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চিরকাল জিতছ। তোমার সঙ্গে পারবে কে?

হরেনবাবু বলেন, পরে যাস রে মা! ছেলেমেয়ের পরীক্ষা! বরঞ্চ একবারে ঘোঘরায় আয় সবাই মিলে। হ্যাঁ, ভণ্ড সন্ন্যাসী খুব খারাপ।

কল্যাণী বলে, ধর্মগুরুদের সম্পত্তি কতো! সবার না হোক, বিখ্যাতদের তো বটেই।

হরেনবাবু বলেন, যাক মা! এটা বুঝলাম যে তোমরা গুরু ধরবে না।

অনিরুদ্ধ বলেন, বলা যায় না।

করুণা বলে, ছোটকা, তোমার গুরু নেই?

হরেনবাবু সরল হেসে বলেন, না রে মা! এ জীবনে হল না আর। পরজন্ম তো মানি না।

অনিরুদ্ধ বলে, রাতের ট্রেনে যাবেন। সারা রাত ঘুমোবেন, ভোরে নামবেন।

—পথ নিরাপদ তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবসায়ীরা মালপত্তর নিয়ে যেদিন যায়, সেদিনই ডাকাত পড়ে।

—পড়লে পড়বে। জীবনে প্রথম ফার্স্ট ক্লাসে চড়ব।

পাঁচ

রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জার ভোরে পৌঁছে যায়। হরেনবাবু নেমে আসেন। ত্রিশ বত্রিশে যখন তাঁরা জেলে ছিলেন, স্টেশন ছোট ছিল। সাইকেল রিকশায় বাসস্ট্যাণ্ডে চলে যান। যে দোকানে চা খান, সেই দোকানী বলে, ওই পাশে চলে যান। রামদিয়া-চাঁপাতলা লেখা বাস পাবেন। সাতটা পাঁচে ছাড়বে। পরের বাস দশটা তিনে। চলে যান।

"ডি-লাক্স" লেখা থাকলেও বাস সুবিধের নয়। ভাগীরথীর সেতু পেরিয়ে যায় বাস। নটা বেজে তিন মিনিটে পৌঁছে যান রামদিয়া। যে রামদিয়াতে একদা ডাকাতি করতে এসেছিলেন। সেটা ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখন রামদিয়া বেশ গঞ্জ জায়গা। হাট বসেছে শুক্রবারে। তবে পদ্মাপারে নয়, একটি খালের ধারে, তখন খাল ছিল না। বাসে আসার সময়ে দেখেছেন দু-ধারে হাই ইলডিং ধানের চাষ। এসব তো ঘটেছে। চাষবাস হচ্ছে নতুন পদ্ধতিতে।

রামদিয়াতে অনেক লোক নামে। অধিকাংশ শীতলাতলার যাত্রী। এক তান্ত্রিক মহিলা সোম-বুধ-শুক্রে সেখানে বসে ওষুধপালা দেন। এখানে হাসপাতাল ব্যবস্থা খারাপ। মানুষ দৈবী নির্ভর হয়। সীতেশ নিজেও তো কলকাতায় হার্ণিয়া অপারেশন করেছে, এবং গয়েশপুরের মন্দির থেকে মাদুলি এনে পরছে। এদেশে শুধু অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষ, যারা নিরক্ষর, তারা যদি দৈবী-অলৌকিকে বিশ্বাস করত, বোঝা যেত। কিন্তু ডিগ্রিধারী, তথাকথিত প্রগতিবাদীদের মনেও তো দেবী-নির্ভরতা ব্যাপক।

কত পাহাড় যে ডিঙোনো বাকি।

হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই বলেই দৈবীনির্ভর হয়? একদিকে তো···

—মহিলাকে মেরে ওঠাতে হবে।

চায়ের দোকানে এক রিকশাচালকের মুখে এ কথা শুনে হরেনবাবু চমকে যান।

চা-দোকানী কোনো গোপন আনন্দে উচ্ছ্বসিত। সে বলে, দাদু! হাফ গ্রাজুয়েট প্যাডলারের কথা শোনেন। অর শুধু হিংসা। মহিলা কইরা খাইতেছে···

—প্যাডলার বলে, চিটিংবাজি।

—তাইলে এত লোক আইত না।

—আরে, তোমার আনন্দের কারণ আমি বুঝি। লটারির টিকিট কিনছ, ওই "মা" বলছে পাইবা!

—যা, দাতুরে লইয়া যা!

—আশ্চর্য! সন্তান হইতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায়, রোগভোগে ডাক্তার দেখায়, আবার মায়ের কাছে ছুটে। অ্যাও ছারে না, অও ছারে না, তুই নৌকায় চলতে আছে। চলেন দাতু।

—পূর্ণ চক্রবর্তী, চেন্নার বিল···চেনো?

—চিনি। আমারে দেখলে মাইর উঠাইব।

—কেন?

প্যাডলার নিশ্বাস ফেলে।

—পরীক্ষা দিলাম না। তানার সঙ্গে থাকলাম না। বাড়িতে অভাব, চাকরি তো চারশো বিশ! কোটা সংরক্ষণ! আর পাঁচ বৎসরেও কোটায় পিওনের কাজও মিলে না। লোন পাইলাম না যে বিজনেছ করি, পাঁচুবাবুরে ত্যাল দিয়া দিয়া, শ্যাষে পূর্ণবাবু এই রিকশা বাইরে কইরা দিল। পাঁচুবাবু কয়, আমি কইয়া দিছি। আমি কইলাম, রিকশাও লোনে লইছি, বিজনেছও লোনে করতাম। তা তিন হাজার টাকার বেলা পাইলাম না, বারোশত টাকার বেলা পাইলাম, আপানর বিচার কেমুন? তাতেই কয় অমলটা হারামী।

—তিন হাজার টাকায় কি ব্যবসা করতে?

—ত্যালেভাজা, মুরি, চায়ের দোকান দিতাম। মা ভাই খাটত। দোকান বরো হইয়া যাইত। জায়গা আছিল। আর অহন তো মায়ের কল্যাণে তিনদিন রথ দোলের ভিড়। মানুষে খায় কিন্যা, আমিও ব্যাচতাম। নেন, বারি আইসা গিছে। ভারা ছ্যাড় টাকা, যা দিবেন ছ্যান।

হরেনবাবু দু'টাকা দিচ্ছেন, এততলা টালির বাড়ির রাংচিতার বেড়ার ওপাশ থেকে শোনা যায়, দাঁড়া রে অমল! ভাল সময়ে এসেছিস।

বেরিয়ে আসেন রোগা, কালো, একহারা বৃদ্ধ। চুল পেকেছে, নইলে চেহারা অপরিবর্তিত। গরমে গেঞ্জি ও লুঙ্গি, কাঁধে গামছা।

—আপনি···তুমি···হরেন না?

—চিনেছ তবে ?

—চিনেছি চিনেছি, এ যে অসম্ভব কথা। যাক গে, কথা পরে হবে। অমল রে!

—কয়েন।

—মজিদের বউ বুঝি বাঁচে না। ভরা আট মাস···আছাড় খেয়ে ···নিয়ে যা বাবা।

—মজিদদা মায়ের জলপড়া খাওয়ায় না ?

—এমন দুর্ঘটনা অমল! তুই রিকশা আগা। আমি সঙ্গে যাব।

—হাটবেন ?

—উপায় কি ?

—চিঠি লেখ্যা দ্যান, আমি কথা কমু।

—হরেন এসে পড়ল, তা হরেন বসুক।

—কেন আমিও যাই।

—চলো। হাঁটতে হাঁটতে রিকশা ধরে নেব। অমল পারে, সব পারে, তবে মেয়েটা "বাবা" বলে! ইশ্! পুকুরের পাড়ে কিভাবে পড়ল।

আরো আগে মিঞাপাড়া। মৌজার নামই মিঞাপাড়া। এত বছর বাদে হরেনবাবুর আগমনটা যেন একান্ত স্বাভাবিক। এমন হৈমান্তিক সকালে, রাংচিতা বনে যখন ফড়িং ওড়ে বজ্রনিনাদে "মা"-র টেম্পোরারি থানের সামনের কোনো দোকান থেকে ক্যাসেটে বাজে সকলি তোমার ইচ্ছা।

—রামদিয়ার এ তল্লাটটা ওদের ছিল। এখন হয় প্রান্তিক চাষী, নয় ভূমিহীন—

—আবদুল রহমান ?

—আরে অমল! কোন জাগা যাবি যেখানে কয়েকজন ধনী নেই ? এসে গেছি।

মোটামুটি সুনির্মিত একটি মেটে দোতলা বাড়ি থেকে ব্লক পিওন মজিদ তার বউকে পাঁজাকোলা করে বের করে আনে। পূর্ণবাবু

তিনটি রুগ্ণমান শিশুকে বলেন, দাদীর কাছে যা। তুমি আগাও মজিদ। আমরা রিকশা ধরে নেব।

মেয়েটির তামাটে মুখ নিথর, চোখের নিচে কালচে ছায়া, গলা থেকে ক্ষীণ একটা আওয়াজ।

রিকশার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে পূর্ণবাবু বলেন, মজিদের কপাল বড় মন্দ। বড় ছেলেটা ছ' বছরে মরে গেল। তিনটে বাচ্চা, মা তেমন কর্মঠ নয়। রুকু, ওই রোকেয়াকে দেখে তো মনে হচ্ছে বাঁচবে না।

—হাসপাতাল কত দূরে?

—চার বেডের স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এও ভেঙে পড়ছিল, ডাক্তার ছিল না, শেষে আমরা সবাই তিনটি বছর লেগে থেকে মেরামত হল, ডাক্তার আছে। তবে কেস তো জটিল, কান্দীতেই নিতে হবে।

ওঁরা রিকশা নেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার বলেন, এখানে রাখবেন?

—যা বলেন তাই করব।

—কান্দীতে কুলোবে না, বহরমপুর হলে…

—এখন তো সামলে দিন, দেখছি।

"মা" এখন বড় সাহায্য করেন। পূর্ণবাবু ধরে ফেলে একটি যাত্রীবাহী মাটাডোর। এখন পূর্ণবাবুর ডাকে বেশ কিছু লোক জমে যায়। জনমতের চাপে মাটাডোর চালক বলে, পেশেন নিতে পারি, তবে বলছেন মোছলমান মেয়েছেলে।

দারুণ ক্রোধে অমল বলে, মোছলমান যাত্রী আন না?

দীনেশ নামক মায়ের এজেন্ট, কোনো নেশায় যার চোখ লাল, সে অকারণে পূর্ণবাবুকে প্রণাম করে বলে, উনি বুলছে। পেশেন তুমি লিবে। নয়তো তেল ছুটানো বন্ধ করে দিব।

এত ঝামেলায় মজিদ ও তার বউ মাটাডোরে বহরমপুর যায়। পূর্ণবাবু বলেন, জল পাম্পের কাছ থেকে ননীবাবুকে নিয়ে যাবি, লিখে দিই। নে, টাকা রাখ। মাটাডোরে তো ছ্শো মজা, যাত্রী নিয়ে আসবে। মাথাপিছু যেতে আসতে দশ টাকা, মন্দ কি? যাও যাও।

হরেনবাবুকে বলেন, ননীর ভাগ্যে ডাক্তার। আমরা ননীকে ধরেই কাজ করি।

রিকশাতেই ওরা পূর্ণবাবুর বাড়ি ফেরেন। পূর্ণবাবু বলেন, ওই অমল! সংসার ঠেলতে আমার একটা ভালো কর্মী নষ্ট হয়ে গেল। দেখ, ওই বাড়িটা চিনতে পার?

আধুনিক করা হয়েছে পুরনো বাড়িকে।

পূর্ণবাবু শুকনো গলায় বলেন, ডাকাতি করে এসেছিলাম না? সেখানেই আজ কত বছর···

—হ্যাঁ,কালী···

—ভূগোল পালটে গেছে হরেন! যাক, এসে গেছি। আমার বাড়ি এক হরিহরছত্র করে ফেলেছি। বিয়ে করেছিলাম, জানলে? বিবাহের তিনদিন বাদেই জেল, সপ্তদশ দিনে সর্পাঘাতে পত্নীর মৃত্যু।

—আমরা জানতাম তুমি অবিবাহিত।

—না···করেছিলাম···পল্লীসমাজ তো! মেয়ের বাপের উপর রাগে মেয়ের মেয়ের নামে বিবাহসভায় চরিত্র দোষ দিল···বর উঠে গেল, মা বললেন, বিয়ে করগা যা! যাহোক, সংসার নাই, সংসার আছে। ছোট ভাইয়ের মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত, ভাই নেই, সে আছে মেয়ে নিয়ে। আমাদের সহকর্মী মনোজকে মনে পড়?

—হ্যাঁ, মারা গেল বরিশালে।

—তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সহ, সাহায্য করতাম···এখন এখানে। ছেলে ভাত দেয় না। আর আমাদের এখানকার কর্মী একটা ছেলে, নাম অনাথ, প্রকৃত অনাথ···

—চালাও কি করে?

—বোসো, স্নান করো, কিছু খাও। কুয়া পায়খানা সিস্টেম, তবে রামদিয়া গ্রামকল্যাণ সমিতি এবার পঞ্চাশটা সার্ভিস পায়খানা আদায় করেছে। এবার বায়োগ্যাস করে ফেলব।

তিন ইঞ্চি ইটের গাঁথনি, নিচু বাড়ি, টালির চাল। পূর্ণবাবুর ভাইঝি মন্দিরা ওঁর ব্যাগ রাখে।

—স্নান করবেন?

—হাত মুখ ধুই, পায়খানায় যাই।

—সেই ভালো হরেন। পুকুরে স্নান করব দু'জনে। পুকুরটা পঞ্চায়েত মাধ্যমে সংস্কার হল। ভালো জল।

পূর্ণবাবুর ঘরই বাইরের ঘর। দেয়ালে লেখা "রামদিয়া গ্রামকল্যাণ সমিতি ১৯৭৮" এবং "চন্নারবিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ১৯৮৬"।

—কি দেখ? শুনবে সব। মন্দিরা! আমাকে চা দিস রে, কিছু খেতেও দিস।

একজন শক্ত-পোক্ত বিধবা মুখ বাড়াল।

—সকালে না খেয়ে বেরিয়ে গেলে ঠাকুরপো ···

—হরেন আমাদের পুরনো কর্মী। দেখ হরেন, বউদি মহিলা সমিতি চালান, দর্জি সমবায় মহিলাদের, তার পরিচালিকা। মন্দিরা পড়ায় গোকরণে একটা প্রাইমারিতে। বউদির মেয়ের সেদিন বিয়ে হয়ে গেল। গ্রামেই বিবাহ। মন্দিরার মেয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে, নার্স হবে. কলকাতায় আছে। অনাথ তো মৎস্যজীবী সমবায়ের সেক্রেটারি। যোগফল কি দাঁড়ায়?

—তুমিই বলো। আমি নতুন শিক্ষার্থী।

—আমার পেনশন, এদের সহায়তা, বউদি চালান। কিভাবে চালান, জানতে চাই না কখনো। কোনোদিন তিনজন, কোনোদিন পাঁচজন, আসে, যায়। চলে যায়।

হাত-মুখ ধুয়ে, নিত্যকর্ম সেরে লুঙ্গি পরে হরেনবাবু এসে বাইরের ঘরে বসেন।

—এখানে তোমার আদি বাড়ি ছিল?

—না। তবে বছর দশেক এটাই ঠিকানা। খাও, কলা খাও। কলা, পেঁপে সবই বাড়ির। জমিটা কিনিয়ে দেয় মজিদের বাবা। মোক্তারের সহকারী, বলল কেনেন। জমি বেচে দেবে দত্তরা। রাখতে পারছে না।

—কতটা জমি ?

—তেরো কাঠা। কেষ্টনগরের বাড়ি বিক্রি হল, বললাম ভাগাভাগ চাই না, জমির দামটা দাও, বাড়ির খরচ। ভাইরা তো বেঁচে গেল। তারপর হরেন, তুমি আমার ঠিকানা জানলে কেমন করে ? যোগাযোগ তো নেই।

—কেষ্টনগরের তোতন, মানে কল্যাণময়কে পেলাম ক্যানিংয়ের ওপারে তার ভগ্নীপতির বাড়ি।

—সেখানে তুমি ?

—সীতেশের আমন্ত্রণে। সীতেশ আমার পিসতুত দাদার নাতি। আর, স্বাধীনতা সংগ্রামীর রেল পাস নিয়ে দেখতে বেরিয়েছি। মধুকর বর্মন চিঠি লিখেছিল···

হরেনবাবু সবই বলেন। পূর্ণবাবু কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যান।

—তোতন এখানেও আসতে পারে।

—আসলে আসবে। সেই তো এসে আমাকে বসিয়ে গেল। ছেলে খুব খাঁটি। রাজনীতিটা বোঝে। এখন বলে, যাকে বলে গোড়ার কাজই করা হয়নি। আসত, এবারেও আসত। কিন্তু বর্তমানে ওদিকে থাকাই ভালো।

—চন্নার বিল দিয়ে তুমি নাকি···

—আমি কেউ না। এরাই দীর্ঘদিন ধরে···শোনো, মনটা অস্থির করছে। আমি বরং খেয়েদেয়ে বহরমপুর চলে যাই। তুমি বিশ্রাম করো। অনাথ থাকলে···

এ সময়ে অনাথ এসে পড়ে। কালো, পেশাল দেহ, মাথায় খাটো, চুল তৈলাক্ত ও কোঁকড়া।

—আপনি যাবেন কেনে ? সব শুনে আসছি আমি। আমি চলে যাব সাইকেলে।

—তাই যা। দেখ, ইনি আমার সঙ্গে জেল খেটেছে, অনেক কাজ করেছে।

—পন্নাম দাছু। টাকা নিয়ে যাই কিছু ?

—দেখ্।

—ঘরের লাগোছে টিপা কল। তবু পুখরের জল উঠাবে, রান্না করবে, এখন রঁাধ গা যা ! পুখরের জলে রঁাধ কেনে ?

বউদি বলেন, যাবি তো খেয়ে যা।

—হ্যাঁ, দিদ্‌মা। মাসি কুথা গো ?

—এই যে।

—লাও খাম পোস্টোকার্ট। রাম এলে জাল দিবে না। জাল আমি কেড়হে লিছি। উ বেটা সমবায় ভাঙবে বুলে ঢুকেল্‌ছে। চারা মাছ চুরি কর, তুমি না গাড দাও ? খুব নকশা খেলছ বেটা।

—তুই খবর আনবি, তবে শাস্তি হবে।

—তুমার শাস্তি হবে না হে এ জেবনে। খবর আনব কি, তেমুনে সেথা তো রইয়ে যাব।

অনাথ স্নান করতে চলে যায়। সে হাতে-ভাতে গোগ্রাসে খেয়ে সাইকেলে বেরোয়।

পূর্ণবাবু বলেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথ বসে যা !

অনাথ হেঁকে বলে, সময় হবেক লাই !

—রাঢ়ের গোঁ, সাইকেলেই যাবে।

—এটা কি রাঢ় ?

—রাঢ়ের সঙ্গে মিল বেশি। অনাথের বাপ তো এসেছিল বাপের কোলে চেপে বীরভূম থেকে।

—চন্নার বিলে ?

—বিল হাজার বিঘা। পাশে রায়েদের রাজত্ব ছিল। জমি পাবে ভরসায় এসে কোর্ফা প্রজা হয়ে যায়। সে এক খরার বছর। পর পর খরা। বহু লোক আসে বীরভূম থেকে, এখানে এদিক-ওদিক থেকে। চন্নার মাঠে, বিল ঘিরে ছোট ছোট জনপদ। ওরা মাছ ধরতে শুরু করে। রায়দের সঙ্গে লাঠালাঠি। অনাথের বাবা তো জেলেই মরে যায়। দু’টো পাইককে কেটেছিল। উকিল ফাঁসি থেকে

বাঁচায়। যাবজ্জীবন খাটতে খাটতে বাপ মরল। জমিদার গ্রাম ভেঙে দিতে মা বোনকে কোলে নিয়ে ইজ্জত বাঁচাতে বিলে ঝাঁপ দিল। আমি যখন অনাথকে পাই, ও দিনমান ঝোপ জঙ্গলে ঘুরত, পাখি মেরে খেত, বিলে মাছ ধরত, রাতে শ্মশানকালী মন্দিরের চাতালে শুত, বন্য প্রকৃতি ছিল ওর। তারপর আমি ওকে ধরলাম।

—তুমি এতে লিপ্ত হলে কি করে?

—সে অনেক কথা। চলো স্নানটা সেরে আসি। কোনো খবর এলে তো ছুটতে হবে বহরমপুর। মজিদের বাড়িতেও খবর নেয়া দরকার।

মন্দিরা বলে, কুলসমের মা গেছে ওখানে। মজিদের মা তো পারে না কিছু। বউটাই খাটত।

পূর্ণবাবু বলেন, হ্যাঁ, বউরাই তো খাটে। এত সমিতি করো, এত বোঝাও, কিন্তু মজিদের মা কেন, সর্বত্র এক কাহিনী। সত্তর ভাগ কেন, আশি ভাগ ক্ষেত্রে বউ খেটে মরে। আবার বিশ ভাগ ক্ষেত্রে দেখি, ছেলেটি বউ এবং শ্বশুরবাড়ি নিয়ে উন্মত্ত, ফলে তার বাপ-মা-দাদা-ভাই-বোন পাত্তা পায় না। আবার এর মধ্যেই দেখ, যেখানে শাশুড়ি বউ উভয়ে খেটে রোজগার করে মাঠে ঘাটে, সেখানে অন্তত বধূহত্যা নেই।

—পণের জন্য নির্যাতন?

—পণপ্রথা যেখানে ছিল না সেখানেও ঢুকছে। দেখ, আইন করলে কি হয়? আইনকে কার্যকরী করতে হলে চাই সামাজিক আন্দোলন। আন্দোলন করতে গেলে গলায় পা। আন্দোলন করল জনগণের স্বার্থে, তাতেই সমর্থন পেয়ে সরকার গড়ল। এখন জনগণ কোথায়, সরকার কোথায়, জনগণের স্বার্থে আন্দোলন করতে গেলে তৎক্ষণাৎ পুলিশ নামবে। আর কি জানো? রাজনীতিক দলগুলির সে ক্ষমতাই নাই। রাজনীতি এখন কেরিয়ার মাত্র। কর্মীদের অধিকাংশের ধান্দা, পকেট গুছানো। তারা নিজেরা পণ নিচ্ছে, পণ দিচ্ছে, তারা করবে পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন? আমাদের পাশের

ফলে প্রধান ছেলের বিবাহে চল্লিশ হাজার টাকা নগদ নিল, আর যৌতুক! আমি যাই নি।

মন্দিরা আস্তে বলে, দেবার লোক যে আছে নেবার লোকও আছে…

—যাক, যাইনি তো। এবং নিমন্ত্রণকালেই বলে দিলাম, পণ দিলে বা নিলে পূর্ণ চক্রবর্তী যায় না। ফলে আমার আর নিমন্ত্রণই খাওয়া হয় না।

—জ্যাঠামশাই, রাম এসেছে।

—কোথায়?

নীরবে একটি লোক এসে দাঁড়ায়। মাঝবয়সী, গলায় তুলসী মালা, পরনে ধুতি।

—কি ব্যাপার রাম?

—আমার জালটা দিয়ে দিন।

—জাল তো আমি আনিনি রাম। অনাথ সেক্রেটারি, তুমি সমবায় সদস্য। সে এনেছে, তার কাছে নিও।

—এত কড়াকড়ি করলে সমবায় রাখা যাবে না, দাদু।

পূর্ণবাবু সহাস্যে বলেন, এবারে সরকারী সহযোগিতা....আমি সরে যেতে পারি, আর মরে তো যেতেই পারি। কিন্তু রাম! চন্নার বিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির জন্য আজ চল্লিশ বছর দফায় দফায় লড়াই করলে তোমরা। এবার সমবায়কে ভাঙা যাবে না।

—আমি…অনাথের কাছে চাইতে হবে?

—তোমরাই নিয়ম করেছ। সে নিয়ম ভাঙা চলবে না। এটা তুমি তো জানো।

—সে কোথায়?

—বহরমপুরে। মজিদের বউ পড়ে যেয়ে এখনতখন। তাকে সদরে নিতে হোল, অনাথকেও পাঠালাম।

রাম গভীর বিশ্বাসে বলে, শুক্রবার, মায়ের বার। মা যত অপ্‌দেবতা পিচাশ তাড়ায়, সব বা-বাতাসে ঘোরে তো! কিসে

ধাক্কা দিয়ে থাকবে। পুকুরপাড়ে ছাতিম গাছ। ওটাও তো শ্মশানে পোঁতে, ঘরের কাছে পোঁতে না।

তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, মাছের ব্যাপারটা···তা গাড়রা ধরে ফেলল। চৌকি দিচ্ছ, চুরি করছ। অনাথ মাছগুলো জলে ফেলে দিয়ে জাল নিয়ে চলে এল।

—ব্যাপারটা তোমরা সমিতিতে আলোচনা করো।

—অনাথকে মাপ চাইতে হবে?

—সমিতির কাছে।

—বেশ!

রাম মাথা ঝাঁকে জোরে।

—অনাথ আমার মেয়েকে বিয়ে করল না। স্বামী বিতাড়ন করল। মেয়েটা মুখ শুকিয়ে বেড়ায়।

—পঞ্চায়েতে কথাটা রেখেছ, স্বামী আবার বিয়ে করেছে তো লক্ষ্মীও কাটান-ছেঁড়ান পেয়ে যাবে। পনেরো বছর না হতে মেয়েকে বিয়ে বা দিলে কেন পড়া ছাড়িয়ে!

—কপাল!

রাম চলে যায়। হরেনবাবু বেশ অবাক।

—লোকটির কথাবার্তা খুব পরিষ্কার।

—রামচন্দ্র মণ্ডল। মাধ্যমিক অবধি পড়েছিল। চাকরি তো পায়নি। বিলের ব্যাপারে মামলাও তো হয়। ও কেসে দালালী করত। সমবায়ে চলে এল। কিন্তু পিছন থেকে কাঠি দেবার স্বভাব ছাড়তে পারছে না।

—তুমি যে কত কাজে আছ?

—এদের সঙ্গে আছি বলেই বেঁচে আছি রে ভাই। চলো স্নানাহারটা সেরে নেই। মজিদের ঘরটা ঘুরেই আসি। বাচ্চাগুলো আছে···

—বউটার বয়স কত?

—ছাব্বিশ আটাশ হবে। মজিদের পঁয়ত্রিশ।

মজিদদের বাড়িতে তার মা নাতিনাতনি নিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। কুলসমের মা পাতার জ্বালে ভাত রাঁধছে।

পূর্ণবাবু বলেন, বউ যদি ফিরে আসে, তাহলে সে পুকুর থেকে রান্নার জল আনছে জানলে উনোন ভেঙে দেবো। তোমাদের ভালো করবে কে? পঞ্চায়েতে হেঁটে হেঁটে মিঞাপাড়ায় আজ তিনটে কল বসেছে। তাতেও পুকুরের জল খাব আর পেটের রোগে ভুগব।

মজিদের মা বলে, আল্লায় অং হয় বুল্যে···

—অনেক তো খেলে। এবার বউটাকে বিশ্রাম দাও।

কুলসমের মা ঝনঝন করে বলে, যাত্তারা শুনতে যেছ, দোকানে যেছ, দেহ চলছে, তা উঠানটা ঝাঁটাবে, ঘর দাওয়া লিপা করবে, পারছ না? এ মাগী চিরকাল কামচোরা বাবু। আমার চাচার বিটি, আমি জানি।

মজিদের মা চুপ। টুকটুক মুড়ি খায়।

—মুড়িখেয়্যে উঠান ঝাঁটালবি, পাতা জ্বাল আনবি, কাঁথা কামি ওদে দিবি।

—দিব।

—চলো হরেন।

পঞ্চায়েতের দ্বারা সংস্কারিত পুকুরের ঘাটলা রেখে বাকি পাড় ঘিরে ফণীমনসা ও বাবলা গাছের ঝাড়। অতঃপর তালগাছ, খেজুর গাছ, তারপর বাবলার ঘের। আবার ফণীমনসা।

—ব্যবস্থা করেছে গ্রাম কল্যাণ সমিতি। এই সব বুদ্ধিই রামের। প্ল্যানিংটা বুঝলে? ফণীমনসার গাছ ঝাড় বেঁধেছে, মানুষ পায়খানা করবে না। বাবলার ডালপালা জ্বালানিতে লাগবে, কাঁটাগাছ, গরু ছাগল খাবে না। ফণীমনসার দ্বিতীয় ঘেরও সেজন্য। বাবলা কাঠও শক্তপোক্ত। তাল খেজুর খানিক বড় হলে পাতা দিয়ে গরিবকে বাঁচায়। পাখা, খেজুর পাতার চাটাই আসন বুনতে পারে। ফল দিলে তো কথাই নেই। তাল খেজুর বড় লক্ষ্মী গাছ, মানুষ লাগায় না।

—সত্যি, এ কাজটা তো করা যায়।

—জলে নামো, পরিস্কার জল।

স্নান করে বড় শান্তি পান হরেনবাবু।

—পঞ্চায়েত···বাধা দেয় না?

—আমি সম্পর্ক রেখে চলি। কাজটা হলেই হোল। ক্রেডিট নিক না ওরা। একটু দাঁড়াও।

প্রায় শূন্য চোখে, যেন স্বপ্নের ঘোরে, একটি তরুণী সোজা হেঁটে আসে, কাঁধে গামছা।

—চলো, ও পাশে দাঁড়াই।

—কি ব্যাপার?

—বলছি। কি রে চিনু, চান করবি?

—মেয়েটি চেয়ে থাকে পূর্ণবাবুর দিকে।

মেয়েটি ফিক্ ফিক্ করে হাসে। তারপর বলে, এই বুড়ো, জলে নামবি?

—উঠে আয় মা।

—বিহা না হলে মা হয়? বিহা তো নামে।

—চলো হরেন, লাভ নেই থেকে।

একজন বর্ষীয়ান মেয়ে এ সময়ে হনহনিয়ে আসে এগিয়ে। চুল কাঁচা পাকা, মুখে পান।

—মনোর মা, তোমরা কিরকম আক্কেলের মানুষ? ওকে একলা ছেড়ে দেয়?

—গোহাল কাহাড়ব, নিমেষে পলালছে। হেই চিনু। চল মা! মোয়া থোঁয়াবো, বাবা আনা করে তোরে খুঁজে

পূর্ণবাবু বলেন, চলো।

—মেয়েটি কে?

—পাঁচুর মেয়ে।

—অমল বলছিল পাঁচুবাবু···

—ওই রায় বংশ। বর্তমানে পার্টি করে, মাতব্বর লোক! মেয়েটা চিরকাল ওরকম। না করাল চিকিৎসা, বিয়ে দিল ফরাক্কায়, তারা

ফেরত দিয়ে গেল। কবে বা জলে পড়ে মরবে। মনোর মা বা কত দেখবে?

—লেখাপড়া শেখেনি?

—কই আর শিখল: আবার বিয়ের ইচ্ছে, ছেলেপিলের মা হবার ইচ্ছে···

পূর্ণবাবুর বাড়িতে বৌদি ও মন্দিরার তত্ত্বাবধানে থোড়ের ডাল, করলা ভাজা ও চুনোচচ্চড়ি খাওয়া হয়।

—থোড়, করলা বাড়ির। তোমার সম্মানে তিন পদ। আমরা দুই পদে খাই। মেয়েদের উনোনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাই, বউদি চান পাঁচ পদ রাঁধতে।

খাওয়ার পর পূর্ণবাবু বললেন, আমি তিনটের বাসটা ধরি। তোমার কি দিবানিদ্রার অভ্যাস?

—না না, ঘুমাই না।

—পথে ঘুমিয়েছ?

—খুব। তোমার কথা বলো।

—কোনো মতলবে এসেছ মনে হয়।

—না হে। এ বয়সে আর···সোজা কথা, মনে হয় আমরা যে রাজনীতি করেছি, তাতে তো জনগণের কথা ভাবিনি। ব্রিটিশ গেলেই সব হবে এই ভাবতাম। আমরা ভাবতাম ব্রিটিশ একমাত্র শত্রু। কিন্তু ভূমিব্যবস্থা শত্রু, জমিবাবু-জোতবাবু-মহাজন-দালাল, শিল্পপতি, সাধারণ মানুষ-বিচ্ছিন্ন রাজনীতি সবই তো শত্রু। দেখ, স্বাধীনতার পরে এসব বোঝা গেল। আর এখন তো মর্মে-মর্মে বুঝি; জনগণের কাজ করতে গেলে সরকার হয়ে বসলে বড় মুশকিল।

—সিধা কথা, আন্দোলন নেই।

—তা সব বুঝেও তো আমার মতো মানুষেরও কিছু করার থাকে। স্বাধীনতার ব্যাপারটা বাস্তবে কিরকম তা জানতে হয়।

—সব নেগেটিভ নয়, সব পজিটিভ নয়।

—জগাখিচুড়ি?

—যে যেমন বোঝে। আমি বুঝি সাধ্যমতো কাজ করে যাব, নিজের কাছে পরিষ্কার থাকব।

—আমি দেখ···দীর্ঘকাল ধরে···কয়েকটা প্রাইমারি স্কুল গড়লাম, অনুমোদন পেল। সেখানে তো আমার দরকার নেই। সকালে হোমিও ফার্মাসিতে বসি, কিছু রোজগার করি। বিকালে বাড়িতে বিনা পয়সায় রোগী দেখি···সন্ধ্যায় নিরক্ষরদের সাক্ষর করার পাঠশালা চালাই। তাছাড়া যে যেমন বলে, সাধ্যমতো কাজে লাগবার চেষ্টা করি···

—এই তো চাই। কাজ তো করছ।

—তোমার মতো নয়।

—যে যার মতো···বৃদ্ধদের তো সাধ্য থাকলে কাজ করা দরকার ···যুবকদের গাল দিয়ে আমরা দায় সারি। তারা তো আমাদের মধ্যে আদর্শবাদ ছিল, তেমনটা দেখে না। আর কি জান, যার বয়স পঞ্চাশ, সে তো অতীত বোঝে না। তার কাছে চার টাকা মণ চালও রূপকথা, আমাদের বোমা বন্দুকবাজিও রূপকথা। রাজনীতি শব্দটার মানেও ঘোলা হয়ে গেছে। আসলে রাজনীতিই নেই আছে স্বার্থনীতি, সর্বত্র।

- তোতনকে ধন্যবাদ, সে তোমার কথা বলল।

—আরে, আমি কোনো মহাপুরুষ নই। চন্নার বিলের আন্দোলন কি আজকের? দীর্ঘ তার ইতিহাস। একটা পর্যায়ে আমি ঢুকে গেলাম। তার অনেক আগে থেকে···এ কি, ননী, তুমি?

ননীমাধব পাল সেই লোক, যে সম্ভবত কোনো সময়েই স্থৈর্য হারায় না।

—দাঁড়ান দাদা, বসি। জল খাই।

—পাখা নাও।

—জল খাব।

ননী ময়লা তোয়ালে রুমালে মুখ গলা ঘাড় মোছে। দু' গেলাস জল খায়। তারপর মাটির দিকে চেয়ে থাকে।

—খবর খারাপ।

—হ্যাঁ···অপারেশন টেবিলেই···হেমারেজ বন্ধ করা গেল না···ভরা কলসির ওপর পেটটা পড়েছিল···ডাক্তাররা চেষ্টা করেছিল। রক্ত নিতেই আসবে?

—আজ আসবে?

—রাত করে এনে বা কি হবে, মজিদের বাড়িতে বা জানিয়ে কি হবে। সকালে আনা চলে।

—মজিদ কেমন?

—পাথর হয়ে আছে।

—মজিদ যা চায় তাই করো। ওদের আত্মীয়তে তো পাড়া বোঝাই।

—ম্যাটাডোরেই পাঠাই।

—দেখ কাণ্ড! কি হয়ে গেল! তিন তিনটে বাচ্চা! কি থেকে কি হল। পড়েই তো সর্বনাশ করল। নইলে এখানেই প্রসব হত।

—ওদের বাড়িতে···

—কুলসমের বাপকে বলি। মৃত্যুসংবাদ চেপে রেখে বা কি হবে। যা কাল জানবে, আজ জানুক। টাকাপয়সা লাগত?

—না না!

—সাফসুতরা করে আনে যেন। মনটা খারাপই হয়ে গেল। সেদিনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাচ্ছিল। যেত, মাঝে মাঝে দেখাত, ওষুধও খেত।

—আমি চলে যাই। যাব তো একা, সাইকেলে ওরা যদি কেউ যায়!

—দেখি. চলো যাই।

চলে যান পূর্ণবাবু। বউদিও সঙ্গে গেল। হেমন্তর অপরাহ্ন বেলা। পুরুষরা তো বটেই, মেয়েরাও অনেকে যে-যার কাজে গেছে। ওদিকে মায়ের থানে ক্যাসেট বাজে দোকানে, মাইকে বলে,

ভিড় করবেন না। লাইনে আসুন, ধৈর্য ধরুন। মা দেবতার অংশ, সবার কথা শুনবেন।

দেবতার অংশ হতে গেলেও এজেন্ট চাই, প্রচার চাই। দেবত্বের দাবী এখন ভালো ব্যবসা। সরকারী পরিভাষায় ইনকাম জেনারেটিং স্কীম। দেবতার অংশ যিনি, তিন টাকা পান, এজেন্ট পায়, ভীড় কণ্ট্রোলার পায়, চা-পান-বিড়ি-সিগারেট তেলেভাজা-মুড়ি-মিঠাই দোকানীরা পায়। ম্যাটাডোর, সাইকেল রিকশা চালক, রিকশা-ভ্যান চালক. সবাই টাকা পায়। সরকারী স্কীম ব্যাতিরেকেই ফলাও ব্যবসা। স্তুতি গানের ক্যাসেট, মায়ের মাহাত্ম্য প্রচারক পুস্তিকা বিক্রির স্বতন্ত্র দোকান।

এখন কানে আসে শোকবিলাপ। মৃতের জন্য কান্নাকাটির সুর এমনই, যে চিনতে দেরি হয় না। সকালেও মেয়েটার জীবন ছিল।

মন্দিরা এসে বসে, মুখ থমথমে।

—রুকুর কথা ভাবতে পারছি না।

—পরিবারটা ভেসে যাবে।

মন্দিরা বিষণ্ণ হাসে।

—রুকুর ছোট বোনকে বিয়ে করবে মজিদ, তাই মনে হয়। বিয়ে তো ওকে করতেই হবে। ছোট ছোট মেয়ে, তাতে মা খুব কাজের নয়।

একটু থেমে বলে, ইতি, আমার মেয়ের বাবা তো স্ত্রী থাকতেই বিয়ে করল···মেয়ের কথা ভাবল না।

—তোমরা তো দাঁড়িয়ে গিয়েছ।

—ইতি নার্স হলে···রুকু ছিল সংসারী। যেমন কাঁথা সেলাই, তেমন ঘরদোর পরিষ্কার রাখা। ওদের পরিবারটা তো ভালো। বোনও কিছুদূর পড়েছে।

—জীবন আর মৃত্যু!

—জ্যাঠামশাই আবার সদরে না যান।

পূর্ণবাবু ফিরে আসেন।

—সকালে বুঝেছিলাম অবস্থা ভালো নয়। তবে এত তাড়াতাড়ি মারা যাবে···

মন্দিরা বলে, দেহে ছিল না কিছু। এবার বলছিল, এতদিন ধরে অরুচি···খেতে পারি না···

—যাক! রোকেয়া কাহিনী শেষ হয়ে গেল।

হরেনবাবু বলেন, আনবে কখন?

—গিয়েছিল, অপারেশনও হয়, কিন্তু বাঁচানো গেল না? মেটারনিটি হোম একটা করতেই হবে। মেয়েদের ডেলিভারি একটা···চলো হরেন, বিল দেখিয়ে আনি।

মন্দিরা বলে, তাই যাও। এসব তো তুমি দেখতে পারো না। বরাবর দেখছি।

পূর্ণবাবু বিষণ্ণ হেসে বলেন, আর পারি না। অনেক দেখেছি, এখন পারি না।

পূর্ণ চক্রবর্তী! অন্তত চারজন পুলিশ ইনফরমারকে মেরেছে, কালীর মাথা কেটে···হরেনবাবু ভাবেন, সেসব কাজ কি আমরাই করেছি?

পূর্ণবাবু বলেন, বড় অকালে গেল।

বিলে যাবার পথও মিঞাপাড়া দিয়েই। রোকেয়ার শাশুড়ির গলায় আন্তরিক বিলাপ।

—মুড়াহি ভিজালি, গেলি না। তোর আবুল, ছবি, বেবিরে কে দেখবে রে মা! নতুন কাঁথা গায়ে দেলে না, নতুন সরায় ভাত খেলে না, এত পাষাণ বা হলে কেন?

পূর্ণবাবু কাকে যেন প্রায় ধমকে বলেন, নবীপুরে যাও। বাপ মা খবর পাবে না? তেমন দূর তো নয়।

দুজনে নীরবে হাঁটেন।

আধ মাইল হাঁটতেই হঠাৎ চোখে পড়ে চন্নার বিলের অগাধ জলরাশি।

পূর্ণবাবু বলেন, বহু পুরাতন বিল। হেজে-মজেও হাজার বিঘা। পুরনো গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে।

—ওটা কি, ওই বাড়িটা ?

বর্তমানে ফিসারি সমবায়ের আপিস। রায়রা তৈরি করেছিল। শিকার কুঠি। সায়েবরা, দেশী সায়েবরাও এসে শীতকালে থাকত, পাখি মারত।

বিলের জলে আকাশের ছায়া।

পূর্ণবাবু বলেন, কথা কইতে পারলে বিলটা অনেক ইতিহাস বলতে পারত।

—এত বড় বিল !

—এরা "সাগর" বলে।

পূর্ণবাবু বলেন, যাক। এখন আমার মনে শান্তি। মরলে দুঃখ নেই। সরকার বিল সংস্কার করবে, মৎস্যজীবী সমবায় মাছ চাষ করবে। সেচ খাল হলে সেচের জল দেয়া যাবে, নয়তো লিফ্‌ট ইরিগেশান। ওই টংগুলো চৌকিদারদের। ছ' বছর আগে আমিও পাহারা জেগেছি।

—এতখানি জল দেখলেও শান্তি।

—এত জল, সেচাভাবে কৃষক মরে। সংস্কারের কাজ চলবে কয়েক বছর। রায়রা কত বছর ধরে বাধা দেয়। অথচ এ বিল তাদের নয়। তাদের সম্পত্তি বলেও রেকর্ড নেই। ওরা লাঠির জোরে দখলে রেখেছিল।···বলব, সবই বলব তোমাকে। সংক্ষেপে বলব।

—পদ্ম ফুটে আছে এখনো।

—কমে এসেছে। তবে মুর্শিদাবাদে তো পদ্মফুল খুব হয়। চালান যায় কলকাতা। এই বিলের বৈশিষ্ট্য, রক্তপদ্মের রং খুব গাঢ় গোলাপী।

—ওগুলো গ্রাম ?

—হ্যাঁ···অনেক দিনের। বিলের গভীরতা একেক জায়গায় একেক রকম। তবে চৈত্র বৈশাখেও ডাঙা দেখায় না। আগে তো এটা ছিল জলের উপায়। বিগত আট বছরে টিউবওয়েল যথেষ্ট

বেড়েছে। বিলে কাপড়কাচা বন্ধ। মাছ ছাড়া হয়েছে। চলো আরেকটু হেঁটে আসি। খানিক ছেড়ে ছেড়ে গাছ লাগাবে ওরা।

যেন সমিনতি হাসেন পূর্ণবাবু।

—সবই বড় লড়ালড়ি করে, করতে হয় এখন। ইউক্যালিপটাস নেব না। কিছু ফাঁক রেখে রেখে তেঁতুল, শিরিষ, বট, অশত্থ, মেহগনি, সেগুন, শাল···জেলায় কত বড় বড় শাল-সেগুন-মেহগনি গাছ ছিল সেদিনও। মানুষের অন্ধনীতি, দুরন্ত লোভ! কিছু বকুল, বহেড়া গাছও দেব। কলকাতা থেকে আনাব।

পূর্ণবাবু একটু দাঁড়ান।

—লাগানো দেখব, বড় হওয়া দেখে যাব না! জলপাইগুড়ির জঙ্গল মনে পড়ে?

—খুব।

—বাঁশগাছও অর্থকরী। ওরা যদি রাখতে পারে! পুকুরের জলে রান্নায় রং ভালো হয়। এ বিশ্বাস থেকে মজিদের বউটা দেখ··· অকালে···এই ঘেরা জায়গাটা দেখ, দিগম্বর মণ্ডলের নামে ফলক দেব। উনিশ শো দশ সালে সেই প্রথম লড়াই করে রায়দের সঙ্গে। এখানে ও মরেছিল।

কচা গাছে ঘেরা জায়গাটি সেই শহীদের স্মৃতি।

—দিগম্বরের লড়াই দিয়ে শুরু। চন্নার বিলে সময়ে সময়ে অনেক লাস পড়েছে। চলো, ফিরি।

ওঁরা ঘরে ফিরেছিলেন সন্ধ্যায়। রোকেয়াও ঘরে ফিরে এল রাত ন'টা নাগাদ। পূর্ণবাবুর বাড়িতেও আজ সবাই নীরব। মজিদের বাড়িতে কান্নার শব্দ এক সময়ে ক্ষীণ হয়ে এল।

হরেনবাবু পূর্ণবাবুর ঘরেই শুয়েছেন। ঘুম আসবে না ভেবেছিলেন, ঘুমিয়ে পড়লেন।

খুব ভোরে পূর্ণবাবু তাঁকে ডেকে তুললেন।

—কথা তো অনেক, হরেন। সময় তো নেই।

—কোথাও যাবে ?

—না না, তোমার আমার কেন, সময় সকলেরই সংক্ষিপ্ত। চা খাও, পায়খানা সেরে এসো। চন্নার বিলের কাহিনী জেনে যাবে না ? আমার জীবনের এ পর্বটাও তো জানতে চাও। কি দেখ অমন করে ? রোকেয়ার মৃত্যুর কথা মনে চাপা দিলাম। কেন দিলাম ? জীবন থাকলে মৃত্যু থাকবে। রোকেয়া তো ধনীর বউ নয় যে শাস্তিতে সুপ্রসব হবে। একটা শান্তি, তিনটেই ছোট। ছয়, চার আর দুই বছর তো বয়স। কয়েক বছরে ওরাও ভুলে যাবে।

—মজিদের অবস্থাই শোচনীয়।

আশ্চর্য, কালও ওদের চিনতেন না। আজ তো না ভেবে পারছেন না। জীবন এরকমই।

—হ্যাঁ···কাঁদবে···তারপর উঠবে, খাবে, কাছে যাবে। কত দেখলাম ! সন্তান মরে যায়, মা পড়ে থাকে। সেই মাও ওঠে, স্নান করে, ভাত খায়।

পূর্ণবাবু স্মিত হাসেন।

—সব কিছু দেখবার একটা দর্শন তৈরি করতে হয়। নইলে মানুষ বাঁচতে পারে না। ওঠো, চলো হেঁটে আসি। প্রভাতে চন্নার বিল বড় সুন্দরী, কে বলবে বয়স হয়েছে।

—চলো। সময়েরই তো অকুলান।

—মধুকরের কথা ভাবছিলাম। রাজনীতি করতে গিয়ে মরল। পার্টিগত রাজনীতি করল কেন ? ওরা তো মেজ না সেজ শরিক। পার্টিগত রাজনীতি! সে বেঁচে আছে, না মরে গেছে, কেউ খবর নেয় ? তোমার মতো কাজের কাজ নিয়ে থাকলে এত বুক ভাঙত না। অনাথ, মজিদ, এমন পাঁচটা মানুষের সঙ্গে আছি বলে বেঁচে আছি। তুমিও তো তোমার কাজে আছ।

—তুমি আমার কথা বোল না পূর্ণ।

—কেন হে মোহিত ?

দীর্ঘকাল বাদে "টেক নেম" শুনে হরেনবাবু হেসে ফেলেন বলেন, তাই চলো হে রামেশ্বর।

—সত্যি, কত ডিসিপ্লিন যে ছিল।

—ডিসিপ্লিন মেক্‌স এ ম্যান।

কিছুক্ষণ বাদে ওঁরা হাঁটতে বেরোন। অনাথ বলে, নবীপুর থেকে ওরা আসছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একবার যেয়ে দাঁড়াব।

—বিয়ে সাদী লোকে কেন যে করে!

—তুমি রামের মেয়েকে বিয়ে করবে অনাথ। স্বামী নিল না বলে মেয়েটা ভেসে যাবে?

—সমিতির মিটিং ডাকি, রামের বিচার হোক। মনে মনে রাম এখনো জমিদারের দালাল।

—সে আলাদা কথা।

—এবার ফাল্গুন চোতে সাতটা ডোবায় ডিম পোনার চাষ ধরাব, জেনে এসেছি সব।

—বাজারে যাস অবশ্যই।

—আপনি যান না।

বেরিয়ে এসে পূর্ণবাবু বলেন, মালাকেই বিয়ে করতে হবে ওর। ও ছেলে সংসারী না হলে বাঁধা পড়বে না।

সকালে চন্নার বিলে শত সূর্য চমকায়। হাঁস সাঁতার কাটে। ওঁরা দিগম্বর মণ্ডলের ফলক তোলার জায়গাটিতে বসেন একটি গাছের খুঁটিতে।

—বিল দখলে রেখেছিল রায়রা। ওরা এসেছিল সেই সরফরাজের আমলে। তখন এসব জায়গায় অঢেল জমি। লোকবসতি কম।

আশে পাশে ছিল জঙ্গল, কাশ ঝোপ। রায় পরিবার অগাধ জমির প্রলোভন দেখিয়েছিল, ফলে প্রজা আসতে শুরু করে। বীরভূম, রাজমহল, জেলার অন্যান্য প্রান্ত থেকে। এ রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতোই এখানেও এসেছিল আদিবাসী সাঁওতালরাও। অন্যান্য

জায়গার মতোই এখানেও জমি সুফলা হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজা উচ্ছেদ হত, নতুন প্রজাকে জমি বিলি করা হত।

উনিশ শো দুই সালে দিগম্বর মণ্ডলরা উচ্ছেদ মেনে নেয় না। এই জলকরে তারাই মাছ ধরা শুরু করে, সম্বৎসর মাছ ধরত, ওদের একটা অংশ বর্ষায় জলভাসি অঞ্চলে শোলো ধানের চাষও করত। মাছের বারো আনা জমিদারের প্রাপ্য দিতে দিতে অবশেষে দিগম্বর বলে, জমিদার আসেন না, পেয়াদার অত্যাচারে মরি, এখন থেকে আর মাছ দেব না। মুখের কথাই নয়, রায়দের গোমস্তা ও দুই পেয়াদাকে মেরে গলায় পাথর বেঁধে নৌকোয় নিয়ে মাঝ বিলে ফেলে দেয়।

বিলের পুব কোণটা এখনো মহেশমারি মৌজা বলে রেকর্ডে লেখা আছে, পরবর্তী গ্রামের নাম যদিও শামড়া।

এ ঘটনার তদন্তে রায়বাড়ির যে পাইকরা আসে দিগম্বরের সঙ্গে তাদের লড়াই হয়। কিছু মিটমাট হয়, কিন্তু বারো আনার বদলে দশ আনা ভাগের জায়গায় এক আনাও ভাগ নাই বলে দিগম্বররা শ'তিনেক ঘর বিদ্রোহ করে। সে সময়ে জমিদার সারা বছর বাজে আদায় চালাত, উচ্ছেদ করতে গিয়েছিল। সেটাও রাগের কারণ। গেজেটিয়ারে দিগম্বরকে "ডাকাত" বলা হলেও কবিগান ও পাঁচালীর দেশ মুর্শিদাবাদের লোককবি তাকে "শূর বীর" এবং "প্রজা ত্রাণে কলিকালে কৈলা আগমন" বলে সম্মান জানিয়েছেন। দিগম্বর বর্শা বিঁধে দশজনকে মেরে মরেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব আসে, বিচার শিবির বসে, বিদ্রোহীদেব জেল ও জরিমানা হয়। সেটা উনিশ শো দশ সাল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর উনিশ শো আঠারো নাগাদ এখানে মৎস্যজীবী পরিবার অনেক। দশ আনা পাওনার বিরুদ্ধে আবার প্রতিবাদ ও দাঙ্গা হয়। মুসলিম জেলেরা সামিল ছিল বলে রায় পরিবার প্রমাদ গনে। জেলেদের সঙ্গে আবারও লড়াই হয়। ফলাফল এগোয় না।

উনিশ শো তিরিশ থেকে, সর্বত্র যখন অহিংস আন্দোলন, এখানে

জেলেদের বিক্ষোভ চলতেই থাকে। কখনো থামে, কখনো বাড়ে। রায়দের মামলার খতিয়ানে দেখা যায়, ১৯৪৫ অবধি তারা ন'শো ফৌজদারি মামলা করেছে। চন্নার বিলের চারপাশের গ্রামগুলিতে একটি পরিবাও নেই, যা থেকে কোনো না কোনো পুরুষ মানুষ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পায়নি।

—যাবজ্জীবন হত্যাপরাধেই হতো হরেন।

—তুমি এতে জড়ালে কিভাবে?

মাঝের ইতিহাস একই রকম। তবে অনাথের বাবা লেখাপড়া জানত। সেই প্রথম মৎস্যজীবী সমিতি করে ও ১৯৪৮ সালে রেকর্ড সার্চ করিয়ে প্রমাণ বের করে যে চন্নার বিল রায়দের সম্পত্তি নয়। ওই জলকর রাজশাহী জেলার কোনো বাহারুদ্দিন রহমানের ছিল, যাদের কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

স্বাধীন ভারতে রাজ্য সরকারের কাছে ওই বিলে মৎস্যজীবীদের দু'হাজার মানুষের অধিকার স্বীকৃত হোক দাবী জানাতে গিয়ে জমিদার ও পুলিশের সঙ্গে ওদের সংঘাত বাধে।

পূর্ণবাবু কেষ্টনগরে ছিলেন। চন্নার বিলের কথাও জানতেন না তাঁর জানার কথাও নয়। কিন্তু সত্তরের আন্দোলনে যোগ দেয় তাঁরই ভাগ্নের বন্ধুরা, বন্ধুদের বন্ধুরা, পূর্ণবাবুর কাছে আসত যেত।

—জরুরি অবস্থায় বেশ কিছু ছেলে জেলে গেল। তারা মুক্তি পেতে চন্নার বিলের স্নেহভাজন সে জেলে ধীরেন মণ্ডলের কাছে চন্নার বিলের কথা শোনে।

—তোতনের বয়স কত?

—এখন তেত্রিশ হবে। তা সে সময়ে পরিবারে আমি খুবই অপ্রিয়। বুড়ো বয়সে না কি বাঁদর নাচছি। চলে এলাম এখানে। ধীরেন মণ্ডলকে খুঁজে বের করলাম। তারপর থেকে দীর্ঘ লড়াই। এ পরিস্থিতিতে সে লড়াই কত কঠিন তাই ভাবো। ব্যাপারটা সম্ভাবনাময়, ফলে রাজনীতিক ও অন্যান্য টাউটও জুটে যায়। আমি

এলাম আটাত্তরে। দিলাম সমবায় সমিতি গঠন ও রেজেস্ট্রি করে অনাথকে পেয়ে গেলাম।

—তোতন কেন ক্যানিং গেল?

—পুলিশ ওকে দুটো সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। টাকা নাও, শেয়ালদায় ব্যবসা করো, বড়ঘরের ছেলে। নইলে যে কোনো কেসে ফেলে গুলি করে দেব। এমনই শুনেছি। তোতন ফিরতে চায় না।

—তারপর?

—দীর্ঘ ইতিহাস, কত বলব! তবে এ বছর চন্নার বিল বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত, সংস্কার হবে, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বিলের মালিক। নতুন দুটো সমিতি হয়েছে, তারাও থাকবে, অর্থাৎ পার্টিগত সমিতি। তা থাকুক।

গভীর স্নেহে বলেন, সংস্কার হলে বিল থেকে আরো মানুষ অন্ন পাবে, পাক। বললাম সংক্ষেপে। বই লিখেছি একটা, পড়লে জানতে পারবে।

—বাধা আসে না?

—আসে। নরমে-গরমে চলতে হয়। তবে গ্রাম কল্যাণ সমিতি মাধ্যমে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আট কিলোমিটার পথ পাকা হল, স্কুল হল আরেকটা, মেয়েদের সমিতি, গাছ লাগানো, চক্ষু অপারেশান শিবির, এসব কাজ তো করা হয়েছে, কাজ চলছে। কৃতিত্ব পঞ্চায়েতও নেয়, নিক গে। আমাদের গণভিত্তি আছে তা জানে। রাজনৈতিক উচ্চাশা নেই, তা জানে। সরকারী গ্রামীণ প্রকল্প নীতি মেনেই কাজ করি আমরা।

—অনেক জানলাম জীবনের এ সময়ে।

—কি জানলে?

—সংগ্রাম ফুরায় না কখনো। সংগ্রামের চেহারা বদলে যায় বাইরে।

—অন্য সংগ্রাম বিষয়ে সরকার তো ব্যাঘ্রচক্ষু। মানুষের কাছাকাছি···বাঁচার লড়াই···চন্নার বিলের পাড়ের গ্রামগুলির

মানুষদের বাস্তু ও জমির অধিকার রেকর্ড হয়েছে। উচ্ছেদের উপায় নেই আর। ওরাও সচেতন হয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে।

—আর কি কর্মসূচী?

—যা বললাম, তাও যথাযথ হচ্ছে কিনা ওরাই খবর রাখে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র করি যদি, অমল সন্ধ্যায় একজন শিক্ষক হবে।

—ভালো ছেলেদের পেয়েছ।

—হরেন! তরুণরা খুবই ভালো। আদর্শ চায়, বিশ্বাস চায়, কাজ চায়, নিঃস্বার্থ হতে পারে। আমরা ওদের ভালবেসে কাছে যাই না বলে জানতে পারি না। সব আছে হরেন, অনাবিষ্কৃত। আবিষ্কার করি, মুগ্ধ হই, নিজেকে খুব ছোট লাগে।

—দিগম্বর বিশ্বাসের ফলক হবে?

—হ্যাঁ। সেদিন উৎসব হবে। এসো।

—স্বাধীনতার সদর্থক ইতিবাচক রূপটা দেখতে পেলাম, বলতে পারব।

—যদি দেখে থাকো, তার নির্মাতা অনাথরা। আমি নিমিত্ত মাত্র। আর নয়, চলো। মজিদের বাড়ি যেতে হয় একবার। এসব কর্তব্য…দাঁড়াও, কে আসে?

বাতাসে চুল উড়িয়ে একটা ছিপছিপে মেয়ে ছুটে আসছে তাঁদের দিকে।

—মালা! তুই?

—দাদু গো! বাবা বুলছে, গলায় দড়ি দিবে, অনাথের কাছকে বিচার হবেক নাই, তুমি এস গো!

—বটে?

পুরনো দিনের মতোই পূর্ণবাবু জ্বলে ওঠেন।

—যাচ্ছি আমি। তুই যেয়ে অনাথকে ডেকে আন্‌গে। বলবি আমি ডাকছি।

—যেছি গ!

—রামের মেয়ে?

—হ্যাঁ, কথা শুনে বুঝবে না। বড় বউ নিঃসন্তান, নলপুরের একটা মেয়েকে বিয়ে করল, সে নামালে এসেছিল। তিনটে মেয়ে, ছেলে হল না, একটাকেও স্কুলে দিল না। বহু ঝামেলার পর মেজ আর সেজটা যাচ্ছে স্কুলে। মালাটাকে বিয়ে দিল এক জবর মাতালের সঙ্গে। সেসব কেড়ে-কুড়ে মেয়েটাকে···মালা তো ভাগে ছাগল পুষে, গরু পালানী নিয়ে পেট চালায়।

—রাম ভাত দেয় না?

—না। গোত্রান্তরী মেয়েকে ভাত দেবে না।

রামের ঘরের উঠোনে বেশ ভিড়। সে একটি দড়ি নিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে, গণতন্ত্রে সবাই ইচ্ছেমতো চলতে পারে। আমি যদি আমার নিম গাছে আমার দড়ি আমার গলায় দিই, কে বাধা দিতে পারে?

পূর্ণবাবু চোখ সরু করে দেখেন।

—যাও ঝুলে পড়ো।

রামের বউ কেঁদে ওঠে।

—রাম আমাদের বড়ই চালাক। তোরা যে হাউকাউ করছিস, ওটা তো ছাগল বাঁধা দড়ি।

যুধিষ্ঠির সিং, (আজ্ঞা বীরভূমের ডম বটি) এখন চেঁচায়,

—তাতেই বুলি, ছাগলবাঁধা দড়িটো পেচ্ছি না কেন?

দড়িটা ছিনিয়ে নেয় ও। এবং অনাথ ও মালা এসে পড়ে। মালা ছিপছিপে, জামা-কাপড় খুব বিবর্ণ, চুল রুক্ষ, তাতে হাত খোঁপা, খুব সাধারণ চেহারা, তবে চোখ দুটি করুণ ও শান্ত।

অনাথ সগর্জনে বলে, কি হয়েছে কাকা?

—তুই আমার বিচার করবি, কলঙ্ক দিবি, তাতেই আত্মঘাতী হব। হেই মালা, দড়ি দে!

অনাথ ওর গালে প্রচণ্ড চড় মারে।

—আত্মঘাতী হবে যি, সি মারদাঙ্গা করে দড়ি দেয় না হে কাকা। চলো, তুমারে ঝুলিয়ে আমি কাজে যাব।

—আমায় মারলি ?

—মারলাম।

—বনেবাদাড়ে ঘুরতিস, মালা মুড়ি নিয়ে ছুটত, সেই অনাথ আজ আমাকে মারল। এর বিচার হবে না ?

—থামা দাও হে তুমরা।

ধীরেন মণ্ডলের ভাই নগেন মণ্ডল লাঠি ভর করে এসে দাঁড়ায় ও হাত তোলে।

—কত লড়াই করলাম সবাই। চন্নার বিল কোলগত হল। বিলের দখল…কত মরল…কত জেহেলে…তাতে এবার সরকার মেনে লিচ্ছে মন্তিরী এস্থে ঘোষণা দিচ্ছে…বিল…দিল লিয়েই বাঁচতে হবে… জমি পেছ নামামাত্রে, আর গরিবের হাতে সামান্য জমি…সে বাবুদের হাতেই ফিরে যায়।…তা এখন বিলটো মা জননী, তারে বাঁচাব আমরা। রাম চৈকি দাও, মাছ চুরালছ। আমি সমবায় পেসিডেন্। বিচার তোমার হবে। মাপ মাঙছে তবে জাল ফিরৎ। আর অনাথ।

—বলেন কেনে ?

—হটবটকা উরে মারতে পার না তুমি। মাফি চাও।

—বেশ ! রাম কাকা, মাপ করো গো !

—করলাম।

নগেন মাথা নাড়ে।

—এ বিবাদে পুন্নবাবুকে ডাকা করলাছ কেনে ? এখন নিজেরা বিবাদ নিষ্পত্তি করবে।

মালা বলে, দাছু সামনে ছিল।

—বুঝলম। তা অনাথ।

—বলেন, বলেন।

—তোমার বাপ, মা, সব আমার আপনজন। এখন তুমু আমাদের পরধান কর্মী হলছ। কিন্তুক হটচটকা মেজাজ বটে ! সমসারী হতে হবে বাপু। মালা তুমু তুমু করে নিতাইরে সাঙা বসল না। মালার কথাটো খুব উঠি গিছে। তুমু উরে সাঙা কর।

অনাথ তেতে ওঠে।

—আমার কি আর বিহা আছে? উরে রামকাকা যদি দুইশত টাকায় বিচে দেয়···আমি সাঙা করব না হে নগেন জ্যেঠা। আমি উরে বিহা করব।

রাম বলে, করবি? তা আগে করলি না কেনে?

অনাথ খিঁচিয়ে বলে, জেহেলে গেলম বুলে! পুলিশের লাঠি কেড়ে চন্নায় ফেললাম বুলে! তুমু তো রায়দের চাকর হয়্যে আছ, আর দুষ্টু বুদ্ধিতে চল। তুমার মিঞারে ভাত দাও না কেনে? বলো!

—দিব ভাত।

পূর্ণবাবু বলেন, যাক, সকল কথা হয়ে গেল। কাল, একটা মিটিং করে, রোকেয়ার জন্যে শোক-প্রস্তাব করবে, পঞ্চজনে মাপ চাইবে রাম, তবে জাল ফেরত দেবে। আর অনাথ! গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যাবে। না খোঁচালে মেয়েদের স্কীম লোন বেরোবে না। মিটিংয়ে মিঞাপাড়া সহ সকল পাড়াকে বুঝিয়ে দেবে, পুকুরের জলে রান্না যে করবে, সে নলকূপে জল নিতে পারবে না।

রাম বলে, রায়বাবুরা ভাগীরথী থেকে জল আনাত। জলের ঘরই ছিল একটা।

অনাথ বলে, হ্যাঁ, ই লোকটো জমিদারের পরসাদ খেয়েছিল বটে! কি খেঁয়াছিল জমিদার, যে আপুনো ভুলতো পারে না, বাপ রে মানুষ

—শ্বশুর হব···

নগেন বলে, চুপ যাও রাম।

অনাথ বলে, তুমরা মানুষ বট্যে। মজিদের ঘরের সামনে একবার যেতে হয়, দুটা কথা বুলতে হয়, দুটা কারো চেতবেচেত নাই।

হরেনবাবু দেখেন, মালা ঘরের খুঁটি ধরে অনাথের দিকে পরম বিস্ময়ে চেয়ে আছে।

ঘরে ফেরার সময়ে পূর্ণবাবু বলেন, ছিল বুনো, বাঘের বাচ্চা যেমন হয়। কোথায় খেত, কি করত। তা আমাকে বলত, তু বুঢ়ার কাছে

যাব নাই। তু বাবু, বাবুজাতে আমার বিশ্বাস নাই। ভাল করব, ঘর হবে তুদের, ইস্কুল হবে, কত বাবুরা আমাদের নাম করে টাকা লিছে, আর মেরে পলালছে। তা ওকে বাগ মানাতে···আজ ভালই হল, কি বলো ?

—ধারণাতীত। ওরা নিজেরা কতটা আত্মবিশ্বাস পেযেছে বলে এভাবে সমস্যার সমাধান···

—রাম বছরে ছ'বার গলায় দড়ি দেয়। রাম কোনো সমস্যা নয়। তবে বললাম তো, একটা দীর্ঘ প্রতিবাদ, কখনো বিদ্রোহ, আটষট্টি বছর ধরে অফ্ অ্যাণ্ড অন্ চলছিল। টাইমগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। আমি এলাম আটাত্তরে, ব্যাপক সন্ত্রাস চলছে, পঁচাত্তরেও চলেছে। অথচ আশ্চর্য, ব্যাপারটা গুরুত্ব পায় নি গবেষকদের কাছে। বেসিক ফ্যাক্টগুলো আমি লিখে রাখলাম, পরে যদি কেউ কাজ করে। যতদূর উদ্ধার করা গেছে, কোন সময়ে কে নিহত, জেলে বন্দী, তালিকা দিয়েছি।

মজিদের বাড়িতে গোসল সমাপনান্তে রোকেয়া নতুন কাপড় পরে শয়ান। কাফনের পাঁচ টুকরো সাদা কাপড় অপেক্ষমান। পূর্ণবাবু তাকাতে পারেন না। মজিদের হাত মুঠোতে ধরে কিছুক্ষণ রেখে ছেড়ে দেন। রোকেয়ার মা ও বোন আছাড়িপিছাড়ি কাঁদে। ছবি ও বেবির কান্না ভেজা চোখে বিস্ময়। মাকে নিয়ে এত আয়োজন তো তারা দেখেনি।

ফিরতে ফিরতে পূর্ণবাবু বলেন, ভুলে যাবে, শিশুরা ভুলে যাবে ক্রমে। সামান্য মনে থাকবে ছবির। স্মৃতির সঙ্গে বিস্মৃতিও আছে, এটা সান্ত্বনা।

হরেনবাবু বলেন, এদিক থেকে দেওঘর যাওয়ার একটা পথ আছে না ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাঁইথিয়া হয়ে···যেও, যেও। আজ থাকো। কাল অনাথ তোমায় তুলে দেবে।

বউদি চা ও চিঁড়েভাজা আনেন।

—অবেলা হয়ে গেল।

—কিসের অবেলা! শুনুন, অনাথ কথা দিয়েছে, মালাকে বিয়ে করবে। এটা সত্বর করতে হবে।

—করাই উচিত। মালার মতো ভালো মেয়ে হয় না।

মন্দিরা বলে, ভালো রানী, মণিও। বাপ যে দুর্ধর্ষ।

—না, তাকে ম্যানেজ করা গেছে।

—পাঁচুবাবু সাইকেলে চেপে মাছ দিয়ে গেল।

—কেন যে এসব করে!

হরেনবাবু বলেন, সেই ত্রিবেদীদের খবর কি?

—ওরা সদরে চলে গেছে। বাড়ি বিক্রি হচ্ছে না শরিকী বিবাদে। জমি অবশ্য আছে। চাঁদবাবু একটা দেখার মতো লাইব্রেরী করেছিল। সেটা যদি গ্রামকে দান করে তো ভালো হয়। হরেন তো কালকেই যেতে চায়।

বউদি ও মন্দিরা বলেন, তা কি হয়?

অনাথ এসে পড়ে।

—যাবেন কুথা? আমার সবুর-তবুর নাই। বিহা করব বুলেছি তো দশদিন বাদেই লগ্ন আছে।

—শুভলগ্নও চাই?

—আমি চাই না, মালা চায়।

—দশদিন আমি থাকতে পারব না অনাথ।

—তা'লে পরে আসবেন, থাকবেন।

পূর্ণবাবু বলেন, ওর কাজ আছে। কাজের মানুষ কাজ ফেলে থাকতে পারে না।

—তাও বটে। দাদু, আমি ব্যাঙ্কে যেছি। মজিদরা এখন বারাবে। মিটিন কাল, না আজ?

—কাল। আজ হয় কেমন করে?

—তাও তো বটে।

অনাথ বেরিয়ে যায়।

—কাজের ছেলে।

—বন্য এনার্জি। সেদিন ঝড়ে উপড়ানো বাবলা গাছটা একা কেটে টুকরো করল। ও কি বলে জান?

—কি?

—বিলের জলে মাছ যেমন, ঝিনুকে মুক্তার চাষও করব। কলকাতায় হতে পারে, এখানে হবে না?

—সত্যি তাই করবে?

—ওই জানে।

মন্দিরা বলে, মালাকে বলেছিল, নিরক্ষর মেয়েকে বিয়ে করব? তুই লেখাপড়া শেখ। রাম তো দিত না। এখন যদি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পড়তে শেখে…

পূর্ণবাবু বলেন, ওদের বোঝাপড়া ছিলই একটা?

—ছিল, ছিল।

—দেখ! আমি কিছুই বুঝি নি।

মন্দিরা সস্নেহে বলে, তোমার বোঝার কথা? দাও, জামা খুলে দাও। নিজে কি কাচো, পরিষ্কার হয় না।

ঠিক যেন সুবালার কথা। সুবালা হলে বলত, আমার দেহ কি পড়ে গেচে ঝে তুমি কাচবে? খুলে দাও জামা, গামচা সোডা কেচে রেখেচি।

বাড়ির জন্যে, সুবালার জন্যে, সন্ধ্যার পাঠশালার জন্যে বড় মন কেমন করে হরেনবাবুর।

কিন্তু মধুকরের কাছে তো যেতে হবে।

গিয়ে কি বলবেন?

আমি সামান্যই দেখেছি। বাস্তব রূপ, আমার মতে, সম্পূর্ণ নেতিবাচক নয়, কেননা সমান্তরালভাবে অন্তত কিছু লোক স্বাধীনতা শব্দটাকে ইতিবাচক রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। ক্যানিংয়ে সীতেশকে দেখেছি, আবার নজরুলের কথা জেনেছি, তোতনকে দেখেছি। রামদিয়াতে দেখলাম পূর্ণদের।

স্বাধীনতার ফলে মাটির মানুষ মার খেয়েছে যেসব কারণে, তার মূলে আছে ভোট সর্বস্ব হৃদয়হীন রাজনীতি। এই রাজনীতি তৈরি করেছে সীতেশদের। দেখে এলাম ভূমিহীনকে জমি দিলেও সে রাখতে পারবে না। দারিদ্রমোচন শব্দটাতে এক বিশাল ভাঁওতা। দারিদ্র্য দেখালেই তো টাকা আনা যায়, রাজনীতিক ক্ষমতায় স্বৈরাচারী হওয়া যায়, টাকা লুঠ করা যায়। রামপ্রসাদের গানের মতো আজও কয়েকজন দুধ-বাতাসা খায়, অধিকাংশের অন্ন জোটে না।

এ সবই সত্যি। কিন্তু তা বলে দোষারোপ করে নিরাপদ দূরত্বে বসে থাকবার অধিকার আমাদের নেই। দেশে নেই সুস্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ফলে সমাজদেহে বিষ বেরিয়ে গেছে।

আমরা, যারা বয়সে বৃদ্ধ, যাদের কোনো রাজনীতিক ধান্দা নেই, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা আছে, তারাও নিজের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব, দেশের জন্যে করতে পারে।

করে কি লাভ?

লাভ আছে, লাভ আছে মধুকর। অন্তত নিজের কাছে নিজে বলা যাবে, যতটুকু সাধ্য, তা দেরিতে হলেও করতে চেষ্টাটা করেছি।

পূর্ণ বলে, হিসাব করো কেন? ছিটাও, বীজ ছিটাও। সবই কি বালিতে পড়বে? কিছু মাটিতে পড়বে। কিছু গাছ হবে। সে গাছের ছায়ায় তুমি না বসো, অন্য কেউ বসবে।

এসব কথা ভুলে আছে যে প্রজন্ম, তাদেরকেও দেখে এসেছি কলকাতায়।

কিন্তু নিরানব্বইটা নেতিবাচক দৃষ্টান্তের চেয়ে একটা ইতিবাচক দৃষ্টান্ত আমাকে আশাবাদী করে রাখে।

চলো, আমার সঙ্গে চলো আমার সন্ধ্যার পাঠশালায়। কিছু লোককে সাক্ষর করো। দেশ আমাদের অনেক দিয়েছে। আমরা কি কিছুই দেব না?

পরদিন অনাথ ওঁকে বাসে তুলে দিয়েছিল।

ছয়

ঘোঘরা ছেড়ে যাবার ঠিক একমাস এগারোদিন বাদে, সন্ধ্যার ট্রেনে হরেনবাবু আর মধুকর বর্মন ঘোঘরা স্টেশনে নামলেন।

"নবনলিনী" বাড়িটা বলল, এলে?

সুবালা বলল, এলে?

—এলাম সুবালা।

—ইনি?

—আমার পুরনো বন্ধু। ইনি পাঠশালা চালাবে, আমি তো আছিই। আর রবিবারটা ইংরিজি পড়াব। ইংরিজিটা না পড়ালে আমাদের ছেলে-মেয়েরা পাশই করবে না।

—মন বলচে এসে পড়বে। দেক, বেলাকবোডে কালি দিয়েচে আলোক। আর রণজিতবাবুর কতায় নন্দবাবু তুলো হ্যাচাক, শতরঞ্চি দিয়ে গেচে, আর সন্ধেবেলা কেলাস নেবে কখন, তা ঝানতে সবাই আসতেচে, আর গোকলো ছোঁড়া দুশো টাকা পাটিয়েচে, চিঠি দিয়েচে, লিকেচে তুমি আর দাদু দুধ ওষুদ খেও।

দুটি নোট নিয়ে আসে সুবালা। বলে, ধরো।

—এ তুমি রাখো।

—-র‍্যালা কোর না মামা। আমার কোনো অভাব রেকোচো ঝে আমি নোব? কাজঝামালি বাড়াবে তো টাকা নাগবে নে? রাকো। আমি দিতে পারি না?

মধুকর বর্মন হেসে ফেলেন।

হরেনবাবু বলেন, তা হাত মুখ ধোব না? চা-চা করে প্রাণটা…

সুবালা বলে, জল দিচ্চি, চা দিচ্চি, মুড়ি করে দিচ্চি, ওঃ, বুকটা যেমন পাতরচাপা হয়েছিল। কেমন বেড়ালে গো মামা?

—খুব। পরে শুনো।

মধুকর বর্মন ব্যাগ নামিয়ে রাখেন ব্ল্যাকবোর্ডে মস্ত "অ" লেখা।

সুবালা বলে, আলোকই লিকে লিকে পড়াচ্চে, বলে, বন্দ থাকবে?

হরেনবাবুর বুকটা যেন ভরে ওঠে।

মধুকর বর্মন বলেন, হরেন ! ইংরিজিটাও আমি পড়াব, কি বলো।

—নিশ্চয় নিশ্চয়, এতে আর কথা কি ?

আলোক রিকসা নিয়ে এসে পড়ে।

—সন্ধেবেলা ঘরে আলো, এসেই কি পাটশালা খুলোচো ?

হরেনবাবু বলেন, হ্যাঁ রে। আজ ইনি একলা ছাত্র। কাল থেকে সব আগের মতো চলবে।

আলোক ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম করে।

—তুমি নেই, তো কি ঝানো নেই। ঝাই, সগলারে বলে আসি। এত্‌গুলো রুগী, সন্দেয় পাটশালা, না বাবু, তুমি আর ঝেওনি কোতাও। ঘোঘরার মতো জায়গা আচে তিভুবনে ?

—নেই রে আলোক, তবে তা জানতেও তো বেরোতে হয়। ঘুরে ঘুরে এলাম, আর যাচ্ছি না।

সুবালা বলে, তা হচ্চে না। তুলসীডাঙা নে' ঝাবে ওরা। খুব হাঁটতেচে। হোতা ওরা হোমোপাতি ডাক্তারখানা খুলেচে, ডাক্তার এনেচে, সন্তান পেসবের আসপাতাল খুলবে, তুমি নাকি বলেচিলে, একন তোমাকে চাই।

যাবেন, তুলসীডাঙা যাবেন হরেনবাবু। সন্ধ্যার পাঠশালার কর্মসূচীতে কোনো বাঁধাবাঁধি নেই। সব করে ফেলবেন একে একে।

—কি মধুকর, কেমন বোঝ ?

—হরেন···

—দুটো হ্যাজাক, শতরঞ্জি···সন্ধ্যার পাঠশালা আরেকটা, এবার পদোপাড়ায়···

সুবালা চা-খাবার আনে। হবে, হবে সব। একন সুস্থ হও খানিক।

—আমি সুস্থই আছি।

সন্ধ্যার পাঠশালায় ফিরতে পেরেই আত্মস্থ, সুস্থ লাগছে হরেনবাবুর। তিনি বলেন, সুবালার চায়ে কি আছে, মনে হচ্ছে বয়স কমে গেছে ?

সুবালা বলে, নিজের জায়গায় ফিরোচো ঝে !

এতবড় সত্যি কথা হরেনবাবু কখনো শোনেন নি।

প্রথম পাঠ

"মাননীয় মহাশয়, শালবাড পরগনা সরেন স্মৃতি বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীধনঞ্জয় মাহাতো এই আবেদন রাখিতেছে। বলিতে কি, আমিই ধনঞ্জয় মাহাতো। বড় হতাশায় আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। আপনি একদা আমার সহপাঠী ছিলেন। লোধাডি প্রাথমিক স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়িতাম। লোধাডি নামটি লোধ জাতির মানুষের বসবাস কারণে হয়, কেন না তৎস্থানে লোধাদের বসবাস ছিল। হতভাগা লোধারা জানিত না যে রাজা তাহাদের বসত করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু বসবাস করিলেই জমিতে স্বত্ব জন্মে না।

বস্তুত ওই স্থানে এখন সাঁওতাল, লোধা, ভূমিজ, কোড়া কারোই বসবাস নাই। উহারা জানিত না ঝোপজঙ্গল কাটিয়া ডাঙ্গা জমি সমান করিয়া আবাদী করিলেও স্বত্ব জন্মে না। স্বাধীনতার পরেই মধ্যস্বত্বভোগী [illegible] মহাশয় উহাদের উচ্ছেদ করিতে পারিতেন।

কেননা [illegible]দের দখলী স্বত্ব প্রমাণের কোনও কাগজ ছিল না। যেমন কাগজ পড়িবার পড়িতে অক্ষম, তেমন কাগজই যে সর্বশক্তিমান, কাগজ বানানো যায়, তাহাতে সরকারি মোহর ছাপ লাগানো যায়, ইহা গোবিন্দ বাবুরা জানিতেন। উহারা জানিত না। আমরা তিন ঘর মাহাতো ছিলাম। আমাদের কর্তারাও নিরক্ষর ছিলেন। কাগজের মাহাত্ম্য জানিতাম না।

ভেকু সরেনকে আপনার মনে থাকিবে। গাছ হইতে পড়িয়া আপনার পা ভাঙে। তখন ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে আনা দুষ্কর কার্য

ছিল। বিশ মাইল পথ বলিতে অপথ। বাহন গরুর গাড়ি। বাঘের গন্ধে গরু চমকাইত ও বি-পথে গাড়ি লইত। ভেকু সরেন ছিল সাঁওতাল কবিরাজ। সে হাড়ভাঙা লতার ঔষধ প্রয়োগে আপনার পা জুড়িয়া দেয়।

গোবিন্দ মহাপাত্র তো আপনারই পিতামহ। তিনি ভেকুকে একটি গাভী ও একজোড়া বস্ত্র দান করেন। ভেকুর ঔষধে আমার পেটের ক্রিমিও পড়িয়া যায়। মোট কথা ভেকু সরেন ছিলেন সকলের একটা ভরসা। তাঁহার ঘর মেটে দোতলা ছিল। তাঁহার বাগান ও জমি ছিল। মুরগি, শূকর, গরু, সবই ছিল। কাঠের গেলাসে জল খাওয়াইয়া তিনি আপনার পিতামহের মধুমেহ রোগ আরোগ্য করেন। তাঁহাকে "তুই মহ" বলা চলিত না। যদিও সকলেরে তিনি "তুই" বলিতেন। খেরোয়াল জাতিরা "তুই" বিনা বলিত না। তুই তুমি আপনি, তিনটি সম্বোধনে সর্বাপেক্ষা আপন হয় "তুই"।

ভেকু জানিতেন, আতকার বা কুমারিকা মূল সেবনে যৌনব্যাধি আরোগ্য হয়, (বাবুরা গোপনে কেহ কেহ সেবন করিতেন), আরবারি বা ঘেঁটু চর্মরোগ। ক্রিমি ও ম্যালেরিয়া নাশক, কাদামেট বা ভুঁই-জাম হাঁপানি ও বাতে উপকারী, এতকেক বা বাজবারণ বাত, দাঁত ব্যথা, পোকা পড়া ঘা আরোগ্য করে।

এভাবে তিনি বনৌষধির মূল, পাতা, ছাল, সবার খবর দীর্ঘ সাধনায় জানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা জ্ঞানী মানী বলিয়া সম্মান করিতাম।

কিন্তু কাগজ তো এই যুগান্তসঞ্চিত জ্ঞান হইতেও পরাক্রমী। ভেকু জানিতেন না কাগজ কত পরাক্রমী। এই প্রয়োজনায় জ্ঞান ছিল না বলিয়া তিনিও উচ্ছেদ হইলেন। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক গণপতি দলুই আমাদের কাগজের মর্ম শিখাইয়াছিলেন।

অতএব আমরা শালবাড়ি গ্রামে আসিয়া বসত করিলাম।

লেধাডি গ্রামে শিক্ষারম্ভের পর আমার পড়া আর আগাইত না। কিন্তু ভেকু সরেন বলিলেন, লিখাপড়া জানি নাই, কাগজের মর্ম বুঝি নাই, তাহাতেই আমরা উচ্ছেদ হইলাম। এখন তোরা লিখাপড়া শিখ, গ্রাম হইতে কয়েকটা ছেলে বিড়াগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে যা।

অতঃপর তিনি, আমি জ্ঞানী নয় হে, অবোধ নির্বোধ বলিয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে থাকিলেন।

চন্দ্র সিং ভূমিজ তাঁহারে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, কাকা! তুই করমবাঁধনা-সারহুলের কি ও কেন জানিস। বনৌষধির গোপন রহস্য জানিস। খেরোয়াল জাতিরা রাম রাজাকে রাবণ নিধন কালে কত সাহায্য করিয়াছিল তাহা জানিস। আমাদের চক্ষে তুই মহাজ্ঞানী।

তিনি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, সে সকল জ্ঞানের মূল্য নাই। সরকারি সেরেস্তার এক খণ্ড কাগজ আমার জ্ঞানকে ঢেকে রাখে। দেখ জমিদারি প্রথা উঠিয়া যাইতেছে, শুনিয়াছি। এখন চল্ রাজার কাছারি হইতে আমরা রায়তী প্রজার কাগজ আনি। আনিলেও কি জমিভূমি রক্ষা করা যাইবে? বাবুদের পেঁচপয়জার আমরা বুঝিব না। তাই লিখাপড়া জানা খুব আবশ্যক। গণপতি দলুই আমাদের ঘরে ঘরে আসিয়া "ছেলে দে পড়া শিখাই" বলিত। তাহাকে নিমন্ত্রণ কর্। বলিবি নূতন গ্রাম পত্তন করিয়াছি। সেই আনন্দে ভোজ দিব। গণপতি দলুই আসিলেন। তিনি বলিলেন, ভেকু সরেনের কথা যথার্থ। রাজার সেরেস্তা হইতে রায়তী স্বত্ব লও, আর বিড়াগ্রামে যাইয়া কিছু ছেলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হও। নির্বাচনের পর জল কত ঘোলা হইবে কে বলিতে পারে?

মাননীয়! লোধাডি গ্রাম এখন নূতন নাম গোবিন্দপুর লইয়া জাতে উঠিয়াছে। আপনার পিতামহ তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিত, অতঃপর আপনার পিতা, এখন আপনি। সেটেলমেন্ট রেকর্ডে "লোধাডি" নামটি মিলে। আর, আপনার দূরদর্শী পিতামহ ক্রমে

লোধাড়িতে স্বজাতি, অন্য জাতি বসত করাইলেন। উচ্চ বিদ্যালয় হইল। আট শয্যার হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, কি নাই আজ গোবিন্দপুরে?

তা প্রাথমিক স্কুলের পর আপনি গেলেন ঝাড়গ্রামে পড়িতে। আমরা কয়জন, দুই মাহাতো, তিন সাঁওতাল, দুই ভূমিজ, এক কোড়া। একুনে আটটি বালক যাইলাম বিড়াগ্রাম স্কুলে। রাস্তা ছিল না। যে পথে ভটাভট বাস ছুটে, যে পথে আপনি অন্য সায়াহ্নে যাইবেন, সে স্থানে তখন রুক্ষ জমি, কিছু ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে বুনো জামের বন।

বর্ষায় জাম খাইয়া ক্ষুধা মারিয়াছি। ধানক্ষেতে বহমান রাঙা জলে তৃষ্ণা মিটাইয়াছি। স্কুলে ঢুকিলাম আটজন। পড়া ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে পাঁচজন গরু বাগালী। ক্ষেতের কাজ, কাষ্ঠ আহরণ, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পেশায় নিযুক্ত হয়। আমরা তিনজন বড় কষ্টে তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম।

এই সার্টিফিকেট আমাদের নিজস্ব অর্জিত কাগজ হইল। ইতি-মধ্যে আমরা তো রাজার সেরেস্তায় রায়তী স্বত্বের কগজ পাইয়াছি। কাগজগুলি সুরক্ষা করি কিভাবে তাহা বড় সমস্যা হয়। অতঃপর চন্দ্র সিং ভূমিজ একদিন বলিলেন, চাঁদা উঠাও। টাউনে যাইয়া হোসিয়ারি দোকান, ঔষধ দাওয়াখানা, জুতোর দোকান, সকল স্থানে পিচবোর্ডের বাক্স খরিদ করে। মহামান্য! তখনও বাজারে প্লাস্টিক-পালিথিন আসে নাই। ভেকু সরেনকে আপনার স্বল্প পিতামহ দ্বারা উপহার প্রদত্ত একটি বিজ্ঞান বেটারি ব্যতীত গ্রামে দ্বিতীয় টচবাতি ছিল না।

এই টচবাতির ইতিহাসও সুবিধার নহে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ দরকারে ব্যবহার করা হইবে বলিয়া টচবাতিটি নেকড়ায় মোড়াইয়া খড়ের চালে গুঁজিয়া রাখা হইত। যেদিন সত্যই দরকার হইল, অর্থাৎ ভেকু সরেনকে রাতে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে-লইতে হইল, সেদিন দেখা গেল যে টচবাতির বেটারি গলিয়া বাতিটি নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। গরুর গাড়িতে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া আগে পিছে লণ্ঠন লইয়া আমরা সেই রাতে গিয়াছিলাম। পথও ফুরায় না, রাতও ফুরায় না, ভেকু সরেন শুধু বলেন, লদা! লদা!

না, তিনি চামটু লোধার নাম বলেন নাই। বিড়বিড় করিয়া বলিতেছিলেন, সেংগেলদা! সেংগেলদা!

শব্দটি তাঁহার প্রলাপ ছিল না। বনজঙ্গল কাটা পড়িতেছিল। সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করিবে, বনভূমি দখলে লইবে, এমন বিবেচনায় ভূস্বামীগণ বন কাটিয়া জমি বেচিতে ছিল। শালবাড়ির নিকটেই ওষুধপালার গাছ মিলিত। প্রকৃতিজ্ঞ বনের ছায়ায় লতা-ঝাঁটিবন-ছোট গাছপালা বাড়ে। ভেকু সরেন বলিতেছিলেন, সকল বিনাশে দিতেছে, একদিন আকাশ হইতে সেংগেলদা বা অগ্নিবৃষ্টি হইবে সব জ্বলিয়া যাইবে।

বনভূমির বিনাশ দেখিয়াই, জ্ঞানী মনুষ তিনি, বলিলেন, সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। তোমরা সজাগ হও।

ভেকু সরেন পুরাতন উদরাময় রোগে মারা যান। যত কাল বঙ্গট-তলা বা সালেমমিশি লভ্য ছিল, ততদিন রোগ দাবে রাখিয়া তিনি লাঙ্গলের ও কোদালের বাট বানাইতেন, নিমবীজ পাঁড়িতেন। ঔষধ অলভ্য হইল তো মন ভাঙিয়া গেল। চামটু লোধা, অর্থাৎ চামটু মল্লিক, দূরদূরান্ত বন হইতে ওষধি আনিয়া দিত। কিন্তু ক্রমেই শাল গাছগুলি কাটা পড়ে, বিক্রয় হয়, সেও আর পারিত না। বনমৃত্তিকার সরসতা নাই। ওষধি জন্মাইবে কেমনে?

ভেকু সরেনকে আমরা হাসপাতালে লইতে সক্ষম হই। যে রাতে যাইতেছিলাম, ভেকু সরেনের ছোটকি বা কনিষ্ঠা বধূ পরমি সরেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে ধরিয়া পিতার নিকট বসাইয়া লণ্ঠন হাতে চলিতেছিলেন। জেদ ধরিয়া তিনি আসেন, কথা বলিতেন কম, বলিষ্ঠ ও উন্নত দেহ রমণী। তাঁহার মুখ ছিল প্রস্তর সদৃশ। যেন কোনও বন-দেবী চলিতেছেন। কিন্তু মানবদের ভরসা বা অভরসা দিতেছেন না।

ভেকু সরেনের প্রথমা স্ত্রী সুমি বিবাহের কিছু পরেই ঝড়ে গাছ-চাপা পড়িয়া মারা যান। আমরা তাঁহাকে দেখি নাই। মেজকি, এবং তাঁহার কন্যাকে দেখিয়াছি। মেজকি সবল ও কর্মঠ ছিলেন না। সে কারণে মেজকি তাঁহার খুড়াতো ভগ্নী পরমির সহিত স্বামীর বিবাহ দেন। পরমির দুই পুত্র ভটকা ও সাওনা। পুত্ররা দুই মাতাকেই ভক্তি করিত। ভেকুর মৃত্যুর পর মেজকির মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যা রানী বর্তমানে পাথরডুবা গ্রামে বিবাহিতা এবং তাঁহার স্বামী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আছেন। আপনি তাহারে জানিবেন। আমি ধর্মরাজ কিসকু রাপাজের কথা বলিতেছি। সে আপনাদের কেণ্ডিডেটকে পরাজিত করিয়াছে।

উচবাতির কথা বলিতে কত না কথা বলিলাম। এই আবেদন তো দীর্ঘ হইবেই। বয়স কোন্ না পঞ্চান্ন হইল। আমি আশুতোষ দলুইয়ের সঙ্গ করি ও তৎরচিত গীত গাহিয়া থাকি। "অরণ্যবার্তা" ও 'মৈনাক" পত্রিকায় নিজস্ব সংবাদদাতা। বলিতে কি, গ্রাম তরফে লিখালিখি আমিই করি।

হাসপাতালে আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভেকু সরেনের মৃত্যু হইল। পরমি সরেন নির্বাক। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিলেন। অবশেষে তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, আমাকে, রানীর মাকে "সুমি সুমি" বলিতেছিল। তোরাও জানিতিস। তবে এখানে লইলি কেন? তাহার তো স্বগৃহে মরিবার কথা।

আমি কাঁদিতেছিলাম। কাকা না বলিলে আমি, জয়ধর মাহাতো এবং লক্ষ্মণ টুডু তো প্রবেশিকা পাস করিতাম না। কাকা আত্যন্তিক উদ্বেগে আমাদের না খুঁচাইলে লক্ষ্মণ তো পাথরডুবা গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষক হইত না, জয়ধর যাইয়া জরিপ বিভাগে চাকুরি করিত না।

আবার বলি, যে সকল ছেলেরা সেভেনে, সিক্সে, এইটে কাজ ছাড়িয়া দিল, তাহারাও আজ চকুরিরত। কিভাবে এ অত্যাশ্চর্য কাজ সম্ভব হইল?

তাহা হইলে পরমি সোরেন বিদ্যালয়ের কথা বলিতে হয়। কিন্তু তাহা পরে বলিব।

কিছু আগের কথা বলি। শালবাড়িতে তখন প্রাথমিক স্কুল ছিল না। পরে হইয়াছে। তা আমি, জয়ধর ও লক্ষ্মণ যখন প্রবেশিকা পাস করি, স্কুলে হেডমাষ্টার বলিলেন, নিজেরা শিখিলে তো অপররে শিখাও। বড় আনন্দে পাথরশোলের মহেন্দ্র মুর্মুকে দেখাইলেন। সে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে। কয়েক বৎসরের মধ্যে মহেন্দ্র একমাত্র আদিবাসী ছাত্র, যে যাইয়া ঝাড়গ্রাম কলেজে পড়িবে এমন কথা আমরা স্বপ্নে ভাবি নাই। এই মহেন্দ্র ও গণপতি দলুই হইতে শালবাড়ি গ্রাম উপকার পাইয়াছে।

যাহা হউক, যতদিনে আমরা প্রবেশিকা পাস করিলাম, ফল বাহির হইবার কিছু পরেই ভেকু সরেন দেহরক্ষা করিলেন। চন্দ্র সিং ভূমিজ বলিলেন, এই তিনটি ছেলেরে লইয়া ফাংশান করিতে হয়।

ফাংশান হইল। গণপতি দলুই সভাপতি এবং চন্দ্রবাবু সহ সভাপতি। গ্রামদেবতা অর্জুন, শাল, একেক জনেদের একেকটি। বট ও অশ্বত্থ গাছ দুটি একসঙ্গে জড়াইয়া বড় হইয়াছে। নিচে মাটির বেদীর ঘের। সেখানেই ফাংশান হইল। পরমি সরেন আমাদের গাঁদা ফুলের মালা দিলেন। বলিলেন, সাওনার পিতা না খুঁচাইলে তোরা পড়িতিস না।

সেই সভায় গণপতি দলুই বলিলেন, লিখাপড়া শিখ, চাকরি চেষ্টা কর। জমি আছে, চাষ হয়, ভাবিতেছ এভাবে জীবন চলিবে। এভাবে জীবন চলিবে না। বিবাহ হইবে, সন্তান হইবে, ভাগ হইতে হইতে জমি ধূলা হইয়া যাইবে। তেমন দিন আসিতেছে।

তাঁহার নির্দেশে আমি মহেন্দ্রের পিতাকে পত্র দেই। তিনি দেশমাঝি, লিখাপড়া জানেন, বাবুদের সঙ্গে সমান তেজে চলেন।

আমি তাঁহার নিকট, গণপতিবাবুর নিকট বারবার দৌড়িতাম। এভাবেই সংবাদ পাই যে ননমেট্রিক রামলাল সিং ভূমিজ, সেভেন

পাস বুধন বেসরা, ননী সিং ভূমিজ, সিক্স পাস ভরত সমর (কোড়া) এবং মতি বেসরা ঝাড়গ্রামে ও মেদিনীপুরে খবর লইয়া বিভিন্ন সরকারি বিভাগে চাকরি পাইতে পারে।

উহারা ক্রমে ক্রমে রেলবিভাগে কাজ পায়। রামলাল ভাল ফুটবল খেলিত, তাহাও বিবেচিত হয়।

আমার কথা বলি। পিতার এক সন্তান। জমি ভূমি পনেরো বিঘা ছয় ছটাক। বাড়িতে গাইগরু আছে। আমাকে কীট দংশন করিল। পিতার শত তর্জন সত্ত্বেও আমি চাকুরি খুঁজিলাম না।

এক গ্রামে সাত চাকুরিয়া। ইহা দিনকালের জন্যও সম্ভব হইয়াছিল। আজ হইলে...ঝাড়গ্রাম একচেঞ্জে কত আদিবাসী নাম লিখানো আছে। কোটা পূরণ হয় না, তাহারাও কাজ পায় না।

পরমি কাকীর সবাস্থ এক বিঘা জমি ছিল। চাষযোগ্য তেরো বিঘা জমি ছিল। বলিতে কি, তাহার সংসারে অভাব ছিল না।

কাকী বলিল, চাকুরি পাইল বটে, গ্রাম ছেলেগুলাকে হারাইল। তাহারা গ্রামের কথা ভবিবে না। আমি ভাবিলাম এ তো সত্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্রই দেড় মাইক দূরে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা তো যায় না। মারিলে ধরিলে যায় অবার স্কুল পালায়। বিশেষ করিয়া লোধারা তো যায় না। তাহারা জমি চষে, বনে যায়, শিকার করে, বনজ ফলমূল মধু ধুনা পাতা আনে, এই লইয়াই আছে।

আমার মনে হইল, গ্রামে একটি স্কুল হইলে হইত। ভাবিতে ভাবিতে সময় যায়। ভটকার বিবাহ হইল, সাওনার বিবাহ হইল। আমিও বিবাহ করিলাম।

ভটকা তাহার ভাগের জমিটি শ্রীচন্দ্র সিংহে বেচিয়া দিয়া শ্বশুর-বাড়ির গ্রাম ঘাটশিলা মহকুমায় উঠিয়া গেল। গাছতলায় গ্রামসভা বসিল। হিসাব, সাওনার চার বিঘা, তাহার মায়ের তিন বিঘা, ভটকার চার বিঘা।

পরমি কাকী, সাওনা ও তাহার বধূ চাঁপা তিনজনে খাটিতে থাকিল। তারপর…"

ধনঞ্জয় মাহাতো কলম বন্ধ করেন। তারপর যে কি, তা তো ভাবতে হবে। তারপর যা হল, তাতেই তো শালবাড়ি গ্রামের নাম সবাই জেনে গেল।

দেয়ালে অজয়ের ছবিটা কি সহাস্য।

লিখবেন, আরও লিখবেন? তাঁকে কি ভূতে ধরেছে যে তিনি লিখেই চলছেন পাতার পর পাতা?

এমন সময়ে তাঁর স্ত্রী ঢোকেন।

—কুকড়াডাকা বিহান থেকে কি লিখছ?

—স্কুলের আবেদনটা গো!

—তোতাবাবুকে দেবে?

—হ্যাঁ, হাতে ধরিয়ে দেব।

—আর না, এ স্কুল তুমি ছেড়ে দাও!

— কতদিনের চেষ্টা…

—আর কি হবে?

—চেষ্টা ছাড়া যায় না মলয়ের মা।

মলয়ের মা শুকনো গলায় বলেন, মলয় মায়ের মন বোঝে। চাকরি করছে, বউ ছেলে নিয়ে যাবে। সে বলে এই স্কুলের জন্যে বাবা জীবনটা দিল। লাভ হল কিছু?

ধনঞ্জয় আস্তে বলেন, হয়েছে। মলয় বুঝে না।

—কেমন লাভ?

—খাতায় তো হিসাব তুলি নাই। কেমন করে বোঝাব?

—দিনটাও ভুলে আছ!

—না, দিনটা কি ভুলি?

মলয়ের মা দেয়ালের দিকে তাকায়। সবিস্ময়ে বলে, আঠারো বৎসর কেটে গেল? মরল আঠারো বৎসরে। কেটে গেল আঠারো

বৎসর....পূর্ণিমার তখন দশ বছর বয়স। আজ দেখ মলয়ের বউ আছে, ছেলে মেয়ে আছে, পূর্ণিমার দুটো মেয়ে, ভরা ভর্তি সংসার। সে থাকলে...

তারপর সম্পূর্ণ অন্য গলায় বলে, তোতাবাবু গাড়ি থামা করাবে, তোমার চিঠি নিবে, এসব হয় না। কত বার তো গেলে। কথা শুনল কিছু?

ধনঞ্জয়ের মনে হয়, শুনবে বা কেন? তোতাবাবুর চোখে তিনি বোধহয় এখনও সন্দেহভাজন। না, এত বড় চিঠি দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু সব কথা তোতাবাবুর একবার জানা দরকার।

কেন তিনি, ধনঞ্জয় মাহাতো, প্রবেশিকা পাস করলেন, বিয়েও হয়ে গেল, বিয়ের পরের বছরই অজয় জন্মাল। উনিশ বছরে তিনি পিতা, ষোল বচরে মমতা জননী। দু'বছর কাটল মলয়ের পর। তারপর জন্মাল পূর্ণিমা।

কেন তিনি, ধনঞ্জয় মাহাতো, চাকরি খুঁজলেন না, চাষবাস নিয়ে থাকলেন। আশুতোষ দলুইয়ের কবিতা ও গান নিয়ে মেতে থাকলেন। গণপতি দলুইয়ের জ্ঞাতি ভাই আশুতোষ দলুই। এখন অনেক সম্মান পাচ্ছে। কিন্তু ধনঞ্জয়রা এই গ্রামে তাঁকে প্রথম সংবর্ধনা দেন।

কেন ধনঞ্জয় উন্নতি করতে, অন্য রকম জীবন গড়ে নিতে চেষ্টা করল না। সে বিষয়ে কি ভাব তোতাবাবু? ভাব কি, আমি মরে বেঁচেছিলাম? না তোতাবাবু। ডাহিপাড়া গ্রামে পড়াতে যেতাম।

ওই যে গণপতিবাবু বলত, একটা করে ছেলে যদি নিজের কথা কম ভেবে গ্রামের কথা ভাবে, তাহলেও গ্রামের কিছু হবে।

সে ছিল কংগ্রেস ভাবে ভাবিত। দেশে ছিল কংগ্রেস সরকার। কিন্তু সে সরকার তো গ্রামের কথা ভাবত না। সরকার ভাবত না, তোমার পিতামহ গোবিন্দ মহাপাত্র, কংগ্রেস নেতা তাকে পাত্তা দিত না, কিন্তু সে নিজের উপর অশেষ বিশ্বাসে আমাদের শোনাত

গান্ধী মহারাজের কথা, বীরেন শাসমলের কথা, ক্ষুদিরামের কথা। বলত, স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উঠাবি।

গণপতিবাবুরা তো বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জমিজমা সকলই হারায়। আশুতোষবাবুও সেই হতে গরিব।

এদের কথায় আমি খুব মুগ্ধ তখন।

স্ত্রী দেখি না, ছেলে মেয়ে দেখি না। বাবা আছে। আমি বটগাছের ছায়াতলে।

ধনঞ্জয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। না, অনেক কথা মনে আসছে আজ। আজ তোতাবাবু বেলদার দিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন করবে, লোকআদালত বিষয়ে বক্তৃতা দেবে, পার্টি আপিসে বক্তৃতা দেবে, কিশোরপুর মৎস্য প্রজনন জলাশয় পরিদর্শন করবে, তারপর এই পথে ফিরবে মেদিনীপুর। তারপর যাবে কলকাতা। তাকে ধরা খুব মুশকিল।

আজকের তারিখে অজয়, কেশব ছদ্মনামের একটি ছেলে এবং জিতু হাঁসদা নিহত হয়।

ধনঞ্জয় দরজাটি টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। হ্যাঁ, গণপতিবাবুর কথা সত্যি হয়েছে।

জমি মানুষকে বাঁচাতে পারছে না। বৃষ্টি নির্ভর হলে যা হয়।

পরমি সরেন স্মৃতি বিদ্যালয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনে মাঠ। তারপরে বটঅশ্বত্থ জোড়া গাছ। পঞ্চায়েত বেদীটা বাঁধিয়ে দিয়েছে। দেখা যায় সরকারি প্রাইমারি স্কুল।

ভেকু সরেন মারা যাবার কালে কিছুই ছিল না।

দুই

কিছুই ছিল না হে তোতাবাবু। পুবে এমন পথও ছিল না। কিছু বড় গাছ। কিছু ঝাঁটি বন। ওই অর্জুন গাছটার নিচে হত বাঁধনা পরব।

পরমি কাকী আছে এই জানি। সে ছেলে বউয়ের সঙ্গেই মাঠে ঘাটে, ধান তোলে, ধান বোনে। ভেকু কাকা মারা যাবার কালে ছেলেরা তেমন বড় নয়। পরমি কাকী ইচ্ছে হলে আবার বিয়ে করতে পারত, কেউ বলার ছিল না।

পরমি কাকা। এই বটঅশ্বত্থটা হয়ে গেল।

বায়ে হেলল না, বাতাসে দুলল না। সবচেয়ে অবাক কথা বয়স বাড়ল কিন্তু চেহারা যেন তেমনই থাকল। পাঁচটা গ্রামের সাঁওতাল সমাজে সে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। মিমতেল মাখত, ফলে চুল ছিল পাথরিয়া ঘাসের মত সতেজ ও শক্ত। ক্ষারে কেচেয়া ধপধপে সাদা কাপড় পরত। দেহ ছিল পাথরে গড়া। ধনঞ্জয়ের মনে পড়ে, ভেকু সরেনকে হাসপাতালে নেবার কালে কাকী যখন হেঁটে যাচ্ছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনও বনদেবী।

সেই পরমি কাকীরও তেমন খবর নেওয়া হয় নি।

তেমন সময়েই প্রণবচন্দ্র গিরি আর মহেন্দ্রর মামা পঞ্চানন হাঁসদা ধনঞ্জয়ের কাছে এলেন।

ডাহিপাড়াতে একটা প্রাইমারি স্কুল শুরু করতে হয়। আদিবাসি ছেলে মেয়ে সব নিরক্ষর।

—গোবিন্দবাবু বলে, গ্রামে গ্রামে স্কুল হবে?

—তার উপর ভরসা করে বসে থাকলে আমাদের চলবে না। লেখাপড়া না শিখলে আমাদের ছেলেমেয়েরা দাঁড়াতে পারবে না।

লেখাপড়া শিখেও তারা একদিন দাঁড়াতে পারবে না। উন্নয়নের পথে যে মিছিল, তারা পথের পাশে দাঁড়িয়ে দর্শক হয়ে থেকে যাবে। এমন কথা সেদিন ছিল ভাবনার অতীত।

—তা, আমি কি করব বলুন?

—ম্যাট্রিক পাস ছেলে। ঘরে বসে আছ?

ধনঞ্জয় বলেছিলেন, একেবারে বসে থাকি না। এই গাছতলায় ছেলেদের অ-আ শিখাই।

পঞ্চানন হাঁসদার চোখ আশায় উজ্জ্বল।

—আমার গ্রাম ডাহিপাড়ায় প্রাথমিক স্কুল অর্গানাইজ করছি। আমি, তুমি, গিরিবাবু তিন মাষ্টার। বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, সবই পড়াব। চার বছর চালাতে পারি তো স্কুল অনুমোদন পেয়ে যাবে। তখন বেতন হবে।

—স্কুল হবে কোথায়?

পঞ্চানন হাঁসদা বুকে চাপড় মেরে বলেছিলেন, ঘর আমি দেব। আমার জায়গা আছে। সবাই হাতে হাতে দেয়াল তুলে দেবে। বাঁশের বাতা, খড়, দরজা-জানালা-ব্ল্যাক বোর্ডের শাল বল্লা, চাঁদা তুলে হয়ে যাবে।

—ছাত্র আসবে?

—আমার ছোট ছেলে চরণ, তোমার ছেলে অজয়, গ্রামে সাঁওতাল পঞ্চাশ ঘর, ছেলে হবে না?

অজয়ের পড়ার ব্যাপারটা ভাবতে হচ্ছিল। মমতার বাবা, ধনঞ্জয়ের শ্বশুর বলেছিলেন, নয়াগ্রামে তাঁর কাছে রেখে ছেলে পড়াতে।

শালবাড়ি গ্রাম বড় বেপট জায়গায়। সে সময়ে ছিল কুসমা গ্রামে প্রাথমিক স্কুল। দেড় মাইল দূরে স্কুল, ছেলেরা পড়তে যেত না। ভেকু সরেন লেখাপড়ায় এত আগ্রহী হলেন শালবাড়ি এসে। কিন্তু তাঁর ছেলেরাও তো নিরক্ষর থেকে গিয়েছিল। ভটকা ও সাওনা লেফারাড-তে শিশুই ছিল। শিক্ষাই সমস্যা। ধনঞ্জয় ভেবে-ছিলেন ডাহিপাড়াতে স্কুল সংগঠন করতে পারলে কাজের কাজ করা হবে।

ডাহিপাড়াতে যেতেন সাইকেলে। অজয়কে ওরকম এক স্কুলে পড়াবার ইচ্ছে হয়েছিল বলে বাবা খুব ক্ষুণ্ণ হন। মমতাও খুশি হয় নি।

—আমার বাবার একটা সম্মান আছে। তিনি আমিন। জমি

মাপাজোখায় খুব দক্ষ। তাঁর জমিভূমি, গরুমহিষ, ফলের বাগান, কি নেই তাঁর? ময়ূরেশ্বর মাহাতোর নাম সবাই জানে। তাঁর কাছে থেকে পড়লে অজয় মানুষ হয়ে যেত। পাঁচ জাতের সঙ্গে খেলে বেড়ায় এখানে…

ধনঞ্জয় বলেছিলেন, আমিই তো পড়াব। অর্গানাইজিং স্কুলে পড়া ভাল হয়। শিক্ষকরা খাটে। প্রথমটা পড়ুক। তারপর তোমার ছেলেকে আমি অবশ্যই শ্বশুরমশায়ের কাছে রেখে পড়াব।

মমতা এ নিয়ে খুবই জেদাজেদি শুরু করে।

শেষ পর্যন্ত ধনঞ্জয় বাবার কাছে হার মানলেন।

—তোমা কাছে থেকে পড়লে ছেলে তোমার মানুষ হবে না। তোমার মতো অপদার্থ হবে [illegible] কি? তুমি জমির ভাত খাচ্ছ, তারাও তাই খাবে? লেখাপড়া শেখে মানুষ চাকরিবাকরি করবে বলে। তুমি যা দেখালে…

এতসব কথা হয়েছিল বলেই অজয় নয়াগ্রামে পড়তে গিয়েছিল।

নয়াগ্রামে গিয়েছিল বলেই শান্ত গিরিকে সহপাঠী পায়। ক্লাস এইট থেকে দেখা গিয়েছিল, শান্তর আকর্ষণে অজয় ছুটিতে বাড়ি এলেও চলে যায়।

শান্তর আকর্ষণে, না শান্তর কলকাতার ছাত্র দাদা কান্তর আকর্ষণে? ওদের বাড়ি ছিল গোপীবল্লভপুরে মহাগ্রামে। অজয় ওদের গ্রামে যেত, থকত।

ধনঞ্জয় খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন যে অজয় এমন একটা পরিবারে মিশছে যে পরিবার লেখাপড়া করে, জাতপাঁত মানে না, শান্তর জ্যাঠামশাই এক সময়ে পরাধীন ভারতে বিপ্লবী দলে ছিলেন। অঞ্চলের নাম করা বাড়ি। অজয় ওদের সঙ্গে মিশে অনেক কিছু শিখবে।

মলয়ের বেলা শিক্ষারম্ভ থেকে শেষ ঝাড়গ্রামে। সেটা করেন ধনঞ্জয়ের বাবা।

—নয় হস্টেলে থেকেই পড়বে। একটা নাতিকে আমি হস্টেলে রেখে পড়াতে পারি।

ধনঞ্জয়কে দু-ছেলের বিষয়েই চিন্তামুক্ত করে দেওয়া হয়। চন্দ্র সিং বলেছিলেন, তোমার ছেলেদের সরিয়ে দিলে। অন্যের ছেলেদের পড়াচ্ছ ডাহিপাড়া যেয়ে। এ কেমন হল? ধনঞ্জয় কি জবাব দেবেন?

—ডাহিপাড়ার স্কুল অনুমোদন পেয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, কাকা, তা তো পাবেই।

—যারা পড়াচ্ছে, তাদের চাকরি হবে?

—তাই তো। হবার কথা।

—তাহালে তুমিও কাজ পাবে?

—আগে স্কুল চলুক, অনুমোদন পাক।

—তাহলে ধনঞ্জয়! খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি। গ্রামের যে ছেলেটা লেখাপড়া শিখে, সেই গ্রাম থেকে সরে যায়। তুমি ছেলে শালবাড়ির। চাকরি করবে ডাহিপাড়া। ভাল রে ভাল?

—পড়ার জন্যেও তো সরে যেতে হবে কাকা।

—কি রকম?

—নয় কুসমা, নয় ডাহিপাড়ায় পড়ল। তারপর? জুনিয়ার হাই নেই, হাই স্কুল নেই। পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়বে, তো পুবে তরন, পশ্চিমে পাটাপুতা যেতে হবে। দুয়ের দূরত্বই সাত-আট মাইল।

—কৌশল হে কৌশল!

কেমন কৌশল? কে করল কৌশল?

আকাশ-মাঠ-গাছপালা যেন শত্রু। এভাবে গলা নামিয়ে চন্দ্র সিং ভূমিজ বললেন, সরকারের ষড়যন্ত্র। আদিবাসী যেখানে, অনুন্নতি সেখানে। সেখানে চতুর্থ শ্রেণীর স্কুল। ওই পর্যন্তই শেখো। পঞ্চম শ্রেণীর স্কুলে কে যাবে অতদূরে হেঁটে হেঁটে?

—আমরা তো বিড়াগ্রাম বিদ্যাকুমারী স্কুলেরই ছাত্র। আমরা হেঁটেই গিয়েছি। তখন তরন বা পাটাপুতা স্কুল হয় নি।

—সেও বহু বছর হয়ে গেল। এতদিনে ক'টা ছেলে মেয়ে উঁচু স্কুলে পড়ল? তিনটে কি চারটে। সেও তোমাদের ঘর থেকে।

—এখন তো কিছু পথ হয়েছে।

—হেঁটে যাওয়া অসম্ভবই। অনুপায়ে লোক সবই করে। এককালে আমরা হেঁটে মেদিনীপুর যেতাম। বাস ছিল না, রেলের ভাড়া বাঁচাতাম। তোমরা ঝাড়গ্রাম হেঁটে যাবে?

চন্দ্র সিং, ভূমিজদের মধ্যে মানী মানুষ। বারবার মাথা নেড়েছিলেন। ভাল করছ না ধনঞ্জয়, ভাল করছ না।

কিন্তু সে সময়ে ধনঞ্জয় চন্দ্র সিংয়ের কথা বোঝেন নি। উত্তপ্ত হয়ে বলেছিলেন, গ্রাম থেকে যারা প্রাইমারিতেও গেল, আমার কাছে অ-আ শিখে গেল। আমি গ্রামের কোন্ কাজে নেই? রাস্তাটা নেই, কুয়োর পাড় ভাঙা, লোধাপাড়ায় জল নেই, লেখালেখি দৌড়দৌড়ি কোন্‌টা করছি না? আপনাদের সামনে রেখেই তো করছি।

—তুমিই তো করবে। গোবিন্দবাবুর পর বীরেন মহাপাত্র এখন এম এল এ। তার ছেলে তোতা তোমার সঙ্গে পড়ত। খুব বিদ্বান। কলকাতার কলেজে পড়ায়। তুমি বললে ওরা শুনতে পারে।

—না কাকা, সে সব কথা কেউ মনে রাখে না।

—দেখ!

ডাহিপাড়া স্কুলটা যাতে অনুমোদন পায়, সে জন্যে কি চেষ্টা, কি চেষ্টা। ছেলেদের মেয়েদের যতগুলোকে পঞ্চাননবাবু তাড়িয়ে নিয়ে আসে, সেগুলোও বসতে চায় না।

হোই, জল নামল, মাছ ধরব।

হোই, ঝড় উঠল, আম কুড়াব।

দৌড়ে দৌড়ে চলে যেত ওরা।

তারপর প্রথম শ্রেণীতে যদি চল্লিশ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিরিশ, তো তৃতীয় শ্রেণীতে আঠারো। চতুর্থ শ্রেণীতে দশজন থাকল তো সে অনেক।

প্রণব গিরি হাসতেন।

—কি, মন খারাপ লাগে?

—কবে এরা বুঝতে শিখবে।

প্রণব গিরি ধৈর্যকে বলতেন ধর্জ, সহ্যকে বলতেন সর্জো। প্রণব গিরিও নেই। ক'বছর আগে তীর্থ করতে দেওঘর গিয়ে সেখানে মারা গেলেন। গলায় তুলসীমালা, মুখে সদাই হাসি, প্রণব গিরি ডাহিপাড়া সমেত তিনটে স্কুল অর্গানাইজ করেছেন। অনুমোদন করিয়েছেন। ভূতের বেগার না খাটলেও পারতেন। কিন্তু কিছু কিছু লোক ভূতের বেগার খাটে বলেই আজও পৃথিবী অনেক সহনীয়।

তিনি বললেন, ধর্জসর্জ চাই হে ধনঞ্জয়। লেখাপড়া করতে দেখে নি জীবনে, বদ্ধ ঘরে বসে থাকার অভ্যাস নেই। চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেরা যখন হাইস্কুলে যেয়ে সগৌরবে পরীক্ষা দিয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ঢুকে যাবে তখন স্কুলে ছেলে বেশি করে আসবে।

—যারা গরুবাগালী কাজে যাচ্ছে?

—তারা যাবেই। বাগাল রাখিও আমরা। স্কুলও করি আমরা। ঘরে ভাত নেই তো বাগালী করবে।

ধনঞ্জয় বুঝেছিলেন সমস্যাটি অত সহজ নয়। ভেকু সরেনের তাড়ানায় একদিন আটটি ছেলে বিড়াগ্রামে পড়েতে গিয়েছিল বটে, তবে তাদের ঘরে নিভাত নিরন্ন অবস্থা ছিল না।

ঘরে ভাত না থাকলে অ-আ থেকে ঐক্য-বাক্য-মাণিক্যে উত্তরণ বড় কঠিন।

আজ অনেক কথাই মনে পড়ে।

দিনটি কাজের দিন। রাস্তা অবরোধ করে তোতাবাবুকে স্কুলের দাবিপত্রটি দিতে হবে। মাঝে গাড়ি, সামনে গাড়ি, সিকিউরিটি, ক্যাভালকেড।

দিনটি অজয়ের দিন। অজয় এই হৈমন্তিক দিনটি কিনে রেখে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে।

ভাত না থাকলে ছাত্র চলে যাবে।

ধনঞ্জয়, প্রণব ও পঞ্চানন চাঁদা তুলে ছেলেমেয়েদের এক গাল মুড়ি দিতেন। মুড়ি খা, জল খা, ইস্কুল ছেড়ে যাস না। তোরা পড়লে স্কুল অনুমোদন পাবে। তখন সরকার তোদের পাঁউরুটি খেতে দেবে। ভাল করে পড।

সে সময়েই একদিন চামটু মল্লিক লোধা এসেছিল। লোধারা এদিকে বড় একটা আসে না। তার পিছনে বুনো ঘোড়ার মত অবাধ্য একটা ছেলে।

—কি কথা, কাকা?

—ইস্কুলটি যে চালাইছ, লধা ছেলে পড়তে পারে?

—সবাই পড়তে পারে।

—আমার নাতিটা…

চামটু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

—বলে পঢ়ব।। পঢ়ব। তা তুমি বিনা গতি কি?

—সত্যি বলেছে?

—বলেছে।

—তবে পড়বে। হেঁটে যাবে তো?

—খুব যাবে। মুড়ি বেঁধে লিয়ে যাবে…

—দুপুরে আমরা মুড়ি দেই।

চামটু গাছগাছড়ার গুণাগুণ জানত। ছাগলের চামড়া দিয়ে চাঙ্গু তৈরি করতে জানত। তেল পড়া, জল পড়া জানত। আর জানত পাখপক্ষী কীটপতঙ্গের খবর।

এই জানাজানিটা ধনঞ্জয়কে চিরকাল মুগ্ধ করেছে। একদিকে নিরক্ষর, অন্যদিকে অসীম জ্ঞানী।

চামটু উজ্জ্বল চোখে বলেছিল, দুপারেও মুড়ি খাবেক্। তবে

মাহাতো ভাস্তা, তুমি ওরে পড়াও। খুব খাবে, খুব পড়বে, না কি বলো?

—পরমি কাকীর খবর জান?

—না ভাস্তা। ভেকুবাবু মরে গিয়ে···

—এই সুভাষ, এদিকে আয়। জামা প্যাণ্ট কেচে নিয়ে যাবি ইস্কুলে। বসবার চাটাই নিয়ে যাস।

সুভাষ গিয়েছিল।

বটঅশথের পাতা ঝিরঝির করে। দূরে দূরে ধানক্ষেতে পাখি তাড়াচ্ছে ছেলেরা।

ধনঞ্জয়ের মনে হয়, অজয় কিছুই জেনে গেল না। বাবার সঙ্গে তার পরিচয়ই হল না। বাবাকে সে কি মনে করত, তাও তিনি জানেন না।

আজ অজয় থাকলে বলতেন, তিনিও জয়ের আনন্দ জেনেছেন, কখনও কখনও ছুঁয়ে ফেলেছেন মেঘপাহাড়ের চূড়ায় রোদকে। সুভাষ, একটি লোধা বালক পড়তে চেয়েছিল, তাকে পড়িয়েছেন।

লোধারা আদিবাসীদের মধ্যেও বড় হতভাগ্য। ব্রিটিশ বলেছিল তোরা অপরাধপ্রবণ। ১৯৫৩ থেকে ওরা বিমুক্ত জাতি। কি ভয়ানক, নির্মম স্বাধীন ভারতীয় পরিহাস। জেল থেকে, পুলিসের অত্যাচার থেকে, প্রতিবেশী সমাজের অত্যাচার থেকে লোধা মুক্তি পায় নি। "অপরাধপ্রবণ" শব্দটির কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে কাগজে।

ভেকু সরেন বলত, কাগজ বড় শক্তিমান হে। আকাশ দেখে বলে দিব জল কখন হবে। মাটি দেখে বলে দিব নিচে জল আছে কি না। কিন্তু এ সকল জ্ঞান হয় না হে ধনঞ্জয়। এ সবের কোনও ক্ষমতা নাই। সকল ক্ষমতা ধরে কাগজ। অথচ তা আমরা জানি নাই।

ভেকু সরেন বলত, গোবিন্দপুর, কিশোরপুর, গোপালগঞ্জ,— সেটেলমেণ্টে দেখ গা' লোধাড়ি। সার্জোমগেড়িয়া, সলগেড়িয়া, বিরিডিহা, ডাঙসল। সকলই আদিবাসী নাম। আমরা পড়া জানতাম

না। কাগজের ক্ষমতা বুঝলাম না, তাতেই সব চলি গিছে। ডাংরাটা, গরুটা পলালে ধরে আনতে পারি। দেশটো চলি গেলে ধরি কেমনে?

সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহালি, কোড়া, লোধা। লোধা সবার পিছে, সবার নিচে।

সুভাষ, লোধা সমাজের একটি ছেলে, তাঁর সস্নেহ উৎসাহে পড়ায় কি উৎসাহ না দেখায়। ডাহিপাড়া থেকে তরন। ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল সুভাষ। তারপর গোবিন্দ মহাপাত্রের একটি চিঠির জোরে ও সেচবিভাগে কাজ পেয়ে যায়।

এই মাঠে সুভাষকে নিয়ে মিটিং করেন ওঁরা। ধনঞ্জয় বলেছিলেন, সুভাষ প্রমাণ করে দিল, সুযোগ পেলে লোধা ছেলেও পারে। তাকে দেখে অন্য লোধা মা-বাপ ছেলে মেয়েদের পড়তে পাঠাক।

চামটু বলেছিল, এখন আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। জন্ম হতে শুনে এলাম লোধা চোর, লোধা ডাকাত। লোধা ছেলে। সে আমারই নাতি, মানুষ হল, এখন মরতে দুঃখ নাই।

সুভাষ কেন। লোধা পাড়াটাই এখন তোতাবাবুদের সমর্থক। সুভাষ কাজ করল, বিয়ে করল, ঘর বড় করল। জমি কিনল। এ কথা সেদিন ভাবা যেত না। ঝাড়গ্রামে লোধা সেল থাকবে, লোধা অফিসার, অফিস কর্মী থাকবে। এ কথা সেদিন ভাবা যায় নি।

অনেক কিছুই ভাবা যায় নি। জানা যায় নি।

যেমন ভাবেন নি, অজয় প্রথম ডিভিশন পাবে স্কুল ফাইনালে। পরীক্ষা দেবার পরেও সে বাড়িতে আসতে চায় নি। প্রবল প্রতাপান্বিত ময়ুরেশ্বর মাহাতো যিনি দশ মাইল অক্লেশে হাঁটতেন। মাহাতোরা কেন আদিবাসী বলে গণ্য হবে না, তা নিয়ে আন্দোলন করতেন। চাষবাসের নাড়ীনক্ষত্র বুঝতেন। জরিপ কাজে পারঙ্গম ছিলেন। তিনিও বিভ্রান্ত হয়ে যান ও একদিন এসে হাজির হন।

গরম কাল। আম, কাঁঠাল ও বাড়িতে তৈরি ক্ষীরের ছাঁচ এনেছিলেন, মেয়ের জন্য কাপড়, জামাইয়ের জন্য ধুতি।

—আসা তো হয় না। এলে কি খালি হাতে আসতে পারি? যা হোক, তোমাদের স্নানের ব্যবস্থা এখনও নদীতে? সরকার খাল কাটায় না কেন?

বাড়িতে ওঁকে স্নানের জল তুলে দেওয়া হয়। মমতা ছোটে রান্নাঘরে।

ধনঞ্জয়কে নিয়ে উনি নদী দেখতে যান।

ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে পড়ে হাঁটার সময়ে খুব চিন্তাকুল থাকেন।

নদীর সামান্য জলে গ্রামবাসীর স্নান দেখতে দেখতে বলেন, কথাটা তোমার সঙ্গেই। মমতা বা বেয়াইকে বললাম না। ওঁরা অস্থির হবেন।

—অজয় কিছু করেছে?

নদীর বহমানতা দেখতে দেখতে উনি বলেন, সে তো মহাগ্রামে চলে গেছে। শান্ত গিরে, কান্ত গিরি, তাদের সঙ্গে কলকাতা ঘুরে এসেছে বলে শুনলাম।

—তাদের প্রশংসা তো আপনিই করেন। কলকাতা ঘুরে এল… কই, আমরা তো জানি না।

—প্রশংসা!

দারুণ ক্রোধে উনি বলেন, বিষ-খোপরা ছেলে ওরা! স্কুলের পড়া যেমন তেমন। ওরাই ওর মাস্টার। বিশেষ করে কান্ত গিরি! ঘরে কি লেখে রাত জেগে, কি করে! শেষে চেপে ধরলাম। অজয় যা বলল, আমার মাথা…

—কি বলল? আপনি খুলে বলুন।

—বেশ কিছুদিন মাছ খায় না, দুধ খায় না, ডাল ভাত খায়। হরদম শান্তর সঙ্গে চলে যায়। আমি চেপে ধরলাম। কি সে বলল জানো?

—তাই তো শুধাচ্ছি।

—আমি মহাপাপী। জমিভূমি ভোগ করছি। চাষীবাসীর উপর অত্যাচার করছি। আমার উচিত সব জমি ভূমিহীনে বিলি করা, আমার মত লোকদের বেঁচে থাকা পাপ। এই সব বলতে আমি বললাম, তুই শালবাড়ি যা। তোদের জমিভূমি বিলি কর্‌গা যা। সেই রাগে সে তো চলে গেল।

—এখানে তো আসে নি।

—কোনও খবরই রাখো না, জান না। গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, শাঁকরাইল, খুব বিগড়ে গেছে। সাঁওতালরা এখন খুব তেরিয়া। বলে, আমাদের জমিভূমি আমরা নিব, জোতদার মহাজনের মাথা ফেলব।

—অজয় তাদের সঙ্গে?

—আর কাদের সঙ্গে? নেতা কে? কান্ত গিরি।

—আপনি নকশালদের কথা বলছেন?

—জানো তাদের কথা?

—ভাসা ভাসা শুনেছি। আমরা তো নির্বাসনে পড়ে থাকি। ঝাড়গ্রামের খবরই পাই না।

—অজয় এমন হয়ে যাবে তা কখনও ভাবি নি।

—এমন করলে তো পুলিস লেগে যাবে।

—ভাব কি? পুলিস সব খবর রাখে। দারোগাই বলে গেল, নাতিকে সরিয়ে দিন মহাগ্রামে থেকে।

—আপনি ওকে পাঠিয়ে দিন।

—কেমন করে?

শুষ্ক ও ক্রুদ্ধ গলায় ময়ূরেশ্বর বলেছিলেন, এখন আমি উপায়হীন। আমার নাতি জড়িত। কতটা তা জানি না। কিন্তু ডেবরা থানা, গোপীবল্লভপুর থানায় জোতদার-মহাজন শাসানি পেয়েছে। শুনছি, কারও মাথা থাকবে না। এ বছর আমি কি করেছি জানো?

—কি করলেন?

—জমি চষে তো সাঁওতালরা। তাদের সঙ্গে কথা, দশ বিঘা জমির

ধান তোরা নে। পনেরো বিঘা জমির ধান আমায় দিস। কেন এ ব্যবস্থা করেছি?

গলা নামিয়ে উনি বলেন, চন্দ্রকান্ত গোপকে না কি কেটে ফেলেছে। সে ডেবরার জমিভূমিবাস লোক। পুলিসকে টাকা খাওয়াচ্ছি, বিপদে দেখো। সাঁওতালদের মন রাখছি। আমি তো দেশ ছেড়ে সরতে পারব না।

—এত কথা, আমরা জানি না।

—আমিই কি জানতাম? এ বছর ধনী-চাষীর জমির ধান নেবে ক্ষেতমজুর, ভূমিহীনরা। মারদাঙ্গা হবে। হাওয়া এদিকে আসে নি, আসতে কতক্ষণ?

—এদিকে আসে নি। আসলে আমি জানতাম।

—আমি জানলাম না, তুমি জানতে?

—আমি যে ডাহিপাড়া যাই, ওদের ছেলেদের পড়াই, এখানে পাঁচটা গ্রামের সুখদুঃখে থাকি।

—জানি। সে জন্য আমার লজ্জা খুব ছিল। এখনও আছে। শিক্ষিত ছেলে হয়ে কাজ কর না, স্কুল অর্গানাইজ কর, পাঁচ জাতের সঙ্গে ওঠো বসো। আমার মাথা হেঁট। কিন্তু এখন দেখছি, তোমার এখানে হাঙ্গামা হলে হয়তো, এর ফলে তোমরা বেঁচে যাবে।

—আমাদের এখানে ধনী চাষী কোথায়! সেচ কোথায়! এক থেকে পনেরো। এর বেশি জমি কার আছে? সে জমিতে কি হয়? হ্যাঁ, লোক লাগাই, কিন্তু বাবাও লাঙল ধরেন, সময়ে আমিও ধরি। ধান বেচে না কেউ, মহাজনীও করে না। গ্রামগুলি তো গরিব। আপনাদের ওদিকে অন্য অবস্থা।

—অবস্থা বলে অবস্থা? অবস্থা যে দুরবস্থা হয়ে যাবে কে ভেবেছে? তোমাদের গ্রামের মত গ্রাম, আমি বাপু আজই ফিরব। সঙ্গে লোক এনেছি সে জন্যই। তোমার ছেলের দায়িত্ব নিলাম, অথচ সে বয়ে গেল, আমার দুঃখ সেটাই।

—একটা চিঠি দিই। আপনি যেভাবে হোক পেঁাছে দেবেন লিখি, মার খুব অসুখ, সত্বর এসো।

—তা দেব। সে টুকু পারব। অজয়কে বললাম, স্বাধীনতার পর জমিভুমিবাস লোকের সঙ্গে লড়াই কিসের তোদের? ছোঁড়া বলে বসল, মানুষ খেতে পায় না, জমি নাই তাদের, তোমরা তাদের শুষে খাচ্ছ, এটা স্বাধীনতাই নয়। বলো! আমি বললাম, তোদের কোনও নীতি নাই। ও বলল, আমাদের নীতি রাজনীতি। আরও কত কথা! কত কত কথা!

—পরীক্ষা দিয়ে একবার এল না…

—এলে পরে যেতে দিও না। হবে নাই বা কেন? হতভাগা, আমাকে তোমার দৃষ্টান্ত দিল। বলল, আমার বাবা গরিবের কথা ভাবে। তুমি ভাবো? তোমা হতেই কুদৃষ্টান্ত পেয়েছে ধনঞ্জয়।

মাথা নেড়ে ময়ুরেশ্বর বলেন, চলো।

অনেক, অনেকদিন হয়ে গেল।

অজয় থাকলে এতদিনে তার বয়স ছত্রিশ।

মলয় চৌত্রিশে পড়েছে।

পূর্ণিমার বয়স আটাশ।

মলয়, পূর্ণিমা, ওরা আগামী শতাব্দী দেখবে। কিন্তু অজয় কিছুই দেখে গেল না।

না কি দেখেছিল? পরে শুনেছেন, কান্ত ওকে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

কান্ত, শান্ত, সবাই এখন মধ্যবয়সী।

ধনঞ্জয়ের ছেলেটার বয়স বাড়ল না।

কিন্তু অজয় তো এসেছিল।

।। তিন ।।

ধনঞ্জয় উঠে পড়লেন।

—কি, বসেই আছেন ? অ দাদা !

চন্দ্র সিংয়ের ছেলে গুণধর।

—এই বসলাম একটু।

—স্কুলের কথাই ভাবছেন ?

—হ্যাঁ...

—ভাববেন না, ভাববেন না। গুণধর সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখেই বলে, পঞ্চায়েত এ বছর আমাদের। এবার জোর করে দাবি করতে পারবে শালবাড়ি। পরমি সরেনের নামে ফ্যাংশনে করে দেব।

—স্কুল অনুমোদন পাক।

—পাবে, পাবে কাকা। স—ব হয়ে যাবে।

—সন্ধ্যার প্রোগ্রামটা ঠিক থাকে যেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রধান বলেছেন, উনি দাঁড়াবেন। দাবিপত্র নেবেন। তবে সব যেন শান্তিপূর্ণ হয়। আরও বলেছেন, পঞ্চায়েতটা যদি আগে পথে আসত, হয়েই যেত। সেটা বলতেই পারেন। বামফ্রন্টের সরকার। পঞ্চয়েত যদি···

গুণধরও কোনও স্বপ্ন দেখছে না কি ?

—তোমার স্বাস্থ্যকর্মীর কাজের কি হল ?

—জানি না...শুনছি তো হবে, হবে। যাই কাকা, সাইকেলটা ফেরত দিতে হবে।

গুণধরের মনে নেই, এটা অজয়ের মৃত্যুদিন।

কত লোকের মনে নেই। মনে থাকলেও কেউ বলে না। পরমি কাকী থাকলে ঠিক মনে করত। সেই তো এসেছিল ধনঞ্জয়ের কাছে।

—কান্দ, কান্দ কেনে তুই ? তুর বউ কান্দছে। মিঞা কান্দছে, বাপ মা কান্দছে, তু বুকে পাষাণ লিয়ে থাকিস না বাপ। কান্দা। আকাশ চিরা কান্দ্।

—তুমি তো কাঁদনি সেদিন ?

—কান্দ্‌ছিলাম। মাঠে যেয়ে। সে দিন আমি কান্দ্‌লে রানীর মা, ভটকা, সাওনা কি করত ?

পরমি কাকী বলেছিল, সে তো মন্দ কথা বলে নাই। গরিবের ভাল করতে যেয়েছিল।

এ কথা শুনে ধনঞ্জয় কাঁদতে পেরেছিলেন।

ধনঞ্জয়ের মা বলেছিলেন, ভাল করতে পারল ? নিজের জীবনটা চলে গেল ? পরমি কাকী বলেছিল, তুমার বেটা যেমন গরিবের খবর লিছে, জাহানটো সঁপি দিছে, তার বেটাও তাই করছে মাহাতো দিদি। মন্দ কাজ ধনাও করে নাই, তার বেটাও করে নাই।

অজয়ের তো কোনও ছবিও ছিল না। স্কুল ম্যাগাজিন থেকে ওর ছবি নেগেটিভ করিয়ে ছাপিয়ে নেন ধনঞ্জয়।

ভেসে যাচ্ছিলেন, ভেঙে যাচ্ছিলেন, পরমি কাকী ওঁকে অবাক করে টেনে ফিরিয়ে এনেছিল।

হ্যাঁ অজয় এসেছিল।

পরে বুঝেছেন, অজয় এসেছিল, চলে যাবে বলে। শালবাড়ি, ডাহিপাড়া, মাকাল, দাদিরা, এসব জায়গায় সংগঠন করা যায় কি না তা দেখতেও এসেছিল।

সে সময়ে ধনঞ্জয়ের হাতে অনেক কাজ।

ডাহিপাড়ার স্কুলটি অনুমোদিত হয়েছে। তিনিও কাজ পেয়ে যাবেন।

স্কুলের ঘর করে দিচ্ছে সরকার। পঞ্চানন ও প্রণব খুব আনন্দিত।

গোবিন্দ মাহাতো, চন্দ্র সিং, রূপচাঁদ টুডু ধনঞ্জয়কে ডেকে নিয়ে যায়।

গোবিন্দ মাহাতোর ঘরেই কথা হয়। গোবিন্দ মাহাতো যাত্রা করতেন। বেশ নাটকীয় ভাবে থেমে থেমে কথা বলতেন ও গোঁপে মোচড় দিতেন।

—ঘরভেদী বিভীষণ হয়ে গেলে ধনঞ্জয়!

—কি করলাম, কাকা?

—ডাহিপাড়ায় শিক্ষক হচ্ছ?

—সে তো তিনজনেই।

রূপচাঁদ টুডু বলেছিলেন, বিচার করো।

—কিসের বিচার?

চন্দ্র সিং বলেছিলেন, সমস্যাটা ভাবো। ডাহিপাড়ায় ওরা প্রাথমিক স্কুল করল। কুসমাতে প্রাথমিক স্কুল আছে। শালবাড়িতে আজ নয়, কাল হবে। এ খবর সত্য। গোবিন্দবাবুর কাছে আমাদের গোবিন্দ মাহাতো জেনে এসেছে যে শালবাড়ি, মাকাল, দুটো স্কুল হবে।

—এ তো সুসংবাদ।

—তারপর? তারপর তারা পড়বে কোথায়? ডাহিপাড়া যদি প্রাথমিক স্কুল অর্গানাইজ করতে পারে...আরে! তুমি তো আগে গ্রামের কথা ভাববে? আমরা মনে করি, আমরা প্রাথমিক নয়, পাঁচ থেকে আট। জুনিয়ার হাই স্কুল সংগঠন করি। প্রাথমিক স্কুলে আমাদের ছেলেরা যাচ্ছে। মেয়েও দুটো যায়। বাস্, সেখানেই ইতি। পাঁচ থেকে আট স্কুল নাই। আমরা সংগঠন করলে কুসমা, ডাহিপাড়া, রানীসল, শালবাড়ির যেগুলা চার ক্লাস পড়ে বসে আছে, সেগুলাকে পাব। তোমার মেয়ে, রূপচাঁদের মেয়ে, গ্রামের চারটে মেয়ে এবার পাস দেবে। তারপর? পড়বে কোথায়?

—কাকা! প্রাইমারি আগে হোক।

—হবে, হবে। গোবিন্দ মহাপাত্রকে ধরেছি। মেদিনীপুরে যাব, প্রাইমারি স্কুলের ব্যবস্থা হবে।

—পড়াবে কে, কাকা?

—তুমি দেখ—

রূপচাঁদ টুডু বললেন, আশপাশেই লোক পাব।

— পাঁচ, ছয়, সাত, আট, চারজন পাবেন ?

— চারজন কিসে ? তুমি তো আছ।

— কাকা, স্কুল ফাইনাল পাশ টীচার তো চলবে না।

— কি চলবে ?

ধনঞ্জয়কে তখন নিজেকে দু'টুকরো করতে হয়েছিল। অজয়ের জন্যে এক ধনঞ্জয় বিনিদ্র, বিদীর্ণ, উদ্বেগে অস্থির। আরেক ধনঞ্জয় এইসব মানুষদের চিরদিনের চেনা। সুখদুঃখের সাথী, দীর্ঘকাল বট-অশথের নিচে, বর্ষাকালে নিজের ঘরে, ছেলেমেয়েদের অক্ষর চেনাচ্ছে। ঘরে ঘরে ঘুরে তাদের জোগাড় করে পাঠাচ্ছে কুসমা, ডাহিপাড়া।

ধনঞ্জয় মিনতি করে বলেছিলেন, তরনে শুনেছি একটা জুনিয়ার হাই স্কুল অর্গানাইজ করেছে। সেখানে গিয়ে নিয়মকানুন জেনে আসুন। মেদিনীপুর থেকে প্রাইমারি স্কুলের কথাটা সঠিক জানুন।

—এই দেখ! এ সব তো তুমিই করবে।

— কয়েকটা দিন যাক। অজয় আসবার কথা...

— সেও পড়াবে।

-- আপনারা দেখুন, আমি থাকব।

— তা হলে ডাহিপাড়া যাবে না ?

এ কি ভীষণ সমস্যা। ডাহিপাড়ার স্কুলও তো তাঁর হাতে গড়া। বাড়ির কাছে এ চাকরিটা রেখেও তিনি গ্রামজীবনে যতটা পারেন, কাজ করতে পারবেন।

—প্রথমেই হয়ত 'না' বলা যাবে না। তবে গ্রাম যদি চায়, সকলকে নিয়ে মিটিং করুন। গ্রাম যদি চায় ছেড়ে দেব।

ধনঞ্জয়ের জীবনে এই ত্যাগগুলোর হিসেব কেউ করেনি। চন্দ্র সিংদের পক্ষে তা করা সম্ভবও ছিল না। চিরদিন যাকে ডাকলে পাওয়া যায়। সে যেন থাকবেই।

রূপচাঁদ নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তোমার কথাও বুঝি। তবে ডাহিপাড়ায় দু'জন আছে, আরও একজন পেতে পারে। শালবাড়িতে

তুমি ছাড়া আমাদের ভরসা কে ?

—আপনার ভাগ্না নিবারণ না বি এ পাশ করেছে ?

—বাবা ! সে চাকরিও পেয়েছে, ট্রেজারিতে ক্লার্ক। ওরা দুটো ভাই চাকরিতে ঢুকে গেল।

—হ্যাঁ, শিলদার দিকে সাঁওতালরা খুব অগ্রসর।

—আদিবাসী ছেলেদের মধ্যে এটাও দেখছি! কাজ করব। চাকরি করব, শিক্ষকতায় তো বেতন কম !

সেদিন যদি একথা সত্যি হয়, আজ সে কথা আরও সত্য। আজ শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে, শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসীর সংখ্যাও কিছু বেড়েছে। শিক্ষকতার কাজ পাওয়া দুরূহ, সর্বত্র রাজনীতি। অন্য চাকরির দিকে ঝোঁক বেশি। সুযোগ কম। বিক্ষোভ কি বিনা কারণে বাড়ছে ?

—আপনারা দেখুন, আমি থাকব।

মমতা বলল, তোমার দ্বারা কিছুই হবে না।

বাবা বললেন, ছেলেদের কাজে ঢুকাব আমি। তোমাকে দেখলে তারাও বয়ে যাবে।

এর মধ্যেই অজয় এসে পড়েছিল। কাঁধে একটি ঝোলা। চেহারা রুক্ষ। কঠোর। এসেই বলল, মার তো কিছু হয় নি ?

—না হলে কি আসতে নেই ?

—ও, ওটা তোমার কৌশল ?

—কৌশল করতে হল কেন ?

—পরে কথা হবে বাবা। আগে গ্রামটা ঘুরে আসি। কতদিন বাদে এলাম।

পূর্ণিমা বলল, তুমি তো আসই না।

—এই তো এলাম। মলয় কোথায় ?

—সে বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেছে।

—দাদু পাঠাল তো ?

—হ্যাঁ।

ঠাকুমা বলল, তোর দাদুর ঘরে নানা নিধি খাবার। খেতে দিত না, না খেতিস না?

—খাব না কেন?

ধনঞ্জয় ভুরু কুঁচকে ছেলেকে দেখছিলেন আর দেখছিলেন। ভুরু কুঞ্চনের সেই উদ্বেগের চিহ্ন চিরস্থায়ী হয়ে গেছে কপালে। কপালটা আর মসৃণ হল না। অথচ বয়স তাঁর তখন সাঁইত্রিশ। কৈশোর পেরতে বিয়ে, উনিশ বছরে পিতা। অজয়ের বয়স আঠারো। পড়াশুনা ধরেছিল একটু বয়সে।

অজয় ওঁকে এড়িয়ে যাচ্ছিল।

—একটু ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবি এখন?

—গ্রামে পাঁচজনের সঙ্গে দেখা করি।

কথায় টান নেই, বয়সের চেয়ে গাম্ভীর্য বেশি।

—সাইকেল নিবি?

—না না, হেঁটে যাব।

—খালি পায়ে যাবি?

—হ্যাঁ, আমার অভ্যেস আছে।

অভ্যেস তোমার ছিল না অজয়, অভ্যেস তুমি করেছিলে। খালি পায়ে চলব, হেঁটো ধুতি পরব, বিড়ি খাব, ভূমিহীন মানুষের ঘরে থাকব। তোমাদের এই ছিল নীতি।

পরে তো দারোগা ও কলকাতা থেকে আগত পুলিস অফিসারের কল্যাণে ধনঞ্জয় সে সব কাগজপত্র দেখেছিলেন।

আগে জানেন নি।

এক প্রজন্ম পরের প্রজন্মকে চেনে না। ধনঞ্জয়ের বাবার কাছে ধনঞ্জয় এক গুড ফর নাথিং। ধনঞ্জয়ও যা শেখানো হয়েছে তাই বিশ্বাস করেছেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই স্বাধীনতা এনেছে।

তেরঙা ঝাণ্ডা আর জাতীয় পতাকা হল সমার্থক। গ্রামে থাক, গ্রাম সেবা কর।

ধনঞ্জয় বিশ্বাস করেছেন 'স্বাধীনতা' শব্দে।

অজয় কান্তদের কাছে নব দীক্ষিত, পুরনো যা, সবই সে অবিশ্বাস করত।

পিতা ও পুত্র, সামনে নদী।

দুজনে কত কথা হয়েছিল।

অজয় বেরিয়ে গিয়েছিল।

তার ঝোলা থেকে সব বের করে মমতার সে কি উদ্বেগ, সে কি মনোদুঃখ।

—ছেলে কি সন্নেসী হয়ে গেল?

—কেন?

—হা আমার কপাল। ঘরে এল, তা স্যুটকেস নেই, জামা কাপড় নেই। এই মোটা হেটো ধুতি, মোটা ফতুয়া, টিনের কৌটায় বিড়ি, ভাঙা একটা কাঁকই?

পূর্ণিমা বলেছিল, মা দাদা বলল না, ঝোলা ধরবি না? তুমি ধর কেন?

—থাম তুই। সব ফেলে দেব আমি। তুমি ওকে ভাল জামা, ভাল কাপড় কিনে দাও।

—সে যা বলবে সব কিনে দেব।

ধনঞ্জয়ের মা এই সুযোগে বড়লোক বেহাইয়ের উদ্দেশে মমতাকে খুব কথা শোনাল।

—তোমার বাপের পরনে তো রাজবেশ। নাতিকে কি পরাতো দেখে নাও। খেতেও দিত না।

ধনঞ্জয় প্রায় ধমক দিয়ে তীব্র স্বরে বলেন, মা। যা জানো না তা বল না। ওর দাদু ওর কোনও অযত্ন করে নি।

—এটা যত্নের চেহারা? করবে বা কেন? বড় কি ছোট মেয়ের

ছেলেরা হত, যত্ন করত। জামাইরা কেমন যোগ্য। জামাই যখন তুই, নাতির যত্ন আর কি করবে?

ধনঞ্জয় বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন।

গুণধরের সঙ্গে কথা হল, বাড়ি আসবেন, হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলে এসেছেন। এ তো নদীর পথ। সূর্য ঘুরে যাচ্ছে, বেলা কোথায়। স্নান হয়নি খাওয়া হয়নি।

ধনঞ্জয় ঘুরলেন।

বাড়ি কি নিঃশব্দ থাকে এখন। মা নেই। বাবা নেই। মমতা তার বড় আকাঙ্ক্ষিত গৃহিণী পদ পেয়েছে। তাকে কর্তাও বলা চলে। চাষবাস সেই করায়। গরু, গোহাল, সবই তার। ধনঞ্জয় কিছু জানতে যান না। মলয় ফিশারিতে কাজ করে। বিয়ে হয়েছে পুখুরিয়ায়। বউমা পিত্রালয়ে, ছেলে হয়েছে তার। মেয়ের পর ছেলে। মাস তিনেক থাকবে। বাঁকুড়ায় কর্মস্থলে যাবার আগে মলয় একবার ঘুরে যাবে।

মমতা যায় মলয়ের কাছে। পূর্ণিমার শ্বশুরবাড়ি বহড়াগোড়াও যায়।

মমতার ছেলে ও জামাই ময়ূরেশ্বরের মনোমত। ওরা কাজ করে, কোয়ার্টারে থাকে, দেশে জমি ও গরু কেনে। মলয় তো ঝাড়গ্রামে জমি কিনেছে, বাড়ি করবে ভবিষ্যতে। বাপের মত অকর্মণ্য হয় নি।

কয়েকটা টিউশনিতে গোটা যাটেক টাকা আসে, ধনঞ্জয়কে সংসারে হাত পাততে হয় না।

ধনঞ্জয়ের বাবাও লিখে দিয়ে গেছেন তাঁর স্থাবর অস্থাবর পাবে মমতা ও মলয়। মমতার অবর্তমানে মলয়ই তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী।

বাড়িতে ঢুকলেন।

—মলয়ের মা!

—ঘরের কথা মনে পড়ল ?

—খেতে দাও।

—স্নান করবে না ?

—সকালেই তো করেছি।

মমতা ভাত বেড়ে দেয়।

খুব অন্যমনে খান ধনঞ্জয়। মমতার হাত থেকে পান নেন একটা। মমতার বয়স এখন একান্নই হবে, চৌদ্দয় বিয়ে, পনেরোয় মা, সতেরোয় মা, ছ'বছর বাদে তেইশে আবার মা। একান্ন বছরেই মমতা খুব বুড়িয়ে যাচ্ছে। টক ও ঝাল খেয়ে খেয়ে পেটের রোগ।

—এখনি আর বেরিও না।

—না, বিকালে একবারে বেরব।

এই দিনটা অজয়ের, আর দিনটা পরমি সরেনেরও হয়ে আছে। দুজনে দুই মেরুর মানুষ ছিল।

অজয় শালবাড়িতে তিন দিন তিন রাত মাত্র ছিল। ডাহিপাড়া কুসমা, মাকাল, দাদিরা, রানীসল, কোথায় সে যায় নি ?

পরমি কাকী দিয়ে গিয়েছিল রাঙা চাল আর মেটে আলু।

—রেন্ধে দিবি মাহাতো দিদি। কি কথা গো তুর লাতির মুখে! ঠাগমা, ভাত রান্ধ খাব। তুঁই আলু রান্ধবি। সে তো ঘুরে ঘুরে বুলছে। সবার ঘরে গিছে, মুড়ি লিছে, বলে কি! পায়েস হতে মুড়ি পিঁয়াজ ভাল খাই।

মমতা ও তার শাশুড়ির গালে হাত।

—দশ ঘরে খেয়ে পেট বুঝালে ঘরে খেতে চাইবে না। না খেয়ে এমনিতেই দেহ কান্তি নাই।

পরমি হেসে গড়িয়ে গেল।

—সে থা তো আমাদের ঘরেই খায় গ। কত কথা বলল! আর

শুধু শুধাচ্ছে, মজুরি কত মিলে? মহাজন কে? আমার বাপ যখন মুনিষ লিছে, ভাত মুড়ি দিছে? লধার জমি নাই কেনে?

এমুন হাজার কথা।

নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, বেঁচে জীয়েৎ থাক কেনে? কে গরিবের কথা শুধায় বল্ দিদি। তুর বেটা যেমুন, লাতি তেমুন, কম কথা? সাওনার বাপ থাকতে ছেলাটো বড় হই যেত, তবে জানতে পারত কিছু। সে তো জানীমানী মানুষ ছিল, লয়? পিথিমির কথা জানত।

আজ ধনঞ্জয়ের মনে হয়, পরমি কাকী জীবনেও ভেকু সরেনকে ভোলে নি। বয়সে পার্থক্য ছিল, ঘরে সতীন ছিল, কিন্তু স্বামীকে সে ভালবাসত খুব। ভেকু সরেনের ওষুধ তৈরি করার হামানদিস্তা, শিল নোড়া, সব সে রেখে দিয়েছিল।

অজয় ওঁকে এড়িয়ে চলছিল।

কিন্তু শেষ দিন বিকেলে ধনঞ্জয় বলেছিলেন, কথা আছে অজয়। তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ।

ওটাই যে শেষ দিন হবে। তা ধনঞ্জয় বোঝেন নি। অজয়ও বোঝে নি। অথচ শেষ অবধি ওটাই হয়ে গেল সেই শেষ দিন, যে দিন ধনঞ্জয় জীবিত অজয়ের সঙ্গে শেষ কথা বললেন।

তাও কি হবার কথা? ধনঞ্জয় হাটে যাচ্ছিলেন বিড়াগ্রামে। হাট বড়ো, বাবার জন্যে কাপড় কিনবেন টিউবওয়েল মিস্তিরিকে খবর দেবেন, সওদাও করবেন, কাজ অনেক।

অজয় সকালেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

বিড়াগ্রাম থানাটি কয়েক বছরের। নামে আউটপোষ্ট, থানা স্ট্যাংশন হয়েছে, জমিদারী সেরেস্তা ভাড়া নিয়ে কাজ চলছে। ওঁকে রাস্তায় ধরল এক সেপাই।

—থানায় মেজবাবু ডাকছেন।

—আমাকে?

—আজ্ঞে।

ধনঞ্জয়ের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। এক-দুই-তিন-চার হাতুড়ি পিটছিল। কেন? হঠাৎ তাঁকে তলব কেন? অজয়কে কি ধরবে? অজয় কি কিছু করেছে? তাঁকে তলব কেন?

—হাটটা সেরে আসি?

—ঘুরে গেলেই ভাল হত মাস্টারমশাই।

ধনঞ্জয়কে সবাই 'মাস্টারমশাই' বলে।

লেখাপড়া শিখায় যে, মাস্টার হয় সে।

—চল তবে। সাইকেলটা নিয়ে এস।

ধনঞ্জয় অনেক চেষ্টায় নিজেকে শান্ত রেখে থানায় ঢুকেছিলেন। থানাটিকে কাঁঠালবাড়িও বলা হয়। জমিদারি সেরেস্তার হাতায় অনেক কাঁঠাল গাছ ছিল। মেজবাবু গাছের কাঁঠাল খান। বিলি করেন। শোনা যায় গরু ছাগলের জন্য কাঁঠাল পাতাও বেচেন।

সেরেস্তাবাড়িটি দেখতে খুব সুন্দর।

মেজবাবু ওঁকে কি খাতিরটা দেখালেন।

—বসুন মাস্টারমশাই, হাটে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ মেজবাবু।

—কি কিনবেন, কাপড় চোপড়?

—এক জোড়া ধুতি, আরও সওদা আছে।

—সত্যি, আপনাদের গ্রামটা বড় বেজায়গায়।

—রাস্তা তো নেই। এত দরখাস্ত দিচ্ছি পাঁচটা গ্রামের মানুষ। পথ নেই বলে এত কষ্ট।

মেজবাবু সামান্য হেসে বললেন, রাস্তা এবার হয়ে যাবে।

—খবর পেয়েছেন?

—রাস্তা তো আমাদেরই দরকার এখন।

—বুঝলাম না।

—রাস্তা হবে। আউটপোস্ট বসবে আরও। দুর্গম বলে এদিকে কিছু ফেলে রাখা ডেন্‌জারাস এখন !

—ডেন্‌জারাস ?

—হ্যাঁ মশাই, বিপজ্জনক।

মেজবাবু চিকণ হাসি মেখে চেয়েছিলেন।

—চা চলবে ?

—না···তেমন খাই না। একটু জল খাব।

—অবশ্যই। ওরে ! জল দে !

জল খেলেন ধনঞ্জয়, মুখ মুছলেন।

—ব্যাকওয়ার্ড জায়গার সুবিধে অসুবিধে দুই আছে। আপনি ভাবছেন দুঃখে আছি। দুঃখে আছেন, না সুখে সে কি আপনিই জানেন ?

— ঠাট্টা করছেন ?

—ঠাট্টা ? আপনার সঙ্গে ?

হঠাৎ মেজবাবুর মুখ দিয়ে ফরফর করে বক্তৃতা বেরিয়ে এসেছিল গলা না তুলেই তিনি বলে যেতে থাকলেন অনেক কথা।

—ব্যাকওয়ার্ড জায়গাই ভাল। এই রকম ব্যাকওয়ার্ড জায়গা সব ছোট ছোট চাষী, মস্ত জোতদার নেই, বিরাট মহাজন নেই জমিজমা নেই প্রধানত লোধাদের···

—আরও অনেকের।

—অবশ্যই অবশ্যই। তবে যা বলেন, লেখাপড়াও কম। আ এমন দুর্গম নয় যে বাইরে থেকে সব ডেন্‌জারাস ছেলেরা এসে ঢুকে যাবে, নাশকতামূলক উসকানি দেবে। সাঁওতালদের ক্ষ্যাপাবে·· ডেন্‌জারাস !

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না মেজবাবু।

গভীর আবেগে মেজবাবুর কপালের আবটি কেঁপেছিল।

কপালের আব ! বছর তিনেক আগে মেজবাবু কলকাতা

বেহালায় বাড়ি তৈরি করে উঠে যান। বউ, তিন মেয়ে, ভরা ভর্তি সংসার। দেখে এসে গণপতিবাবুর ছেলে বলেছিল, মেঝে যেন দুধে ধোওয়া। একতলা ভাড়া, দোতলায় থাকে। টেলিভিশন আছে। মেজবাবু এখন একটা বড় কোম্পানিতে সিকিউরিটি অফিসার। রমরমা খুব। বাড়ির নাম 'শান্তি কুটীর'।

শান্তি কুটীর মেজবাবুকে শান্তি দিতে পারেনি। কপালের চির-কালীন আবটি সঙ্গে নিয়েই মরতে চেয়েছিলেন উনি। আবটিই ওকে সারল। সেই আব হয়ে গেল ক্যানসার। তারপর মেজবাবু এ সংসার কর্মশালা থেকে বিদায় নিলেন। গণপতির ছেলে বর্তমানে এক মিনি নেতা। খবরাখবর রাখে, কলকাতা দৌড়য় ঘনঘন।

সেদিন মেজবাবু আব কাঁপিয়ে এবং ধনঞ্জয়বাবুর হাড় কাঁপিয়ে দেন।

—বুঝতে পারছেন না, বুঝতে চাইছেন না? নকশালদের নাম শুনেছেন, নকশাল?

—শুনেছি।

ধনঞ্জয় এ কি বলছেন?

—শুনলেন কোথায়?

ময়ূরেশ্বর ঘুরে যাবার পর ধনঞ্জয় 'নকশাল' শব্দটি বিষয়ে জানার জন্যে আকুল ছিলেন। অবশেষে আশুতোষ দলুই তাঁকে সাহায্য করে। যত কম দেখা বা যোগাযোগ হোক, আশুতোষ খুব সাচ্চা মানুষ। সে তাঁকে 'মেদিনীবারতা' ও 'ঈশান' কাগজ দিয়ে সাহায্য করে।

—শুনিনি, পড়েছি। ঈশান, মেদিনীবারতায় আমি পড়েছি। অন্যান্য কাগজেও বেরিয়ে থাকবে।

—বটে! কাগজ পড়ে জেনেছেন?

—হ্যাঁ। আর কি ভাবে জানব?

মেজবাবু খচখচ করে কলম দিয়ে টেবিলে সাঁটা কাগজে একটি মাছ এঁকে ফেলেন।

—দেখুন, এরা হল সবচে, বিপজ্জনক। এদের রাজনীতিও… সঙ্গে আছে কলকাতার শিক্ষিত ছেলেরা…এদের প্রোগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর। আমাদের ওপর আর্ডার আছে

—এদিকে তো হয়নি কিছু।

মেজবাবু আরেকটি মাছ আঁকেন। উনি কি মাছ খাননি অনেক দিন?

—আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। জানি, অতীতে যা ছিলেন আজও তাই। কংগ্রেসকে ভোট দেন, চাকরি নিলেন না, স্কুল গড়েন। কংগ্রেস করেন বলেই এগুলোকে গুণ বলে ধরা হচ্ছে, নইলে বলতাম ডেনজারাস!

—এ আপনার পরিহাস।

—আপনি বন্দুক রাখেন?

—রাখলে থানা জানত না?

—আপনার জানা চেনা কেউ রাখে?

—প্রথমত, রাখলে আপনারা আগে জানবেন। আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। আমি, পাঁচ সাতটা গ্রামে চলি ফিরি। একটা লোকের নামেও মনে করতে পারছি না যে বন্দুক রাখে।

—কেউ রাখে না?

—আপনি খোঁজ করে জেনে নিন। রাখবে কেন?

—শিকার খেলতে, আত্মরক্ষা করতে।

—শিকার পরবে আদিবাসীরা কাঁড় নিয়েই ছোটে। আত্মরক্ষা করতে বন্দুক রাখবে কেন?

—ধরেন, সম্পত্তি বাঁচাতে? ডাকাত আটকাতে?

—কোথায় ডাকাত? সম্পত্তি বা কোথায়? এক বিঘা থেকে পনেরো বিঘা জমিমালিকানা। সেচ নাই। বৃষ্টির জলে চাষ। জানেন, কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই গ্রামগুলিতে? পোস্টাপিসে টাকা রাখার অভ্যাসও কম? কি আছে ঘরে। যে ডাকাত পড়বে?

তবে হ্যাঁ, অজন্মার বছরে ইচকা ছিঁচকা চুরি হয়। তা সে চুরি যেই করুক। আপনারা লোধাদেরকে ধরেন। আমার গ্রামের লোধাদের জামিন করাই আমি। কয়েক বারই করেছি।

—কেন করেন ও কাজ? ডেন্‌জারাস?

—আপনি কথার বেড়াজালে আমাকে ধরছেন কেন? শালবাড়ির সাঁওতাল, মাহাতো, ভূমিজ, লোধা, সব লোধাড়ি থেকে এসে গ্রামপত্তন। যে যার পাড়ায় থাকে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে একটা মিলমিশ আছেও। বলতে কি, শালবাড়িতে লোধারা অনেক নির্ভয়ে থাকে।

মেজবাবু চুপ করে থাকেন। তারপর নিশ্বাস ফেলেন।

—ছেলে নয়াগ্রাম থেকে এল, না গোপীবল্লভপুর থেকে, সে খবর নিয়েছেন?

মেজবাবুর গলা খুব শাণিত।

—নয়াগ্রাম থেকে।

—আপনাকে প্রথম ও শেষ ওয়ার্নিং দিচ্ছি। ছেলে গ্রামের বাইরে যাবে না। একেবারে গ্রামের ভিতরে থাকবে। কুসমা গেলেও থানায় জানাবেন। এবং সম্ভব হলে ওকে রাজ্যের বাইরে কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমার থানায় কোন অশান্তি নেই। আপনার ছেলের জন্যে নাম খারাপ হলে থানা ছেড়ে দেবে না।

—রাজ্যের বাইরে পাঠাব…এমন কোন নিকটাত্মীয় আমার নেই মেজবাবু। রেজাল্ট বেরবে…কলেজে পড়বে…পড়ায় প্রথম, দ্বিতীয় হয় বরাবর। এবারও ভাল রেজাল্ট হবে বলেই আশা করি।

—পড়ালেখাতেও ভাল? ডেন্‌জারাস। সময় বড় মন্দ মশাই। পড়াশোনায় মেধাবীরা ডেন্‌জারাস, একেবারে অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষররা ডেন্‌জারাস। ছেলেকে শাসনে রাখুন। বাপের দায়িত্ব পালন করুন।

—বলব ওকে। শুধু বলুন, আমার ছেলের বিষয়ে কি কোন

নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে? পরীক্ষা দিয়ে ঘরে এসে কি অপরাধ করেছে?

—আমি যা বললাম তাই করুন গে!

যেন বিরাট ঠাট্টা করছেন। এইভাবে মেজবাবু বলেন।

—এরা কি পাগল না উজবুক? বাইশ বছর ধরে ভারত স্বাধীন, এরা বলে এটা স্বাধীনতাই নয়। গরিবরা না কি মহাজন-জোতদার এদের কাছে পরাধীন। লেখাপড়া শেখার নমুনা তো এই! তা মাস্টারমশাই, আপনার ছেলের নামে সঠিক অভিযোগ থাকলে থানা তো তাকে গুলি মেরে দিত। আমার নাম হত, প্রোমোশান হত, সাইটেশান পেতাম হে হে হে!

আজয়কে মেরে ফেলত মেজবাবু? ধনঞ্জয়ের মুখ সাদা হয়ে যায়। বিপন্ন, মহা বিপন্ন অজয়। বালক ছেলে, কত বিপন্ন তা সে জানে না।

—জানাব। এখনি জানাব তাকে মেজবাবু। আপনি তো আমাকে জানেন। বরাবর ল অ্যাবাইডিং মানুষ। অতি সামান্য কৃষি-জীবী পরিবার। কাপড় কম্বল কেনাও কঠিন হয়ে পড়ে··

—বললাম তো! আরে, ধরে এনে সাবধান করে দিলাম। জানি আপনাকে। সে জন্যেই তো!

গলা নামিয়ে বলেন, তেমন হলে ফলস দিয়ে ধরে আনব, চেপে রেখে দেব। পাঠিয়ে দেবেন বাইরে। পুলিস ইচ্ছে করলে না পারে কি? যান, হাট করুন গে।

'হাট করুন গে' না বললে সেদিন হাটে যেতেন না ধনঞ্জয়। মন্ত্রচালিতের মত কাপড় কিনলেন। টিউবওয়েল মিস্তিরিকে ফিলটার নিয়ে যেতে বললেন। ডাল কিনলেন। মশলাপাতি। কিছু আলু পেঁয়াজ।

পরে শুনেছেন, রূপচাঁদ টুডু তাঁকে ডেকে কথা বলেন, তিনি জবাব দেন নি। কাপড়ের দোকানে নেন নি খুচরো ফেরত।

ধনঞ্জয়ের মাথা তখন অন্ধ।

বাড়ি ফিরে সওদা নামিয়ে বলেছিলেন, অজয় কেথায়, অজয় ?

থানায় মেজবাবু না ডাকলে ধনঞ্জয় বুঝতেন না অজয়ের সঙ্গে কথা বলা কত তীব্র জরুরী।

স্কুলকে অনুমোদন দাও···

পথ করে দাও···

ডাকঘর বসাও···

সেচের জল দাও···

এসব কাজে তো কবে থেকেই ব্রতী। খামের ওপর লেখেন 'তীব্র জরুরী'। কিন্তু নিজের জীবনে আত্মজ সন্তানের সঙ্গে কথা বলা যে 'তীব্র জরুরী' হবে, তা তো ভাবেন নি।

অজয়, অজয়। আঠারো বছর বাদে তোমাকে আজ আকুল হয়ে স্মরণ করছি। আজকের দিনটা একটা বিশেষ দিন। স্কুল নিয়ে লড়তে লড়তে আমরা পৌঁছে গেছি একটা সীমান্তে শালবাড়ি গ্রামের পক্ষে দিনটি বড় গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন বড্ড ভয় পেয়েছিলাম অজয়। মনে হয়েছিল তুমি নিজেও জানো না তুমি কত বিপন্ন।

ধনঞ্জয় চোখে হাত ঢাকা দেন।

মনে আছে, মনে থাকবে সব।

—অজয় বাইরে চল, কথা আছে।

হায়, 'চল' বলতে পারেন নি।

মমতা বলল, চা খাবে, রুটি তরকারি খাবে।

—দাও, তাড়াতাড়ি দাও।

—তুমিও খাবে তো ?

—না !

অজয় বলেছিল, পরেই খাব মা !

—ওখানে বিকালে কি খাস ?

—রুটি লুচি, যেদিন যা হয়।

—চল অজয়।

—ও কি? বাপবেটার কথা ঘরে হয় না?

—বাইরে গেলে দোষ কি?

অজয় ঈষৎ হেসেছিল।

—তাই চল।

বেরিয়ে এসে অজয় বলেছিল, নদীর দিকেই চল। নিরিবিলি আর কোথায়!

—তুমি জানো। আমি নিরিবিলি খুঁজছি?

—জানি বাবা, তোমার মুখচোখ বলে দিচ্ছে।

—ওঃ, অজয়…!

অজয় উত্তর দেয় নি।

মাহাতো ঘর ডাইনে এবং লোধপাড়া বাঁয়ে রেখে নদীর পথ। ভাঁটি জঙ্গল, ঘাস জঙ্গল। নদীর পাড় ধরে দক্ষিণে হেঁটে পাথরের চাতাল বিছানো। চাতাল পাথর থেকে বর্ষার নদীতে ঝাঁপ দেওয়া চলে।

—দাঁড়াও অজয়, এখানেই বসি।

অজয় বসে। সামনে বসে, তবু যেন কত দূরে।

—কি বলবে বল?

—সত্যি জবাব দেবে?

—আগে শুনি।

—তোমার মাতামহ যা বলে গেলেন, তা সত্যি?

—কি বলে গেলেন তিনি?

—তুমি তাঁর বাড়ি ছেড়ে মহাগ্রামে গেছ?

—মহাগ্রামে তো বরাবরই যাই।

—কথা এড়িও না বাপ, তোমার ব্যাগ্যতা করি। যাবার আগে বলেছ, তিনি যেন জমিজমা বিলিয়ে দেন, তিনি গরিবদের শুষে খাচ্ছেন, তোমার মুখে এসব শুনে তিনি…অজয় মাথা নাড়ে।

—তাঁর জন্যে তুমি ভেব না। অনেকের মত তিনিও পথে আসছেন। ধান ছেড়ে দিচ্ছেন। মাথা বাঁচাচ্ছেন।

—তুমি, তুমি কি নকশাল হয়েছ অজয় ?

অজয় নিবাক। বাবাকে দেখছে।

—থানায় ডেকে মেজবাবু আমাকে···

—কি বলেছে মেজবাবু ?

অজয়ের গলা নিচু। একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ও হাতে নাচাতে থাকে।

—কি বলেছে সব বল, চেপে যেও না।

ধনঞ্জয় কোনদিন তাঁর বাবার সঙ্গে এ রকম গলায় কথা বলে নি। অজয় এমন গলায় কথা বলছে কেন ? তুই এত দূরে কেন অজয়। কাছে আয়। মামাবাড়িতে তোর জন্ম। তোর মাতামহের দেওয়া সোনার বোতাম গালিয়ে তার খানিক সরিয়ে রেখে সরু একটা সুতলি চেন দিয়ে তোর মুখ দেখেছিলাম। তোর দিদিমা বলেছিলেন, এর চেয়ে ভারি হার আমি তো ধাইকেই দিয়েছি। বড় অজন্মা ছিল সে বছর। আমার বয়স তখন মাত্র উনিশ। তোর চেয়ে এক বছরের বড়।

—তিনি বললেন, যা বললেন। সন্দেহ করেন তুমি গোপীবল্লভ-পুরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ··

—আর কি বললেন ?

—তোমরা বল, এ স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয় মানে নকশালরা বলে...গরিব লোকরা মহাজন-জোতদারের কাছে পরাধীন হয়ে আছে··· আমি এ সব জানি না কি। তাও জিগ্যেস করে বসলেন।

—তুমি কি বললে ?

—বললাম, 'মেদিনী বারতা' আর 'ঈশান' কাগজে যা পড়েছি তাই জানি।

—ও, ত্রিপুরী সিংরায়কে মারার খবর ? সে তো পুরনো খবর। একমাসের বাসি খবর।

—নরহত্যা, অজয় ?

—তুমি সাপ মার না ?

—সাপ বিষ ঢালে, মানুষ মারে।

—বাবা ! নেচারে সাপেরও ভূমিকা আছে। সাপ মেঠো ইঁদুর খায়। পোকামাকড় খায়। শস্যহানি রোধ করে। ত্রিপুরীরা অন্য জাতের সাপ। তারা বিষ ঢেলেই চলে…

—অজয়, তুমি এ কি বলছ ?

—ওরা শ্রেণীশত্রু।

তুই বুঝছিস না অজয়। মেজবাবু যা বলল… তোর ভীষণ বিপদ হবে …তুই কি বুঝিস রাজনীতির ?

অজয় গভীর বিশ্বাসে বলে, শ্রেণীশত্রু হলে তাকে শেষ করতে হবে।

—শ্রেণীশত্রু কে ?

—যারা কাঙাল গরিব শ্রেণীকে শোষণ করে তারাই শ্রেণীশত্রু। আমার দাদু অত জমি পেল কোথা থেকে ? নিরক্ষর আদিবাসীকে, অন্য জাতকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে।

—জমি থাকলে সে মন্দ ? তা, আমার বাবার যে পনেরো বিঘা জমি আছে, সে শ্রেণী…শত্রু ?

—তোমাকে বোঝাতে পারব না।

—কলকাতার ছেলেরা গ্রামে আসছে, তা সত্যি ?

—সব জানতে চেও না বাবা।

—যাক গে ! তুমি আমার ছেলে তো বটে ?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

—আমি বলছি তুমি ওদের সঙ্গ ছেড়ে দাও।

—তারপর ?

তুই ছোট নেই অজয়, যে 'লজেন দিব' বলে তিত ওষুধ খাওয়াব, 'গল্প বলব' বলে ঠাকুমা ভাত খাওয়াবে। বস্তুত, ছেলেকে ছুঁতে পারছেন না বলে ধনঞ্জয় ক্রমেই মরিয়া হয়ে ওঠেন।

—কলেজে পড়বি, চাকরি করবি।

—তেমন জীবন আমি চাই না।

—মেজবাবুকে মিনতি করলাম, তোর নামে কি অভিযোগ! সে বলল, প্রমাণ থাকলে মেরে দিতাম, আমার নাম হত।

—আর কি বলল?

—বলল, তেমন হলে তোকে ধরিয়ে দিতে। পুলিস তোকে মারবে না। পরে ছেড়ে দেবে।

—পুলিস ছেড়ে দেয় না বাবা।

—আমার খাতিরে বলল, ওয়ার্নিং দিচ্ছি, ছেলে যেন গ্রাম থেকে না বেরয়। সম্ভব হলে রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দিন। আমি কথা দিয়েছি, তুই ওঁর কথা মত চলবি।

—আমার হয়ে কথা দিলে কেন?

—দেব না কথা?

—না।

—পাথর উঠাচ্ছিস। আমাকে মারবি?

অজয় পাথরটা জলে ছুঁড়ে ফেলে।

—বন্দুকের কথা জিজ্ঞাসা করে নি?

—তুই জানলি কি করে?

—বন্দুক এখানে কার থাকবে।

—আমিও তাই বললাম। কি আছে মানুষের, যে তা রক্ষা করতে বন্দুক রাখবে?

—ঠিকই বলেছ। বড় জোতদার বড় মহাজন এখানে কোথায়? মানুষের চেতনাও কম।

—অজয়! তুই বাড়িতে এমনি আসিস নি তবে? এই সব বুঝতেই এসেছিস?

ধনঞ্জয় কেঁদে ফেলেছিলেন।

—বাবা, শোন, আমি মন্দ কাজ করছি না।

—নরহত্যাকে সমর্থন করছ ·

—অত্যাচারী সুদখোর জোতদার-মহাজন...

—স্বাধীন ভারতে এ তোদের কি রাজনীতি ?

—লোধাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে নি তোমাদের ? বাইশ বছরে কত মানুষ জমিভূমি হারিয়ে ভূমিহীন হয়েছে, খবর রাখ ? দেশের মানুষ কি অবস্থায় থাকে, দেখতে পাও না ? না দেখেও দেখ না ?

- দেখি, দেখছি।

—আমি তোমাকে সব বোঝাতে পারব না, নিজে এখনও সব পড়ি নি। কিন্তু দাদুর কাছে রেখেছিলে, ছোট চাষী, ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর, এদের উপর কি অত্যাচার চলে তা স্বচক্ষে দেখেছি।

– তুই বল, গ্রাম ছেড়ে বেরবি না।

—চল। বাড়ি চল।

—বড়লোক, একটা মরলে আরেকটা আসবে। গোবিন্দ মহা-পাত্রকে দিয়েই দেখ। তোমরা কতজনকে মারবে? নরহত্যা বলে কথা! সরকার তো ছাড়বে না।

অজয় বলেছিল, সরকার, পুলিস, সব তো ওদের জন্য। যাক গে, বাড়ি চল।

—তুই কথা দিচ্ছিস তো ?

—ভাবি খানিক।

—গ্রামে থেকেই ভাবনা করবি তে

—বাবা, তোমার এত ভয় !

—তোমার প্রাণটা থাকলে তবে তো কাজ করবে !

—সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব...যাক গে, চল।

—না, তুমি কথা দাও।

- না ভেবে আমি কথা দেব না।

—বেশ, সময় নাও। কাজ তোমাকে আমরাই দেব অজয়। একটা স্কুল সংগঠন করব। টীচার তো চাই !

ধনঞ্জয় আন্তরিক বিশ্বাসে বলেছিলেন, এটাও কাজ রে অজয়। শিক্ষা বিস্তার...ওদের তো চোখ ফোটা চাই। শালবাড়িতে চলে এলাম কেন? লেখাপড়া জানি না। জমির ব্যাপারে রেকর্ড দলিলে কারচুপি হয়ে যায় তা বুঝিনি। যত অজ্ঞ থাকবে, ততই বড় বড় মানুষেরা ঠকাবে।

অজয়কে কিছুই স্পর্শ করছিল না।

—অজয়! সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে দেখা যায় যে সব নাম, সে তো আদিবাসী নাম যত। লোধাডি, লোধাগেড়িয়া, মুর্মুর দোয়েম, তাতেই তো বোঝা যায় এরা সব উচ্ছেদ হয়ে গেছে।

—বাবা! তোমার বিশ্বাসে তুমি কাজ করো, ভাল আমাকে আমার বিশ্বাসে...ভাবতে দাও। চল বাবা, বাড়ি চল।

বাড়ি এসে অজয় রুটি তরকারি খেয়েছিল। পূর্ণিমাকে অঙ্কের মজা শিখিয়েছিল। কোন বড় সংখ্যা এগারো দ্বারা বিভাজ্য, কোন সংখ্যা নয় দ্বারা বিভাজ্য. দুটি সংখ্যার ভাগফল যা, বিয়োগ ফলও তাই।

ধনঞ্জয় খুব নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

মমতা ও মার প্রশ্ন, আবার চলে যাবে না তো?

—আর যায়?

ধনঞ্জয়ের বাবা কুলেন্দ্রচন্দ্র মাহাতো, ধনঞ্জয় ডাহিপাড়া স্কুলে কাজ নেবেন না, গ্রামে স্কুল সংগঠন করবেন এ নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন।

তিনিও বললেন, হ্যাঁ, গ্রামে স্কুল হবে, তাতে পড়াবে। তারপর ফল বেরলেই কাজের চেষ্টা করবে। থাক্ এখানে তুই। কাজ পেলেই বিয়ে করাব, ঘর তুলব আরেকটা। ঠিকুজীতে আছে নাতির ঘরে পুতি দেখে যাব, সে কি মিথ্যা হতে পারে?

বাবা দড়ি পাকাচ্ছিলেন। পাকাতে পাকাতে বললেন, বাপ ধমকধামক দিলে ছেলে শুনবে অবশ্যই। আমার বেটার বুদ্ধি কত! বয়সের ছেলে। সকলের সামনে বকলে দাদুভায়ের লাজ লাগত। তাই অড়ালে নিয়ে...

আনন্দে মা বললেন, বিয়া করাব তো বউয়ের মত বউ চাই। পায়ে মল পরে ঝমর ঝমর ঘুরবে।

অজয় বলেছিল, বিয়াতে কি নেবে গো ঠাম্মা ?

—তোকে সাইকেল, ঘড়ি, বোতাম দিবে। আর যেমন দেয়, যৌতুক দান দিবে। আর...

—পণ নিবে না ?

—দূর দূর ; তোর যত ঠাট্টা।

অজয় পূর্ণিমাকে বলেছিল, তোর বইগুলো নিয়ে মা আর ঠাম্মাকে শিখাবি।

—ওরা আমার কথা শুনলে তো ?

—তুই অনেক পড়িস পূর্ণিমা।

—বাবা ইস্কুল করুক।

ধনঞ্জয় বলেছিলেন, প্রাইমারি পাশের পর পড়বে কোথায় ? পাঁচ ক্লাসে পড়ার স্কুল নেই ? গ্রামের গরিবের জন্য চার ক্লাসই যথেষ্ট।

— উচ্চশিক্ষা ওই শ্রেণীর জন্য।

—অথচ আমাদের কাছে পড়ে যে ছেলেটা যায়, সে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে জায়গা পায়। অর্গানাইজিং স্কুল অনুমোদন পেতে চায় বলে সেখানে পড়াটা ভাল হয়। এটা ঘটনা।

—তুমি কি ডাহিপাড়ার স্কুলে যাবে না।

—অজয় ! তাহলে এখানে স্কুল হয় না। প্রাইমারি স্কুল নাকি হয়ে যাবে...

—সরকার এখন রাস্তাও দেবে। জীপ তো চলা চাই। পুলিস চৌকিও বসাবে। লোক দেখানো কিছু স্কুল। কিছু টিউবওয়েল, অনুন্নত এলাকা, এস টি এলাকার জন্য যত টাকা তার এক আনা উন্নয়নে খরচ করবে।

অজয় ওর খেলাধুলা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এ সবের মেডেলগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিল।

পূর্ণিমা সগর্বে বলেছিল, বাবা পালিশ এনে দিয়েছে, আমি সব সোনার মত করে রেখেছি।

মমতা বলেছিল, কাল চুল দাড়ি কাটবি, ফর্সা কাপড় পরবি। ই কি, কেমন চেহারা ?

খুব হেসে বলেছিল, তোর জামাকাপড় কাচলাম, তো পরমি কাকী বলে, রংটা যা গোরা। নইলে ওই জামাকাপড় পরে তোমার বেটা আমাদের ঘরেই থাকতে পারে।

পরে তো বোঝা যায়, ওদের ঘরে থাকতেই শুরু করেছিল অজয়, তাই ওই কাপড় পরত, খালি পায়ে চলত।

শেষ সন্ধ্যায় সাওনা শালপাতায় বেঁধে একটি মোরগ কেটেকুটে দিয়ে গেল।

—মা দিল! ভাস্তা খাবে।

পরমি যদি সম্বোধনে "কাকী", সাওনা আর ধনঞ্জয় তবে গ্রাম ভাই, আর অজয় সাওনার ভাস্তা।

অজয় বলল, তবে আর কি! মাংস আর ভাত। সাওনা কাকা! তুমি তোমার বাবার মত অষুদপালা জান না ?

—না ভাস্তা। জানা শোনা মানুষ নাই, কে শিখবে? চামটু বাবাকে অষুদপালা এনে দিত, সেও জানত। কিন্তু শাল জঙ্গল কাটি সাফ করে সরকার, অষুদ গাছ জন্মে না। ধনঞ্জয় দাদা! ধড়াধড় গাছ কাটে! রাস্তা হবেক, রাস্তা!

অজয় ওর বাবার দিকে তাকিয়েছিল।

—সরকারের মতিগতি উলটাপুলটা। হোই ধাদড়াচকা, বাতিরবন্ অত দূরে রাস্তা লিছে আখুন! আগে শৎ আর্জিতেও শুনে নাই। যাক, মানুষ কিছু কাজ পাবে। মাটি কাটবে কে, পাথর ভাঙবে কে? সেই আমরা। পাঁচ টাকা রোজ দিবে।

সওনা মাথা নেড়ে নেড়ে চলে গিয়েছিল।

—কি বোঝ, বাবা ?

—যা হয় হোক। তুই কাছে থাক।

বড় আনন্দে মাংস ভাত খাওয়া হয়। অজয়ের প্রিয় খাদ্য, চালগুড়ির রুটি, চিনাবাদামের পায়েস।

মমতা বলে, খেয়ে মেখে ঘরে থাক। মলয় আসবে এবার। তুই ভাই একসঙ্গে বসবি, খাবি।

পূর্ণিমা বলে, সে খুব সাহেব হয়েছে। গোবরের গন্ধ নাকে লাগে, লণ্ঠনের আলোয় পড়তে পারে না।

অজয় হেসে বলে, যেমন শিখতে দিয়েছ, তেমন শিখছে। কেষ্ট, মেজ মামার ছেলেটা, জামসেদপুরে মামার কাছে আছে। সে গ্রামে আসতেই চায় না।

মমতা সদুঃখে বলে, আমাদের কেউ নাই দূর দেশে যে বেড়িয়ে বাঁচব। মানুষের তো থাকে।

পরে অবশ্য মমতার সে দুঃখ থাকেনি। মলয় ও পূর্ণিমা মাকে পুরী, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, সব দেখিয়েছে।

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর ধনঞ্জয়, উদ্বেগ মুক্তিতে হতক্লান্ত হয়ে শুয়েই ঘুমিয়ে যান। তিনি এক চৌকিতে, অজয় এক খাটিয়ায়। ভিতরের এক ঘরে মমতা আর পূর্ণিমা, আরেক ঘরে বাবা মা। সাধারণত বাবা এই ঘরে শোন। মা শোন পূর্ণিমাকে নিয়ে। ধনঞ্জয় ও মমতা থাকেন ভিতরের ঘরে। সে ঘরের চৌকির নিচেই সব থালা বাসন থাকে। মায়ের ঘরের কোণে ও মাচানে ধান চাল।

খুব, খুব ঘুমোচ্ছিলেন ধনঞ্জয়। লোহার বাসরে বেহুলার কালঘুম যেন। ভোররাতে গ্রামের পথে কুকুরগুলো কি ডাকছিল? কিছুই জানেন না তিনি।

ঘুম ভাঙতে দেখেন অজয় বিছানায় নেই।

বাইরে থেকে ঘুরে এসে বললেন, অজয় কোথায়?

—ঘটি নিয়ে তো গেল।

তার অনেক পরে দেখেছিলেন ওর ঝোলা নেই। কাল যে

ধোয়ানো ধুতি পরেছিল, সেটি ভাঁজ করে রাখা। এক টুকরো কাগজও নেই। কিছু লিখে রেখে যায়নি।

ছুটে গিয়েছিলেন নদীর পাড়ে। নেই, নেই সে কোথাও। নদীর বালি ও জল পেরিয়ে কতটা হেঁটে ধুরাবাড়ি বাস ধরা যায়।

সাবধানতা ভুলে সেখানেও ছোটেন ধনঞ্জয়। না। ধুরাবাড়ি থেকে ওঠেনি। মাঝপথে কোথাও হাত তুলে বাস দাঁড় করিয়ে···

কোথায় যাবেন, কাকে বলবেন? ওজবাবুকে ভাল কথা বললেও সে গ্রামে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অজয়ের কারণে গ্রামে পুলিস ঢুকেছে এ কথা তো নিমেষে ছড়াবে।

নদীটা যদি কথা বলত!

নদীর ধারে ওই চেটাল পাথরটায় কালকেই···

— অ ভাস্তা!

চমকে উঠেছিলেন ধনঞ্জয়।

—পরমি কাকী?

—চমকে গেলি কেনে? বেটা মাঁস খেল?

—খেয়েছে।

—ভাল বেটা তুর। তুর মত।

তারপর মাটির দিকে চেয়ে গলা নামিয়ে বলে, আন্ধার কাটে নাই, সে চলি গেল গো! আমি ছাগলটো কাল হতে পাই নাই, আজ বেরাছিলাম। পেলম নাই। কিন্তুক তারে দেখলম।

—কথা বলেছিলে?

—ডাকলম, সাড়া দিল নাই।

—এ কথা কাউকে বলো না কাকী।

—তাই বলি? আখুন কথা হতে আগুন লাগি যায়। তুর বেটা কথ কথা জানায়ে গেল···

—তোমাকে?

—আর কারে? আমি, সাওনা, চাঁপা, দুখাই, নেতাই, শুনি নাই কে? অ্যানেক কথা!

পরমি চলে গিয়েছিল।

সকলকে সব কথা বলে গেলি, বাবাকে বিশ্বাস পেলি না। এখন আমি কি করি?

বাড়িতে সবাই বিভ্রান্ত।

মমতা বলল, আমি নয়াগ্রামে যাই।

—লাভ নেই। সে নয়াগ্রাম যায়নি। শোনো, যে জিগ্যেস করবে, বলো মাসির বাড়ি গেছে। মেজদি তো বাঁকুড়া থাকেন। বোল সেখানে গেছে।

—নয়াগ্রাম, কি হয়েছে সেখানে?

—আমাকে জিগ্যেস করো না।

—নয় তুমিই যাও।

—সেখানে সে অনেক দিন নেই। তোমার বাবা তাই বলে গেলেন। সে আছে দূরে, বন্ধুর বাড়ি।

—সন্নেসী হয়ে যাবে না কি?

—এখন চুপ কর, দয়া কর আমাকে। বিশ্বাস কর, কাল পা ধরতে বাকি রেখেছি শুধু। আর, যদি জানতাম নয়াগ্রাম গেলে তাকে পাব, এখনি যেতাম। এখন বাড়িতে থাকা দরকার, এলে এখানেই আসবে। এদিকে তো কোনও হাঙ্গামা নেই।

—কিসের হাঙ্গামা?

—ওদিকে জমি জমা নিয়ে নানা হাঙ্গামা। তোমাদের পায়ে ধরি, যদি তার প্রাণের মায়া কর, চুপ করে থাক। আমি যাব ঝাড়গ্রাম. আশুতোষকে পাঠাব। ওর যাওয়া-আসা আছে, খবরাখবর রাখে।

ধনঞ্জয়ের বাবা দাওয়ায় বসে পড়লেন।

—কাল রাতে কে বলবে ছেলে ভোর হতে পলাবে......

আশুতোষ দলুইয়ের জীর্ণ ঘরখানি আজ ঝাড়গ্রামের উপকণ্ঠে। সেদিন ছিল সুদূর দক্ষিণে। ঝাড়গ্রাম শহরও তো পরিকল্পনাহীন-ভাবে বাড়ছে, ছড়াচ্ছে।

ছোটখাট ক্ষীণদেহ মানুষটি ধনঞ্জয়কে ভাত ডাল রেঁধে দেন। শান্ত করেন।

—তুমি আবাল্য সাথী ধনঞ্জয়। বল তো যাব। আমার বোন তো ওখানেই শ্বশুরঘর করে। কিন্তু যাব যে, খোঁজও করব, তার ভাল হবে না মন্দ হবে?

—সে আর ফিরবে না ভাই। শুধু খবরটা...

—ওঃ, গোপীবল্লভপুর কেঁপে গেছে।

—কি রকম?

—খুব গরম, পরে বলব। দেখ! এই ছেলেরা দেশের জন্যে জীবনটাই দেবে। আমরা কি করলাম! আমি ভাই, খুব উৎসাহ পেয়েছি।

—আমি কি কিছুই করিনি? চাকরি পেয়েও নিইনি, গ্রামে শিক্ষা বিস্তার, তাদের সুখদুঃখে থাকা...

—তোমার আমার পথ এক, ওদের পথ আরেক। শোন, কলকাতা থেকে ছেলেরা এল কেন?

> কিষাণের ধান, আমার কবিতা
> অল্প মূল্য জানি,
> তার ঘামে, আর আমার রক্তে,
> ভিজে গেছে রাজধানী...

—আশুতোষ! ছেলেটার খবর এনে দেবে?

—খবর আনতে পারব এমন দাবি করি না। চেষ্টা করব কথা দিলাম। কোথায় যেতে পারে?

—মহাগ্রাম যেত। শান্ত গিরি, কান্ত গিরি...

—মহাগ্রামে এখন ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল নেমে গেছে ভাই!

সংযুক্ত বামফ্রন্ট সরকার খুব কড়াকড়ি চালাচ্ছে। আর কান্ত গিরি তো ওয়ান্টেড।

— তারা কোথায়?

— সাঁওতাল গ্রাম সব! কে কোথা ঢুকে গেছে!

— তুমি যেয়ে কিছু করতে পারবে না? আশুতোষ নিশ্বাস ফেলে।

— যাব। ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়। তবে যাব দিন তিনেক বাদে। ওখান থেকে সিধা শালবাড়ি।

— তাই কর. কোনও খবর পাই! থানার মেজবাবুকে বা কি বলব?

— বলবে বা কেন?

— সে তো প্রথম সুযোগে অজয়কে মেরে দেবে সন্তানের পিতা নও আশুতোষ! বুঝবে না।

— আমাকে কে মেরে দেবে ভাই? চাল চুলো নেই। কবিতা লিখি। গান বাঁধি...

— পেট চলে কি করে?

রজনীর যাত্রা পালায় গান লিখি, দু'পাঁচ টাকা দেয়। চাল দেয় মাঝে মাঝে। আজ আছে তো খেলাম।

— বাস ভাড়াটা রাখ।

— দেবে? দাও!

— কিন্তু আশুতোষকে তো কিছু করতে হয় নি। আশুতোষের জ্বর হয়ে গেল। তাতে চারদিন গেল। তারপর বাস ভাড়ার টাকা খরচ হয়ে গেল, সে টাকা যোগাড় করতে তিন দিন। তারপর আশুতোষ গিয়েছিলেন।

তার আগেই তো মেজবাবু সেপাই দিয়ে তাঁকে থানায় ডেকে পাঠায়।

—কোনও কথাই শোনেন নি!

গল্পটি একেবারে রুক্ষ নয়।

—হয় ভাল কথা শোনার দিন নাই, নয় বলার দিন নাই। যাক গে, খুব আফসোস। বড়ই আফসোস যে আন্তরিক ইচ্ছে থাকলেও আপনার উপকারে আসতে পারলাম না।

বিরতি।

—আপনার ছেলেই উপকার করতে দিল না।

বিরতি।

—আপনাকে একবার গোপীবল্লভপুর থানায় যেতে হবে। এক্ষুনি যাবেন। সঙ্গে আমিও যাব।

এ সমস্তই অবাস্তব, অলীক। কে কাকে কি বলছে? এটা বিড়াগ্রাম তো? ওই যে শিশুগাছগুলো দেখা যাচ্ছে, তার পাশেই তো গেট, যে গেট দিয়ে ধনঞ্জয় স্কুলে যেতেন। সামনে মহাত্মা গান্ধীর ছবির নিচে তো মেজবাবুই বসে আছেন।

ধনঞ্জয়ের বিশ্বপৃথিবী টলে যায়। তিনি টেবিলের কোণা চেপে ধরেন।

—জল খাবেন?

—দিতে বলুন।

—জল খেয়ে…সাইকেলে বড় সড়কে পড়ব। জীপ থাকবে সেখানে …অন রিকোয়েস্ট…ছি ছি আমার থানায় কিছু ঘটল না। আমার থানার ছেলে…ঘরের ছেলে ঘরে থেকে পড়ত? তাকে ওখানে দিলেন বা কেন?

—বাড়িতে কি বলে আসব?

মেজবাবু সম্পূর্ণ অচেনা গলায় বলেন, বাড়ি এখন যাবেন না। ব্যাপারটা তীব্র জরুরী।

তীব্র জরুরী। তীব্র জরুরী। বড় সড়কে সবুজ-খাকি জীপ। ধনঞ্জকে জীপে উঠতে দেখে চেনাজানা লোকজনের মুখে একই সঙ্গে

বিস্ময় ও কিসের যেন পর্দা নামে।

ধনঞ্জয় পাথর হচ্ছেন। কঠিন হচ্ছেন। ভীষণ ভারি। নিজের হাত-পা টানতে পারবেন না যেন।

যে সব পথ ও গ্রাম দিয়ে যান, সে সব কি আগে কখনও দেখেছেন?

জীপ থামে।

—এসে গেলাম?

—না, চা খাব। খাবেন তো?

—না, চা খাব না।

—খাবেন। চা খাবেন, বিস্কুট খাবেন।

—পারব না।

—পারুন, চেষ্টা করুন।

চা-দোকানীর ডাকে একটি সিড়িঙ্গে মত লোক এগিয়ে আসে। মেজবাবুর সঙ্গে কি কথা বলে।

মেজবাবু মাথা নাড়েন গভীর বিস্ময়ে।

—ডেন্‌জারাস! খুব ডেন্‌জারাস।

চা ও বিস্কুটের দাম দেন না। দোকানী ট্রানজিস্টার শুনছে। মেজবাবু তেতে বলেন, শুনছ কি?

—কটক স্টেশন সার।

শুনতেই হবে? কানের কাছে শব্দ···উলঙ্গ প্রায় শিশু কয়েকটি পথের ধারে। বছর আষ্টেকের একটি বালিকার মাথায় কাঠের ছোট বোঝা। কুঁচলতায় ফুল। কোনও একটি পাখির গলায় অবিশ্রান্ত ডাক। এ সবই আছে, কিন্তু তিনি, ধনঞ্জয় মাহাতো কোথায় যাচ্ছেন?

অবশেষে ওঁরা একটি একতলা বাড়ির সামনে কোনও এক সময়ে থামেন। পুরনো ধাঁচের একতলা বাড়ি। ফটকে লেখা "বিরডিহা দেবেন্দ্রবিজয় দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ১৯৪৪।" হোমিও চিকিৎসালয়ে কেন?

—এটা কি…?

—গোপীবল্লভপুর থানার অধীন। বর্ডার। বর্তমানে ক্যাম্প পড়েছে। নামুন।

নামেন ধনঞ্জয়। লম্বা, পেশল দেহ এক অফিসার। পুলিস? কি যেন রাইফেল্‌স?

মেজবাবু এগিয়ে যান ও নিচু গলায় কি বলেন।

কিছু সেপাই একটি জায়গা ঘিরে রেখেছে। কম্পাউণ্ডে বসে আছে নির্বাক মুখে সাঁওতাল বুড়ো বুড়ি, মেয়ে, শিশু, কয়েকটি বালিকা।

অফিসার বলেন, জাত বটে! মুখ যখন খুলবি না, তখন থাক্ বসে গোটা দিন রাত। আসুন।

সেপাইরা সরে যায়।

—দেখুন।

পর পর শায়িত তিনটি দেহ।

—অজয়!

—কোন জন?

বলতে হয় না, ধনঞ্জয় আছড়ে পড়েন। অজয় নির্বাক, একটু স্ফীত। হাত চিতানো।

—তা হলে খবর ঠিকই। এ অজয় মাইতি ফ্রম ইওর থানা, (পায়ের বুট মাথায় ঠোকেন) এটা জিতু টুডু, সেকেণ্ড ওয়ান নিশ্চয় কলকাতার। ইনি শনাক্ত করেছেন তো?

কণ্ঠস্বর ধনঞ্জয়ের কানে ক্ষীণ হয়ে আসে। ধনঞ্জয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। মেজবাবুর গলাটাও ফেডআউট করে যায়, বাবা নিপাট ভালমানুষ স্যার, ছেলে থাকত নয়াগ্রামে…সেদিন বাড়ি গিয়েছিল… বললাম বাড়িতে থাকতে…কিন্তু…

সিনেমার চেয়ে অনেক লম্বা ফেডআউট।

পরের সবই গোলমেলে।

আজও মনে আছে সব।

মেজবাবু বলেছিলেন চুক্ চুক্ শব্দে সমবেদনা জানিয়ে, জীবনে ধরিস নি মাল, অ্যাকশান করতে গেলি··· করলি···অতজনকে সাক্ষী রেখে···কেশব ছেলেটাই লীডার ছিল···জিতু টুডু লোকাল ছেলে··· কি সব ছেলে তোরা? জিতুর পরিবারও উচ্ছেদ হবে। আর আপনার তো মহা সর্বনাশ। তায় লোকলজ্জা কেলেঙ্কারি...

পরের পর্যায় গোপীবল্লভপুর। পুলিস পাহারায় সৎকার। তারপর ঘরে ফেরা। মেজবাবু পৌঁছে দিয়ে যায়। শালবাড়িতে কোনও লোক ঘরে ছিল না। সবাই পথের পাশে।

—কি লজ্জা, কি কেলেঙ্কারি!

ধনঞ্জয় সবিস্ময়ে মেজবাবুর দিকে তাকিয়েছিলেন। লজ্জা? কেলেঙ্কারি? "অজয়" নামের সঙ্গে ও দুটো শব্দের সংযোগ কোথায়? অফিসার বলেছেন, ফার্স্ট অ্যাকশান করতে গিয়েই অজয়রা নিহত হয়। ই এফ আর ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পকে তুচ্ছ করে অ্যাকশান করার গুরুত্ব ছিল। অজয় ভলান্টিয়ার করে। লালমোহন করকে মেরে ওরা পালায়। তারপর রীতিমত খণ্ড সঙ্ঘর্ষের পর যখন সব চুপচাপ হয়ে যায়, ওদের তিনজনকে পাওয়া যায়। একা অজয় তখনও জীবিত ছিল। সে বলে, শ্রেণীশত্রু তো খতম।—অ্যাণ্ড হু ওয়াজ ইওর লীডার?—কেন, আমি?—বলে অজয় মরে যায়।—ওকে বাঁচানো গেলে হয়ত আরও জানা যেত।

বাড়ির দিকে হেঁটে এসেছিলেন সোজা মাথায়।

বাড়িতে উতরোল কান্না।

তারপরও সব খুব গোলমেলে।

এক সময়ে পূর্ণিমা ফিস ফিস করে বলেছিল, পুলিস খুব খুঁজেছিল দাদার কাগজপত্র আছে কি না। অঙ্কের খাতাটা আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম বাবা।

অঙ্কের খাতাটা জীর্ণ ও মলিন হয়ে আজও আছে। অজয়ের হাতে লেখা ওইটুকু।

নয় আর এগারোর ভাগের অঙ্ক।

কোন দুটি সংখ্যার ভাগফল যা, বিয়োগফলও তাই?

আর ওই ছবিটা।

অনেক পরে স্কুল ম্যাগাজিন থেকে

অনেক পরে। অজয়কে জানবার আগ্রহ থেকে ধনঞ্জয় একটি বই যোগাড় করে কিছু পড়েছিলেন। সেদিন ওঁর বাড়িতে আশুতোষও বসেছিলেন বাইরে।

বসেছিল পরমি কাকী।

আশুতোষ থেকেই গেলেন দু'তিন দিন। গ্রামের লোকজন তাকে ত্যাগ করে নি।

চন্দ্র সিং বলেছিলেন, ভূমিজ, লধা সাঁওতাল, তেলি, তামলি, কোড়া, কোনও ঘরে যেতে বাদ রাখে নি এ কয় দিনে। যদি জানি কি হতে চলেছে, তখনি আটকে রাখি।

রূপচাঁদ টুডু বলেছিলেন, লড়াই করেছে, মরে গিয়েছে, মেরে তো মরেছে।

চামটু মল্লিক বলেছিলেন, লধার খবর কে করে? লধাকে মানুষ কে ভাবে? সে ভাবত। সংবাদ নিত।

আশুতোষ দলুই ধনঞ্জয়কে বললেন, তোমার বাবা, মা, স্ত্রী তো বুঝেন না। শোকে পাগল, ভয়ে অস্থির। কিন্তু ধনঞ্জয়! ছেলেগুলো অগ্নিসন্তান বটে! আহ! জীবনের মায়া জানে না। রাজনীতি করে দুর্নীতি করে না, গদীর কথা ভাবে না, কৃষকের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়ে লড়াই...গর্বের কথা বটে।

আশুতোষ আজ লোক কবি আশুতোষ।

সেদিনই শুনেছেন ধনঞ্জয়, কপট সংগ্রামী ও সুবিধাবাদীদের বিষয়ে সে লিখেছে, "সত্যই সংগ্রামী যদি, অস্ত্রচিহ্ন শরীরে কোথায়?"

এখনও দেখা হয় মাঝে মাঝে। কথা হয়। সে অজয়দের স্মরণে "অজেয়" লিখেছিল।

সেদিন থেকে ধনঞ্জয় দীর্ঘদিন মৌন মূক ছিলেন।

মেজবাবু কিছুদিন যাওয়া আসা করতেন। ডেকে পাঠাতেন। অজয়ের পিতা তিনি। এটা রুটিন এনকোয়ারি। থানাকে ভিজিলেণ্ট থাকতে হবে।

কিন্তু সে দশকে আন্দোলন ডেবরা-গোপীবল্লভপুর-খড়গপুর লোকাল. শাঁকরাইল-কেশপুর ও চাকুলিয়া থানাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মেজবাবুর প্রত্যহ শিবকে ফুল চড়ানো সার্থক হয়। তাঁর থানা, আশপাশের কয়েকটি থানাই ছিল নীরব। ক্ষোভ ছিল, আন্দোলন গড়ে ওঠে নি।

মেদিনীপুরের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে পথ তৈরি হয় পুলিস মিলিটারি জীপ চলার জন্যে। শালবাড়ি নির্বাসনের দূরত্ব থেকে কাছে আসে ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুরের।

বিস্ময়, বিস্ময়।

এ গ্রামে পনেরো মিনিটের জন্যে আসেন বীরেন্দ্র মহাপাত্র। ধনঞ্জয়কে বলেন, তোমার ছেলের ব্যাপারটা ভেরি স্যাড। শালবাড়ি গ্রামের কথা আমি মাথায় রেখেছি। আমার নির্বাচনকেন্দ্রের মধ্যেই তো। সামনে না হোক, পরের বছর নির্বাচন। গ্রামগুলোর উন্নতি না হলে....প্রাথমিক স্কুল এবার হয়ে যাবে।

নির্বাচনে জেতার পর, আবার নির্বাচন আসার বছর খানেক আগে নির্বাচিত সদস্যের গ্রামে আসাটা এমন অভূতপূর্ব ঘটনা, যে শালবাড়ি তোলপাড় হয়ে যায়।

পরমি কাকী আসে বিকেলে।

—উ আসবে তু জানছিলি?

—না কাকী!

—তা ভোমা মেরে বসে থাকলে তো চলবে না ভাস্তা। তু উঠ,

সেচখালটা কাটাই দিক, আর ইলেটিরি লাইন পথে দিক, আর যা ঝাড়গ্রামে, খবর লিয়ে আয় আমাদের কুয়া দিবে কবে! তুই বসি গিছিস, আমরাও বসি গিছি। দেখ্, সে নাই। কিন্তুক খিদাটাও আছে, কাজকামও আছে, কিছু তো লিয়ে যায় নাই!

ধনঞ্জয় বুঝেছিলেন, পরমি কাকী ঠিক বলেছে।

জীবন আছে, কাজ আছে, জীবনের সব প্রয়োজনই আছে।

চার

ধনঞ্জয় আগে গিয়েছিলেন ডাহিপাড়া

তাঁকে দেখে পঞ্চানন ও প্রণব প্রথমটা অস্বস্তিতে পড়েন। ধনঞ্জয় বলেন, চাকরিটা আছে তো?

—চাকরি আছে, তুমি নাই।

—দেখুন, সকলের চেষ্টায় স্কুল...তাতে আমিও ছিলাম...কিন্তু...

—তোমার ছেলের ব্যাপারে তোমার···কি বলব বল? তার কপালে ওই আঠারো বছর মাপা ছিল।

—কাল হতে জয়েন করব। কিন্তু আপনারা আরেকজন শিক্ষক খুঁজুন।

—কেন হে? শালবাড়িতে স্কুল হবে তা জানি। সেখানে জয়েন দেবে?

—না কাকা! স্কুল দেবে যখন, শিক্ষক ওরাই দেবে। বিড়াগ্রামে মথুর মাহাতো বীরেনবাবুর পার্টি করে। সে লোক ঢুকাবে। ঢুকাক! স্কুল হোক।

পঞ্চানন হাঁসদার নেশা বলতে খৈনি। সযত্নে খৈনি পিষে গালে দিয়ে বললেন, নকশা আছে।

—কেমন?

—আদিবাসী ছাত্র ছাত্রী যত হবে, তাদের জন্য সরকার টাকা দেবে, বৃত্তি দেবে। বীরেনবাবু এতকাল শুনল না। এখন কেন

চেতে উঠল? শালবাড়ি কেন, কয়েকটা প্রাইমারি বের করবে। নিজেদের লোক ঢুকাবে।

—যাই হোক, স্কুল তো হবে।

—লধা থাকলে আরও-ই ভাল। লধা নামে না কি অনেক কিছু করেবে ধীরে ধীরে।

—লোধারা তো খুবই হতভাগ্য।

—চুরি-ডাকাতিটা ছাড়ত যদি!

—আমাদের লোধারা তো করে না। আর..দাদিরা, কুসমা, লোধাদের কিছু কেসে তো দৌড়েছি। চুরি করায় যারা, তাদেরকে পুলিস ধরে না।

—পুলিসে-রিসিভারে মাগভাতারি।

—যা হোক, শিক্ষক খুঁজুন।

—তুমি করবে না?

—পাঁচ থেকে আট ক্লাস একটা স্কুল সংগঠন করতে পারলে কাকা! আমাদের ছেলে মেয়ের শিক্ষা তো চার ক্লাসে শেষ! এখান হতে পড়লে ওরা হাইস্কুলে যেতে পারবে। লেখাপড়া না করলে কিছুই হবে না।

—তোমরা উদ্যোগ নেবে?

—গ্রামের পাঁচজনের কথা এটা।

—সে তো ভাল প্রস্তাব ধনঞ্জয়।

—যদি শুরু করতে পারি, তবে আপনাদের আগেই জানাব। আপনাদের সেটা ধরুন, জানিয়ে গেলাম।

পঞ্চানন হাঁসদা বলেছিলেন, পড়াবে কে?

—আমরা খুঁজব।

—ডাহিপাড়াতে আমরা অদিবাসী শিক্ষক নেব।

—পাবেন?

—জামবনি আছে। শিলদা আছে···

—আমাদেরও দরকার হবে।

—একটা জুনিয়ার হাই স্কুল হলে, অনেক প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র পাবে।

—ছাত্রীও পেতে হবে কাকা।

— আমার মেয়েই তো চার ক্লাস পড়ে বসে আছে। আর পাঁচটা মেয়ে যেত তো সেও যেত পড়তে বিড়াগ্রামে। আর মেয়ে কোথায় ?

—তরন আর পাটাপুতার হাইস্কুল। সে তো অনেক দূরে।

আশা উজ্জ্বল মুখে পঞ্চানন বলেছিলেন. রাস্তা হল, বাসও হবে, যেতে পারবে।

প্রণব গিরি মাথা নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন, বাস তখনি চালাবে, যখন খরচ উঠবে। আমাদের গরিব এলাকা !

আঠারো বছরে দারিদ্র্য, কিছু লোকের সচ্ছলতা, লোক চলাচল, সবই বেড়েছে। বাস চলছে ঠিকই, তা কখন ছাড়ে কখন আসে, সময়ের ঠিক নেই। যে পারে সে সাইকেলে যায়। তবু, শালবাড়ি গ্রামের চেহারাও পাল্টে গেছে।

আজ মনে পড়ছে, সেদিন মনে কি অস্থিরতা এসেছিল। পরমি কাকার কথা যেন মনে বিঁধেছিল। কাজই তো মানুষকে সব ভোলায়। কাজ মানে চাকরি নয়, কাজ তৈরি করতে হবে। কাজ আছে, খুঁজে নিতে হবে।

গ্রামে এসে চন্দ্র সিংকে বলেছিলেন, স্কুল সংগঠন শুরু হবে, ডাহিপাড়ার চাকরি ছেড়ে দেব।

—সংগঠন কি এমনি হবে ?

—গ্রামে মিটিং ডাকুন !

—সরকারি প্রাইমারি স্কুল হচ্ছে রাস্তার উপর। সাওনাদের ঘরের সামনে।

—সরকার, খাস জমিতে ইস্কুল করছে।

—শিক্ষক দু'জন, নন টিচিং একজন।

—মথুর মাহাতো তিনজনকেই সাপ্লাই করছে ?

—শিক্ষক তো হবে না, নন টিচিং⋯ প্রাইমারিতে নন টিচিং দেবে ?

—খবর নিই।

মমতা বলেছিল, আবার তুমি পরের কাজে মাথা দিচ্ছ ? ছেলে চলে গেল, নেশা কাটল না ?

মা জীবনে প্রথম ছেলের সপক্ষে কথা বললেন, গলা তুলে। নিজের স্বামীকে শুনিয়ে। মার মনে এখন দুটো ব্যাপারে টানা-পোড়েন চলছে।

ধনঞ্জয়কে অকর্মা, অপদার্থ বলতেন স্বামী। মার বিশ্বাস ছিল, ধনঞ্জয়ের কপাল মন্দ হয়েছে মমতার সঙ্গে বিয়ে হবার জন্যে, দুষ্ট গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবে। তিনি ভাবতেন ও বলতেন, সময়টা কেটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলার সময়ে ইচ্ছে করে ভুলে যেতেন, আঠারো বছরের ছেলের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের মেয়ের বিয়ে তাঁরাই দিয়েছিলেন। তাঁর তীব্র বাসনা ছিল, একতম সন্তানের বউ আসুক, সন্তান হোক।

তারপর ধনঞ্জয় যখন তাঁদের মনোমত কিছুই করলেন না, তখন তিনি ছেলেকে অকর্মা, অপদার্থ বলতেন। ওঁর স্বামী যা বলতেন তাই বলতেন, নিজে ভেবে বলতেন না।

অজয় চলে যাওয়াতে মা খুব আঘাত পেয়েছেন। একই সঙ্গে ধনঞ্জয় বিষয়ে মনে অপরাধবোধ ও আকুলতা ফিরে এসেছে। সেই সঙ্গে স্বামীর মতামত বিষয়ে অবিশ্বাস এসেছে নিদারুণ। স্বামীর সব কথা যে ঠিক নয়, সে কথা যেন হঠাৎ বুঝেছেন, স্বামীকে সুযোগ পেলেই শোনাচ্ছেন।

বাবাও বদলে গেছেন। তাঁর প্রবল প্রতাপ এখন বোঝা যায় না। নীরব থাকেন, ঠাকুরকে ডাকেন।

মা এতদিন মমতাকে কথা শোনাতেন না। তিনি নিজেকে দিয়ে বুঝতেন, প্রচণ্ড রাগী শ্বশুর ও সাংসারিক অর্থে অপদার্থ স্বামী, দুয়ের

মাঝে মমতা সবল পক্ষকেই সমর্থন করে। তার বাবা জামাই বিষয়ে আশাহত, কিন্তু মেয়েকে তত্ত্বতাবাস নিয়মিতই করেন।

আজ মমতার কথা শুনে তিনি স্বামী ও পুত্রবধূ দুজনের উদ্দেশ্যেই বলেন, আমার বেটা যা করে শান্তি পায় করুক! ঘরে বসে ও কি করবে? তোমার বেটা গেছে মা! আমার নাতি গেছে! আমার বেটার কথা যদি শ্বশুর-বউ শুনতে, সে এখানেই পড়ত। তোমার বাবার কাছে পড়তে গেল বলে তো দুধের ছেলে বিপথে গেল।

শোকাহত মমতাও এতদিনে মুখ খোলে। স্বামী ছিল বিপক্ষ, তাকে কথা শোনানো যেত। শ্বশুর-শাশুড়ি ছিলেন তার পক্ষে। এখন শাশুড়ি বিপক্ষ শ্বশুর নির্বাক।

সে বলে, বাবার কাছে তাঁর নাতিরাও পড়েছে। কই, তারা তো বিপথে যায় নি।

ধনঞ্জয় আর সহ্য করতে পারেন না।

—সে কোনও বিপথে যায় নি। যেমন বিশ্বাস করেছে, তেমন-কাজ করেছে। সে জানের পরোয়া করে নি। সবাই যদি একরকম না হয়! একটু থেমে ধনঞ্জয় বললেন, কাল থেকে ডাহিপাড়া যাব।

বাবা অস্ফুটে বললেন, কতদিন?

এই ডাহিপাড়া অধ্যায়ে ধনঞ্জয়দের পনেরো বিঘা জমি ষোল বিঘা হয়। হঠাৎই এক বিঘা জমি কিনেছিলেন ধনঞ্জয়। জমিটি তাঁর সহপাঠী ননী দাসের। ননী গ্রামে আসে কম, থাকে না। এক বিঘা জমির জন্য সে শালবাড়ি থাকবে না।

—মৌবাড়িতে জমি কিনলাম, সেখানে সেচ আছে।

--শ্বশুর কিনিয়ে দিলেন?

--হ্যাঁ, তবে দুটো চাষ হবে।

--জমি ধরে রাখলে তো ভাল দাম হবে।

--কিসের স্বপ্ন দেখ! এই জায়গায় জমির দাম হবে?

--হতে পারে।

—না রে ভাই। ধানজমি, আড়াই'শ টাকা বিঘা উঠেছে, তাই যথেষ্ট।

ধনঞ্জয় সেই জমি কেনেন।

মমতাকে বলেছিলেন, চিরকাল বাবার ঘাড়ে খেয়ে যাচ্ছি। ওই এক বিঘায় যে ধানই হোক, আমার খোরাক তো খানিক উঠবে। তাই হোক।

— বাবা শুনলে কি বলবেন ?

— কি আর বলবেন। আমার বিষয়ে বাবার আশা-ভরসাও নেই, কিছু বলবেনও না।

— বাবার কোন্ আশাটা বা তুমি মিটালে !

— তোমার কোন আশাও তো মিটল না।

— থাক, মলয় দাঁড়ালে আমার সব হবে।

— মলয় নিশ্চয় দাঁড়াবে।

— এখন কোথায় চললে ?

— কাজ আছে মমতা।

চন্দ্র সিং এসে পড়েছিলেন।

— সকল কাজের আগে মিটিং ডাকা করাও।

— কোন মিটিং ?

— স্কুলের মিটিং। মথুর মাহাতোর মন বুঝ না। সে লোক জানে হয়কে নয় করতে। হাটে ডেকে বলছে, সাঁওতাল-ভূমিজ-লোধারা কি ফাইভে পড়বে ? আপনারা যা ভাবছেন, তা হবে না। স্কুল অনুমোদন পাবে না। বললাম, না পাক, তবু শুরু করব।

— এই কথা !

— তবে ?

— মিটিং ডাকতে হবে সময় নিয়ে। ডাহিপাড়া সমেত যে যে গ্রামে প্রাইমারি স্কুল আছে, সকল গ্রামে খবর দেব। পড়বে তো তারাই।

পরমি কাকী এ কথা শুনে বলল, বাবা! মিটিন্ তো দেখি নাই কখুনো। সাওনা দেখে নাই, আমি দেখি নাই।

--এবার দেখবে।

--ইসস্কুলের মিটিঙে আমাদের মা-বেটার কি? আমরা তো পড়ব নাই। আর সানতালগুলা যে পারছে হেথাহোথা যেছে, তারা পড়তে পারে।

--তাই বলো কাকী!

নিঃশ্বাস ফেলে পরমি বলল, সাওনার ঘরে তো বিটাবিটিও নাই যে ইসস্কুলে দিব।

--তাহলে তুমিই চল।

—তাই ভাল। আমাকে লিয়ে যা!

পরমি অজস্র হেসেছিল। বয়স তখন তার যাটই হবে প্রায়। তবুও তাঁর চোখে তখনও পরমি কাকী সুন্দরী। খুব সুন্দরী। পরমি কাকীর এক ঢাল চুল। সাদা দাঁত। পাথরে খোদাই শরীর, শেষ-দিন অবধি একই রকম ছিল। শুধু রগের কাছ দিয়ে কিছু চুল সাদা। মুখের রেখাগুলি ক্লান্ত।

এখন তো সন্ধ্যার পর তিনদিন বয়স্কদের পড়ানো হয়। পরমি কাকী থাকলে নিশ্চয় পড়ত।

—কুয়াটো মঞ্জুর হই আছে। শিটা দেখ? নদী হতে সেচ খাল কাটবে, কাটবে, সি কবে?

--এবার দেখ না। সব করে ফেলব!

--আমার জমিন নাবালে, জল পেছি আমি, কিন্তুক গ্রাম তো জল পায় না।

ধনঞ্জয় চলে গিয়েছিলেন বিড়াগ্রাম। বিবাহে প্রাপ্ত আংটি বেচে কিনেছিলেন কার্বন, কাগজ।

দাও, সেচখাল দাও, পরিকল্পনায় আছে। মৌজা ও অঞ্চল শাল-বাড়ি। দু'হাজার লোকের বাসবাস। নদী থেকে দাদিরা অবধি

সেচখাল ও রিভার লিফট সেচ ব্যবস্থা হলে পাঁচটি গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা সেচ পাবে। অঞ্চলটি অনুন্নত। লোধারা একশত ঘর মূলত ভূমিহীন। জমিমালিকানা এক থেকে পনেরো বিঘা। এক ফসলী জমি, ফলে বড় ধনী চাষী নাই।

দাও, কুয়া দাও, অনেক দিনের প্রতিশ্রুতি। তফসিলী-আদিবাসী অঞ্চলে তৃষ্ণা মিটাতে কুয়া দাও। নলকূপ ভেঙে গেলে সারাই মুশকিল। হয় নূতন কুয়া দাও, নয় পঞ্চায়েতী কুয়া সংস্কার কর।

এভাবে তৈরি হয় গণদরখাস্ত। যার কপি এখনও আছে ধনঞ্জয়ের কাছে। টিনের স্যুটকেশে, মাচানে।

এখন মমতা ছেলেমেয়েকে বলে, তোর বাবার স্যুটকেসে সোনাদানা অঢেল। আমাকে ছুঁতে দেয় না।

সোনার চেয়েও দামী মমতা! ওই বাক্স ছোঁবে, তেমন পুণ্য তোমার কোথায়? কত দরখাস্ত, কত নির্যাতিতের বিচার প্রার্থনা। স্কুলের বিষয়ে কত দামী দামী কাগজ। এখন বেশ জেরক্স করা যায়। মজার কল বটে। নিমেষে কপি হয়ে গেল। বিড়াগ্রামে জেরক্স করে, টাইপ করে তিনটি ছেলে দাঁড়িয়ে গেছে। ভেকু সরেনের কথাই ঠিক। কাগজ কত দামী, তা যারা বোঝেনি তারা আজ বুঝছে কিছু কিছু।

সেদিন যে স্বাক্ষরিত টিপসই সংবলিত গণদরখাস্ত নিয়ে ধনঞ্জয় ও গুণধর (তখন সে নব যুবক) গিয়েছিলেন ঝাড়গ্রামে।

এস ডি ও, ওঁর নাম শুনেই, চমকিত।

—অজয় মাহাতোর বাবা না আপনি?

—হ্যাঁ সার।

—অ! তা এদের এসব গণস্বাক্ষর টাক্ষর কেন? আপনিও কি…?

—সরকারের কাছে জল চাইছি।

—সেচখাল জানি না… কুয়োটা দেখব।

—পুরাতন কুয়া সংস্কার, নতুন কুয়া, এ সব স্যাংশন হয়ে আছে।

—স্যাংশান হয়েছে। অথচ সরকার, মানে ব্লক আপিস করে নি। ব্যাপারটা কি ?

—মথুর মাহাতো সব জানেন।

—দেখব। দেখব।

এস ডি ও ধমক মেরেছিলেন।

--এখন আমরা জোর দিচ্ছি যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর।

---কুয়া আর খালের দাবি বহুদিনের। সরসিজ মজুমদার অনুমোদন করে যান।

--তবেই বুঝুন! অনুমোদন করেছে, কাজ করে নি, সে ধড়াধড় 'মে·বি ডান' লিখে দিত। কিন্তু কর্ষকরী করবার ভার রেখে গেল আমার উপর। আমি তো সব পারব না। প্রায়োরিটি দেখব আগে। কুয়া নেই বিড়াগ্রামে।

--পাঁচটি সরকারি কুয়া। জমিদারদের দেওয়া তিনটি। আর প্রাইভেট তো আছেই।

এস ডি ও ছোকরা, কিন্তু একাণ্ডরে কাকে খুশি রাখতে হবে তা ভালই জানে। প্রশাসন তখনও বৃহন্নলা নয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলিই চূড়ান্ত ক্ষমতাশীল নয়। কিন্তু আঙুলে তিনটি আংটি ধারণকারী ওই যুবক এস ডি ও ঠিক বুঝেছিল সামনে আসছে সেই দিন। যখন রাজনৈতিক দলগুলি হবে কত্কোছলের মালিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে বৃহন্নলা। এবং মানুষ ধোপার আছাড় খাবে।

---মথুর মাহাতোর কথা তো আমি ফেলতে পারব না, তিনি একজন...প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।

—তা আপনি দিন কুয়া। শালবাড়িতে দুটি কুয়া ছাড়া চলে না।

-- বলতে চান, জল খান না ?

—গরম কালে ভিজিট করুন। বিভিন্ন পাড়ায় পাঁচটি কুয়া আছে। প্রাইভেট। তাও আমরা গরমকালে কেন, সারা বছরই যে

চায়, জল দেই। তারপর, নদীর বুক খুঁড়ে খুঁড়ে মেয়েরা জল আনে। নদী যত শুকাক, তাতেই স্নান করি। গ্রীষ্মে কষ্ট নিদারুণ। জল নেমে যায় কুয়ায়। পশ্চিমদিকে নদী হতে আধমাইল তফাতে কুয়া দেন জল পাব।

—আপনার তো জল আছে।

—গ্রামবাসী জল পায় না।

—দেখছি।

বেরিয়ে এসে গুণধর বলেছিল, আদিবাসীর নামে টাকা কোথায় যায়? বাপরে!

—চল, আশুকে দেখে যাই।

আশু বলল, তোমরা যেন চাঁদের দেশে আছ। আদিবাসীর নামে টাকা আসে, তা কেথায় যায়? কংগ্রেস কালে থোক টাকা ফেলে দিত। আদিবাসী যদি এমেলে, এম পি, মন্ত্রীও হয়, সে তো খবর রাখে না। এখন টাকা বাড়ছে, আরও বাড়বে।

—সে টাকায় কি হয়?

—সব খবর নিয়েছি রে ভাই! রাস্তা হয়, বাংলা বাড়ি হয়, অন্য কাজ হয়। এখন তো সবচেয়ে আগে চাই রাস্তা। জীপ যাবে না?

হ্যাঁ, রাস্তা চাই এখন। লোধা-সাঁওতাল-মাহালি-মাহাতো-ভূমিজ-কোড়া-মুণ্ডা সুপথে হাঁটবে, থানায় যাবে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবে। কৃষিজ-পণ্য আনবে বাজারে, সে জন্য রাস্তা চাই না।

রাস্তা চাই, মিলিটারি ও পুলিশের জন্য। অজয়দের প্রভাব কোথাও পড়ে থাকলে তা উপড়ে ফেলার জন্য। ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে ঘর জ্বালাবার জন্য, মানুষকে ভূমিহারা করে ভিখারি মিছিলে নামিয়ে দেবার জন্য।

এখন ধনঞ্জয় প্রশাসনের স্বরূপ বুঝতে পারছেন, আগে কেন বোঝেন নি? আশুতোষ বলল, ভাই!

'ছেঁড়া তমসুক, জাল দলিল
পাহাড় প্রমাণ পুরনো ঋণ
বাঁচার লড়াই, চলে মিছিল
চলছে, চলবে বিরামহীন।'

আশুর কাছে বড় কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন ধনঞ্জয়। ওকে এক বাণ্ডিল সুখদা বিড়ি কিনে দেন, একদিস্তা কাগজ।

—লেখ দলুই, খুব লেখ তুমি। কি লিখেছ, আ হা হা হা! অজয় যেন কথা বলল। যাক গে, সরকার আছে, ব্যবস্থা আছে, টাকা আছে, আমরা কেন পাওনা পাব না?

আশুতোষ পান ছোপ দাঁতে হেসে বলল, লড়াই করে বাঁচতে হবে। গরিব তো চায় এক মুঠ ভাত, একখানা রুটি, এক বাটি আমানি। দেয় কে?

'এক দুটি ভাত, এক খাঁড়া রুটি, এক ডুভি তক আমানি
কে দিবেক তকে তামাম মুলুকে তেমন মানুষ দেখিনি।'

—চাইতে হবে রে ভাই!

—দরখাস্তের কপিটা রাখ। জয়চন্দ্র মুর্মুকে দেখলাম না, ব্লকে কেরানী। সে যেন তাগাদা রাখে।

—গ্রাম তুলে আন শহরে। ঘেরে বসে থাক।

—আশু: এখন পঁচিশটা লোক শহরে হাঁটা দিলে···অজয়ের গ্রাম... ছুতা করে পুলিস ঢুকে যাবে, তারপর? আমার ক্ষমতা খুব কম। গ্রামের পাঁচজনের বলে বল! আমি তাদের বাঁচাতে পারব? ভাল করতে না পারি, মন্দ করব না। লেখাপড়া চাই রে ভাই, তারা যখন জানবে সরকার এত দেয় তত দেয়, কাগজে দেয় হাতে দেয় না, তারা নিজেরাই আসবে।

আশুতোষ অল্পেই খুশি।

—সেও সত্যি। বলব আমি জয়চন্দ্রকে। সে মুরুব্বি মানুষ, তার কথার একটা ওজন আছে, দামও আছে।

– ওই কাগজ বোঝাই করে লিখবে, আর সময় পেলে আমাকে শোনাবে।

– ঠিক আছে।

বেরিয়ে এসে ধনঞ্জয় বলেছিলেন, গুণধর! এবার মিটিঙের কথা ভাব।

– আপনি তো মাস্টারি পেয়ে গেছেন।

– গ্রামে ইস্কুল চাই গুণধর। কাজ শুরু হবে। আমিও ছেড়ে দেব চাকরি।

– পড়বে কে?

– প্রাইমারি যেখানে আছে, সেখানে ছুট।

– লিখে দিলে পড়ে দিতে পারি।

– তারিখটা ঠিক করতে হবে। যতগুলি পাড়া, মাত্‌বরদের ডাকা করাও।

– কোথায়?

– তোমাদের বাড়িতেই তো বসা হয়।

– আমাদের চাকরি বাকরি হবে না?

– গুণধর! যারা সাত আট অবধি পড়েছে, পরীক্ষায় বসতে হবে। আর এক্সচেঞ্জে নাম লিখাও, বারবার খবর নাও।

– গ্রামে একটা কাগজও আসে না ··

– ইসকুল করতে পারি তো কাগজ নেব, ভিক্ষা করে বই আনব, লাইব্রেরি হবে।

সেই দীন লাইব্রেরি ছিল বীজ।

আজ শালবাড়িতে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার। মাখন সিং মুণ্ডা গ্রন্থাগারিক। হোক মাটির ঘর, হয়েছে।

তার পেছনে সেদিনের গ্রামবাসী কয়েকজনের কি উদ্যোগ ছিল তা কে মনে রেখেছে?

হ্যাঁ, স্কুলের মত লাইব্রেরিও সংগঠন করা হয়েছিল। এখন সে

লাইব্রেরিতে কাগজ আসে, আড্ডা হয়, বই কেনা হয়। কয়েকটি গ্রামের মধ্যে একটি লাইব্রেরি।

আর, এখন ধনঞ্জয় গর্ব অনুভব করলেন। তাঁদের স্কুলে যে বই ও চাঁদা তুলে পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরি করেছেন, সেখানে অনেক বেশি ছেলেমেয়ে বসে বই পড়ে। অথচ সে সময়ে এ সব কিছুই ভাবা যায়নি।

প্রাইমারি স্কুল একাত্তরেই হয়ে যায়।

মথুর মাহাতোই দু'জন শিক্ষক পাঠান। তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা। তিনদিকে দেয়াল। খুঁটির উপর খড়ের চাল, একটি ঘর।

একটি ঘর ও দাওয়ায় চারটে ক্লাস চলবে কি করে এ কথা সকলেই জিগ্যেস করে।

—হোক না শুরু, পাকা ঘর হয়ে যাবে।

হয়ত একুশ শতকে হবে, এখনও হয় নি। স্কুল দেখে সক্রোধে রূপচাঁদ টুডু বলেছিলেন। আমাদের মানুষ মনে করে না তো, আমাদের ছেলে মেয়ের পক্ষে এই যেন যথেষ্ট। মথুর বাবু! চালাটাই বা দিলে কেন, গাছের নিচে পড়ত ভাল।

—ছিল না, হল। আবার দেখা যাবে।

মথুর মাহাতোও আছেন, স্কুলও আছে। যতবার সংস্কার সাধন হয়, নতুন দেয়াল হয়, চালে খড় পড়ে।

এই স্কুলঘর নির্মাণ কোন পরিকল্পনার জন্য আটকে আছে কে বলবে।

যতগুলো প্রাইমারি স্কুল তারপরে হয়েছে, সবগুলোরই হাল আছে, এটা বেহাল। শিক্ষকদের একজন প্রায়শ আসে না। ছাত্রছাত্রীরা আসে পাঁউরুটি পাবার দিনগুলিতে। রাতে পথিক-রাহী ক্লান্ত হলে শুয়ে থাকে চালার নিচে। একদা এক গ্রীষ্মের ছুটিতে এক সন্ন্যেসী এসে দখল করেছিল। থান বা পীঠ বানিয়ে ফেলত, তাকে বহুকষ্টে তোলা যায়।

একাত্তর থেকে অষ্টআশি একবারও কোন সরকারি পরিদর্শন হয় নি। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কাগজে অবশ্য অনেক। সেই মত টাকাও আসে।

যিনি আসেন না প্রায়শ, তিনি সার-বীজ-কীটনাশকের দোকান করেছেন। দ্বিতীয়জন কিনেছেন মোটরবাইক। তবু তো স্কুল হয়। যখন হয়, ধনঞ্জয়রা পাঁচজন খুব আনন্দিত হন। যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। সকল ঘরে ঘুরে ঘুরে ছাত্রছাত্রী ধরে আনতেন ওঁরা। লোধা বালক বালিকাদের ধরতে রীতিমত ছুটতে হত।

পরমি কাকা বলত, মেয়েধরে লিসবি, লয়তো উরা আসবেক নাই। আখুনো বুঝে না।

এখনও কি বোঝে? বুঝলেই কি পাঠাতে পারে? পারে না, পারে না সবাই। মানুষ সব সময়ে নিজের হাতে থাকে না। পরের হাতে বাঘবন্দী—

ছেলেকে খেতে দিতে পার যে পড়াবে? মেয়েকে জামা দিতে পার যে পড়াবে? তার চেয়ে কাজে দাও...পরের হাতে বাঘবন্দী।

পাঁচ

দিনে দিনে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে, যে শালবাড়ি মৌজায় একটি সেতু তৈরি হতে চলেছে। চার ক্লাসে জনপদবাসার পাঠ শেষ বাধ্যতামূলক। তারপর সাত কিলোমিটার, নয় কিলোমিটার ও দশ কিলোমিটার দূরে দূরে তিনটি হাইস্কুল।

শালবাড়িতে স্থাপিত হবে জুনিয়ার হাইস্কুল। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পড়ানো হবে। হাইস্কুল দূরে, যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও ভাল নয়। তাই আশপাশের তেরোটি গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েরা যেতে পরে না বিড়াগ্রাম, তরন ও পাটাপুতা। এক কালে মাঠ ডুংরি ভেঙে বিড়াগ্রাম যাওয়া চলত।

এখন, মাঝখানে গড়ে উঠেছে জনপদ। কাটা হয়েছে খাল,

বিড়াগ্রামের দূরত্বও দাঁড়িয়েছে নয় কিলোমিটার। যা হোক, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ যাতে অনুন্নত এলাকার শিক্ষার্থীরা পেতে পারে, সেজন্য এই স্কুলটি গড়া দরকার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি হবে সেতু স্বরূপ। স্কুলটি আপনাদের স্বার্থে। আপনারা আসুন। সকলে মিলিত হয়ে স্কুল গড়তে হবে।

প্রণব গিরি বললেন, আগে আমরা কিছু লোক আলোচনায় বসি। স্কুল গড়তে হলে নিয়ম মত হওয়া চাই! আমরা জানি ধনঞ্জয় থার্ড ডিভিশনে পাস হলেও নিজের চেষ্টায় অনেক পড়েছে। নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তার দাম নেই। গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকই হতে হবে।

ধনঞ্জয় বললেন, আমার শিক্ষা যা, তাতে কেরানি তো হতে পারব?

—পারবে।

—সন্তোষ হাঁসদা এইট পাস। ও ননটিচিং কাজ করতে পারবে?

—তা পারবে।

—বেশ, ছোট মিটিং হোক। আমরা বসি।

মথুর মাহাতোকে ডাকতেই হল। সে এসেই ফুৎকারে বাতি নিভাল।

—জুনিয়ার হাই, কি হাতের মোয়া? হবে কোথায়? খাস জমি নাই। শিক্ষক কোথায়? ঘর তুলবে, টাকা কোথায়?

তাঁকে কমিটিতে রাখা হবে এটা কেউ না-বলতে ধরে নিয়ে তিনি বললেন, কোন নিয়মভঙ্গ হলে আমি বাপু কমিটিতে নেই। আমি এখনও বলছি, রূপচাঁদবাবুকে বলেছি, এটা বাতুলতা হচ্ছে। প্রাইমারি ছিল না। করে দিলাম প্রাইমারি। সঙ্গে সঙ্গে জুনিয়ার হাই?

রূপচাঁদ বললেন, হ্যাঁ মথুরবাবু। জংলী বুনো আমরা, আমাদের ছেলেমেয়ের চার ক্লাসই যথেষ্ট। না কি বলেন? উঁচু ক্লাসে পড়বে বাবুরা!

—এই দেখ, এ কথা আমি বলিনি।

—তবে কি বলছেন?

সব কিছুই রয়ে সয়ে করুন। গ্রাম কংগ্রেস ভাবাপন্ন। তবুও সরকার প্রাইমারি স্কুল দিল!

—কুয়া দিল না কুয়াটি আপনি বিড়াগ্রামে বের করে নিলেন, শালবাড়িকে ভুলে গেলেন।

—এই দেখ! কুয়া তো হবে এখানে।

—আপনি জানবেন।

—দেখুন চন্দ্রবাবু! জুনিয়ার হাই করব বলে ধনঞ্জয় ব্যস্ত হতে পারে। তার বুকে পুত্রশোক··· সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়...

পঞ্চানন হাঁসদা ক্ষেপে যান। খইনির থুথু ফেলে বলেন, ডাহি-পাড়া স্কুল সংগঠন, তখন ওর ছেলে মরেছিল? স্কুল চালাই এগারো মাস, তা বাদে আমার মেয়েটা আমারই কাছে প্রসব হতে মরল। জীবন থাকলে মরণ থাকে। কে জানে যে জীবনের সকালে মরব, না বিকালে, না সন্ধ্যায়, না রাতে। ধনঞ্জয় আর গ্রামের পাঁচ মানুষ অনেক কাজেই মাথা দিয়েছে। সেটা নিজেকে ব্যস্ত রাখতে নয়।

একটু থেমে বলেন, তুমি মাতব্বর, তোমাদের সরকার, কাজের কথা বল। ধনঞ্জয়ের বেটার শোক সকলের অল্পবিস্তর লেগেছে।

"ভ্রান্ত রাজনীতির শোচনীয় পরিণতি এই হয়" দিয়ে শুরু করে একটি সময়োচিত রগড়ানি দেবার বাসনা চেপে যান মথুর মাহাতো।

—জায়গা চাই, ঘর চাই, শিক্ষক চাই, গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। এ সব ঠিক করুন আগে, তবে তো আর সব। গ্রামে শিক্ষিত বলতে, গ্রামে বসবাসকারী এখনও ধনঞ্জয়। আর ওর কোয়ালিফিকেশনে··· ওর শালারা, ভায়রাভাইরা, সবাই উচ্চ শিক্ষিত ···ও একা, এ হে হে হে! তবে হ্যাঁ, এটা একটা নোবেল আইডিয়া, যে নিজে উচ্চ শিক্ষা পায়নি, তাই শিক্ষার মর্ম বোঝে।

চন্দ্র সিংয়ের দাদা সূর্য সিং বললেন, ও তো কেরানি হতে চাইছে।

—কি? কেরানি?

ধনঞ্জয় বললেন, কেরানি তো একটা চাই। আমরা কেরানি দেব, ননটিচিং স্টাফ দেব।

—এক গ্রাম হতে দু'জন?

রূপচাঁদ ঈষৎ হেসে বললেন, জায়গা জমি যেভাবে হোক আমাদের গ্রামই দেবে। পথের মোড়ে গ্রাম। জমির একটা দাম আছে! চিন্তাটাও আমাদের। তা অনুমোদন তো পাব একদিন। সেদিন মাইনে হবে, স্কেল হবে। শালবাড়ির দু'জন থাকবে এটা কি অন্যায্য?

—দেখুন!

—ত্যাগ কেউ দেখাচ্ছে তো ধনঞ্জয় দেখাচ্ছে···

ধনঞ্জয় হাঁ হাঁ করে ওঠেন। – ও সব কথা থাক। তাহলে বড় করে মিটিং ডাকা যাক এ সময়েই। ধানপালা উঠে গেছে। মানুষ আসতে পারবে, একটা দিন ঠিক করুন।

রূপচাঁদ মুখ হাঁ করে বন্ধ করেন ও বলেন না কিছু। একটি বিড়ি ধরান।

মথুর মাহাতো বলেন, ম্যানেজিং কমিটি তো হবে। তার বিষয়ে ভেবেছেন?

পঞ্চানন বললেন, মিটিংে আশা করব যে বারো-তেরোটা গ্রামের মানুষ আসবে।

—তেরোটা গ্রাম? এ যে হাসির কথা হয়ে গেল? শালবাড়িতে জুনিয়ার হাই হবে, তারা আসবে কেন?

—যতগুলি গ্রামে প্রাইমারি আছে, পরে পড়ার ব্যবস্থা দূরে, তারা থাকবে।

—যেমন?

—শালবাড়ি, ডাহিপাড়া, ছোট কাঁড়রা, মাকাল, দাদিরা, কুসমা, রানীসল, ভেড়ামুড়া, হরিণমুড়া, নামোতা, পাতরখুড়া, ছোট তরণ, দিশারায়, কাড়া...চৌদ্দ গ্রাম!

—চৌদ্দটা গ্রামে খবর দিয়েছেন?

মাথুর মাহাতো রাজনীতিক লাভালাভের হিসেব কষে ফেলেন। চৌদ্দটি গ্রাম, চল্লিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার মানুষ। এ ব্যাপারে না থাকলে অবিমৃশ্যকারিতা হয়ে যাবে। বীরেনবাবু মাপ করবে না।

কমিটি হাতাতে হবে, কমিটি।

—বেশ! আমি আছি। আমি বি এস সি, বি এড, গঙ্গাধর মাহাতোকে শিক্ষক দেব। বিশ্বাসী ছেলে, বিড়াগ্রামে থাকে। সকলেই চেনেন।

রূপচাঁদ ঈষৎ হেসে বলেন, আমার পিসাতো ভাই মহেশ্বর মুর্মু বি এ বি-এড। একটা পা খুঁতা। টাউনে চাকরি করতে পারল না। শিক্ষকতা, করবে।

চন্দ্র সিং বলেন, ছোটতরণে প্যারীলাল সিং, বি কম, ছেলে ·· আমি বলেছি কয়েক বছর শিক্ষকতা কর। কাজ পেলে চলে যেও।

প্রণব গিরি বলেন, ডাহিপাড়া থেকে আমারই খুড়াতো ভাইপো, চন্দন গিরি, বি কম। সরকারে, ব্যাঙ্কে, পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে...সে এখন তো পড়াবে।

মথুর বলেন, কাজ পেলেই তো সব পলাবে।

গভীর বিশ্বাসে প্রণব গিরি বলেন, ততদিনে জামবনি থানা, বিড়াগ্রাম থানা, গ্রাজুয়েট পাওয়া যাবে।

মথুর মাহাতো ভবিষ্যদ্বাণী করে যান, আদিবাসী ছেলে গ্র্যাজুয়েট হলে শিক্ষকতায় থাকতে চাইবে না। অন্য কাজ খুঁজবে। ছেলে ঠেঙিয়ে তেমন টাকা তো মিলে না।

সূর্য সিং বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি সভা শেষ করে দেন মাটিতে চাপড় মেরে, পরের কথা পরে। যখন যেমন দিন আসবে তখন তেমন ব্যবস্থা হবে। এখন সবাই গা তোলেন। সময় অনেক গেল।

ধনঞ্জয়ের আজও হাসি পায় ভাবতে।

রূপচাঁদকে সবাই চেপে ধরে।

—স্কুল সংগঠন শুরু হলে ধনঞ্জয় কাজ ছাড়বে। সে তখন

ডাহিপাড়ার কাজ ছাড়বে এ কথা জানলে মথুর মাহাতো এখান টিচার ধরে আনত। রাজনীতি করে সে, তার কথার প্যাঁচ বুঝ না।

—তাই বল!

প্রথম সে মিটিং, মহতী জনসভা। চন্দ্র সিং ছিলেন প্রধান বক্তা। ধনঞ্জয় দেখেছিলেন সব গ্রামের কিছু কিছু লোক এসেছে। কমিটিতে সকল জাত-গোষ্ঠীর মানুষকে রাখতে হবে। মেয়েরা পড়বে, তা কমিটি হবে যখন, তখন তিনি পরমি কাকীর নামটা বলবেন। নিরক্ষরে কি এসে যায়? লোধা সমাজের একজন তো থাকবে, চামটু মল্লিক। সে নিরক্ষর, কি এসে যায়? লোধা ছেলে মেয়েদের প্রাইমারিতে পাঠাবার উদ্যোগ তো নিয়েছে।

মথুর মাহাতো বলেছিলেন, প্রধান সমস্যা জায়গা নাই। কোথায় হবে স্কুল, সেটা ভাবতে হবে। বিড়াগ্রাম হতে দু'মাইল পশ্চিমে হলে আমিই জায়গা ব্যবস্থা করতাম।

পঞ্চানন বলেছিলেন, তাতে সমস্যা দূর হয় না। যে দূরত্ব সে দূরত্ব থেকে যায়।

তখন বক্তারা সজোরে বিতর্ক শুরু করেন।

—জায়গা নাই, স্কুল গড়বেন কি বাতাসে?

—দরকারে জায়গা দিতে হবে। প্রাইমারির বেলা জায়গা মিলে, জুনিয়র হাইয়ের বেলা···রাস্তার এ পাশে পাঁচ কাঠা জায়গা মিলে না।

—জায়গা নাই।

সূর্য সিং সামনে বসেছিলেন। পরিণাম না বুঝে চটচটকা কথা বলেন তিনি মাঝে মাঝে। তিনি হঠাৎ বলেন, সদ্‌না লধা মরে গেল, তার রায়তী জমি, মড়ার অঙ্গুলে কালি ধরিয়ে টিপসহি নিল, প্রমাণ হল সে জমি দান করে গিয়েছে। সদ্‌নার বেটা এখানেই এসেছে উচ্ছেদ হয়ে। সে জমিতে?

ভীষণ, ভীষণ রুদ্রসঙ্কেত এই সহসা নৈঃশব্দ্য।

—সে জমি গেল কার গর্ভে? জান না? নিল সদাশয় কর, আর

তারে দিয়েও দান করালে, হোমিও হল হল। তোমার ক্ষমতা আছে, ভেল্‌কি দেখাতে পার। সদ্‌নার নামও নাই, আর আইন তো গুলি মারা হল। তবে এখন খাস জমি দিতে পার না কেন?

কি প্রলয় তালে বাজে নিঃশব্দ মাদল।

—তুমি চাও না যে এ গ্রামে স্কুল হোক, তাই না মথুরবাবু? মথুর চন্দ্র মাহাতো?

মথুর মাহাতো চেঁচিয়ে ওঠেন, আমার চরিত্র হনন করা হচ্ছে। আমি এ কারবারে নাই। এসব কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র বিনা কিছু নয়।

সূর্য সিং বেপরোয়া।

—তাহলে বীরেনবাবু জিতল কি করে? বলতে পার, বলতে পার তুমি। কিন্তু শত চেঁচালেও সদ্‌নার কথা কেউ ভুলবে না। এমন কত হয়েছে, হয়ে যাচ্ছে···

মথুর লাফিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করেন। দিশারায় গ্রামের মানিক মুদি তাঁকে জাপটে ধরে বসান।

ধনঞ্জয়ের মাথা নিচু।

মানিকবাবু বলেন, মথুরবাবুকে বাদ দিয়ে কমিটি গড়া সম্ভব নয়। কথাটাও সূর্যবাবু, খুব কড়া বলেছ। যে যার হাঁড়ি উল্টালে অনেক ভাতে পোকা বেরোবে। আমরা এর চেয়ে আসুন, মিলেমিশে থাকি। দরকার নাই স্কুলের। কলের ব্যাপারেও বলি, জমিভূমি নাই, আপনারা আগালেন কেন? আমাদের বা ডাকলেন কেন? জাল নাই, বড় মাছ ধরবেন। গাছ নাই, ফল খাবেন, তা কি হয়?

মথুর মাহাতো সমর্থক পেয়ে মাথা নাড়েন।

এমন সময়ে, আজও ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, এমন সময়ে ভিড়ের পাশ থেকে এগিয়ে এসেছিল পরমি কাকী।

—আমি বুলব্য ভাস্তা!

—তুমি কি বলবে কাকী?

মথুর সতাচ্ছিল্যে বলেন, এটা স্কুলের ব্যাপার। তুমি মেয়েছেলে, কি বলবে গো সাওনার মা।

পরমি সগর্বে বলেছিল, "আপনি" বুলেন কেনে? আপনি তো সান্‌থাল লও, মিঞাছেলারে "আপনি" বল না তুমার সমাজে? কার সাথ কথা বুলছ? সাওনার বাপের অষুধ খায় নাই তুমার বাপ?

সবাই চুপ। এ আরেক রকম নিঃশব্দ।

ধনঞ্জয়ের দিকে সে বলে, আমি দিব জমি।

—তুমি দিবে জমি?

ওর চেয়ে জমিভূমিবান মানুষগুলি এ-ওর দিকে চায়, সে-তার দিকে।

ধনঞ্জয়ের বুক ফুলে ফুলে উঠেছিল।

পরমি হাত তোলে, হাতে কাস্তেটি ধরা, খড় কাটছিল, কাটতে কাটতে চলে এসেছে, দোর-গোড়ায় মিটিং!

—আমার বাস্তু কত, ভাস্তা জানে।

—একশত কুড়ি দশক জমি।

—আমি দিলাম বাস্তু। লাও, জমি লাও, ইস্কুল কর! আমার বেটারা পড়তে পায় নাই। সাওনার বাপ বলি গিছে লিখিপড়ি জানি নাই তাতে লোধাডি হতে উচ্ছেদ। তা সরকারের এত বড় রাজত্ব, তার জমি নাই! তবে আমি দেই?

—কাকী, তুমি থাকবে কোথা?

—কেনে গো ভাস্তা, আমার জমির একপাশে তুরাই ঘর উঠায়ে দিস। লিখাপড়া করে জমি দিব, হাঁ!

পরমি কাকী সম্রাজ্ঞীর মত দাঁড়িয়েছিল। আনন্দে উন্মত্ত চন্দ্র সিং বলেন, কি দেখালি মা! বল হে, পরমি সরেনের জয়! বল বল। কিন্তু সাওনা?

—তেমন বেটার জন্ম দিই নাই। এ জমি বা এল কুথা থিকে? যখন বসত উঠালাম, আমার বাপ, মরি গিছে, হাঁ, সাপমারা গ্রামের

টুলুরাম মুর্মু, বাস্তু কিনার টাকা দেয়। সি কথা বুলি নাই কখুনো। আজ পরকাশ করলাম। দশ কুড়ি টাকা! তাথেই সেদিনে··· একশত বিশ দশক!

জয়ধ্বনি উতরোল, উতরোল। ধনঞ্জয় হেঁকে বলেছিলেন, স্কুল হবে পরমি সোরেনের নামে।

পরমি কাকী হাসছিল।

ধনঞ্জয় কাঁদছিলেন। যার আছে সে দেয় না। যার নাই, সে বাস্তু দান করল অজয়, ইতিহাস হয়ে গেল শালবাড়ি গ্রামে, দেখলে তুইও অভিভূত হয়ে যেতিস।

এমনি করেই পরমি সরেন জুনিয়ার হাই স্কুলের সূচনা হয়েছিল তোতাবাবু। মথুরবাবু সাক্ষী আছে।

মথুরবাবু চেঁচিয়ে বলেছিলেন, চাঁদা ওঠান, স্কুল গড়ুন, পরমি সরেন জুনিয়ার হাই স্কুল গড়ে তুলুন।

মানিকবাবু হাত জোড় করে নমস্কার করেছিলেন ও হঠাৎ আবেগ-পূর্ণ গলায় পরমি কাকীকে রানী ভবানী, রানী রাসমণি, মহারানী স্বর্ণময়ী, রানী অহল্যাবাইদের সঙ্গে তুলনা করে বক্তৃতা দেন।

ধনঞ্জয় সভার সমাপ্তি করেন।

—রানী মহারানীদের অনেক থাকে, দান করলেও কিছু গায়ে লাগে না। আমার পরমি কাকীর দান তার চেয়ে অনেক, অনেক বড়। তার দানের কথা ইতিহাসে লেখা হবে না, কেউ জানবে না। ভারতবর্ষে···এই প্রথম...এক নিরক্ষর আদিবাসী কৃষক রমণী ···শিক্ষা বিস্তারের জন্য...বাস্তু সহ জমি দান করলেন! আমার পরমি কাকী...

অজয়ের মৃত্যুর পর এমন প্রচণ্ড ধাক্কা আর কিছুতে লাগে নি বুকে। এই ধাক্কার প্রচণ্ডতা ধনঞ্জয়কে যেন জীবনের চলমানতায় ফিরিয়ে আনল।

সেদিনও পরমি কাকী সাম্রাজ্ঞী। কাস্তে সহ হাতে সকলকে নমস্কার করে সে সভা থেকে সরে গেল।

পরমি কাকীর তিন বিঘা, সাওনার চার বিঘা, সরস, সরস জমি।

ধনঞ্জয় পরমির কাছে এলেন সে রাতেই।

—তোমার বাবা বাস্তু কিনে দেয় তা তো বল নি।

—বুলব কারে? বুলব কেনে?

—আজ তো বললে।

—তবে শুন। বাপের আমরা দুই বিটি, পরমি আর সুমি। সুমিলা। সুমি বাপের কাছে থাকল, সাত বিঘা জমিন ভোগ দখল করল। বাপের হল পেটে জল। পেট ফুলি গিছিল, কি রোগ হয় সিটা? সাওনার বাপ গেল, অ্যানেক অষুদ করল। তখুন তো লোধাডিতে মাটি নাই, আমরা খুব হেরাকেরা। তা বাপ বুলল, আমি মরি যাব, তুর মাও নাই। আর ন'বিঘা জমিন তুর খুড়াত ভাইরা নিবে। তু কিছু পাবি না মা! তা লে, টাকা লে।

—টাকা ছিল?

—টাকা ছিল, কাঁড় ছিল, জমিন ছিল! পিতলের বাসন, নিম-কাঠের সিন্দুক, স—ব ছিল। সাপমারা আমার পিত্তিপুরুষের খুটকাটি গ্রাম। বাবারা দখল ছাড়ে নাই।

লণ্ঠনের দিকে চেয়ে পরমি কাকী বলে, জমিন দু'বিঘা বেচি বাপ পঁচিশ-বিশ টাকা দু'বারা দেয়। দশ বিশে বাস্তু। পনেরো বিশে... সাওনার বাবা বুলল, উ টাকা তুর। তাথেই তিন বিঘা জমিন... এত কথা বুলি নাই, বুলতে লাজ লাগে।

—কাকী! সাওনা, চাঁপা, ওরা...?

—সাওনা!

পরমি কাকী আর কিছু বলে নি।

সাওনা খুব শান্ত। খুব চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। চাঁপাও তাই। সাওনার সন্তান হয় নি। বাবার মত আবার বিবাহ সে করেনি।

চাঁপাকে সে অত্যন্ত ভালবাসত। সাওনা মায়ের স্বাস্থ্য, বাবার শক্তি পায় নি।

পরমি কাকা তার আশ্চর্য, আশ্চয চোখ তুলে বলেছিল, নদী মধ্যে যায়। জমিন্ হই যায়। একোটা মানুষের বংশও তেমন চলি যায়। ভটকার সন্তান আছে, বংশটো থাকি যাবে। আমার পর সাওনা চাঁপাতেই শেষ!

পরমি কাকীরা গ্রামের উপান্তে ঘর তুলে চলে গিয়েছিল, সেও অনেক পরে।

ধনঞ্জয়রা গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলছিলেন। স্কুল অনুমোদনের জন্য দিকে দিকে কত না আবেদন করা হয়। তার কপি আছে।

…এরপর বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হয় কিন্তু সংগৃহীত চাঁদা প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায়, পরমি সরেনের অনুমতিক্রমে সাওনা সরেন তাঁহার সঞ্চিত অর্থ এবং পৈতৃক অংশের জমি বিক্রয় করিয়া আড়াই হাজার টাকা দান করিলেন…

কে বিশ্বাস করবে এই আশ্চর্য কাহিনী?

আজ তোমার কথা বারবার মনে হচ্ছে পরমি কাকী! জমি দিলাম, গ্রামের পঞ্চজন ঘর তোলে না কেন, অ ভাস্তা! আমার নামে ইস্কুল ঘর উঠাবি কবে?

মাটির ঘর হবে, জমি অনেক। শক্তপোক্ত চারটি ঘরে ক্লাস হবে, একটি ঘরে হেডমাস্টারের আপিস, লাইব্রেরি, সব হবে, একটি ঘরে টিচাররা বসবেন। ছয়টি ঘর রেখে টানা দালান। টাকা তো কম পড়ে যাচ্ছিল।

কুসমা, ভেড়ামুড়া ও নামোতো গ্রাম দেবে দরজা জানলা। পাতরখুড়া ও দিশারায়। ডাহপাড়া ও ছোট কাঁড়রা দেবে বসার ও পড়ার বেঞ্চ। শালবাড়ি ও ছোটতরন দেবে আলমারি, শিক্ষকদের বসার চেয়ার ও টেবিল। ব্ল্যাকবোর্ড।

কয়েকটি গাছ। তা তোমরা কাটছ, ব্যবসায়ীকে বেচছ, ব্যক্তি-

মালিকানার গাছ, স্কুলকে দাও। ঘর তোলার খরচ অনেক, পরমি কাকীর কুয়োটা সংস্কারাভাবে নষ্ট। সেটাকে সংস্কার করতে হবে। সামনের জমিটা হবে খেলার মাঠ। তবে পরমি কাকী বলেছে, আমার জমিন্ ঘের চিন্ন উ গাছগুলান্, উ কাটতে দিব নাই।

না, মহুল, সিধা অর্জুন গাছগুলি কাটার কথাই ওঠে না। কাটা হয় নি। তবে কয়েক বছর বাদে ঝড়ে পড়ে যায় সিধা গাছটি। সে সকলের থেকে সরে একলা বড় উদ্ধত তেজে লম্বা হয়েছিল। মেঘ জলের খবর নিত বোধহয়। ঝড়ে সে পড়ে গেল। ঘর তো উঠছিল না।

প্রভঞ্জন মাহাতো এক কথায় টাকা দিতে পারতেন। বিড়াগ্রামে তাঁর বড় কাপড়ের দোকান আছে। কিন্তু কমিটি করবে মথুরকে নিয়ে, টাকা দিব আমি?

এভাবে দিন যাচ্ছিল। অবশেষে সাওনা এল রূপচাঁদ টুডুর কাছে।

—ইস্কুলের মিটিং ডাকা করান কেনে?

—কেনে সাওনা?

—মিটিঙে বুলব।

—কি বুলবি তু?

সাওনা ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, নিবার হাত অ্যানেক, দিবার হাত মিলে না। তা মা বুলছে, আমিও বুলি, বিচে দিব তিন বিঘা। জমান্ টাকা ভি দিব।

—ওই তিন বিঘা বিচবি? তু কি পাগল বাউরা?

—কেনে রূপচাঁদ বাবু? টাকা না হলে ঘর হবে?

ওই সরস, নিচু, সুফসলা জমি, পরমি সরেনের ও সাওনার সঞ্চিত টাকা, সেই দুই হাজার পাঁচশত একাত্তর টাকা দিয়ে ঘর উঠেছিল। বিড়াগ্রাম ব্যাঙ্কে পাঁচশত টাকা স্থায়ী আমানত করা হয়।

পঞ্চ গ্রামের লোকরাই চাল বিনিময়ে শ্রম দিয়ে ঘর তোলে। ভূমিহীন মানুষগুলি ঘর তুলেছিল।

আজও মনে আছে, স্কুল উদ্বোধনের দিন সে কি উৎসব! মাঠে গাছে গাছে দড়ি বেঁধে পাতার মালা ঝুলছিল। স্কুল ঘরের সামনে তোরণ হয়েছিল। লাল নীল কাগজের শিকল। তোরণের এদিক থেকে ওদিক ঝাঁটিফুলের মালা। পরমি কাকীকে ঘিরে মাদল ধমসা বাজিয়ে নেচে নেচে নিয়ে আসছিল মানুষ।

আমন্ত্রিত অতিথি ব্লক অফিসার খুব অবাক।

—এ ভাবে কি স্কুল উদ্বোধন হয়?

—এই স্কুল এ ভাবেই হয়।

ধনঞ্জয় বলেছিলেন, দেখ কাকী! কালোর উপর সাদায় লেখা শালবাড়ি পরমি সরেন জুনিয়ার হাই স্কুল, তোমার নাম লিখা।

সাওনা ও চাঁপা কাকীর দু'ধারে। গ্রামবাসী তো তাদের নামে জয় দিচ্ছিল।

পরমি কাকী ঈষৎ হেসে ফুলের মালা ছিঁড়ে, ঝকঝকে ঘটি থেকে মাটিতে জল ঢেলে স্কুল উদ্বোধন করে দিল।

আনন্দ, আনন্দ, উত্তাল আনন্দ। বর্ষা নামার আনন্দ। মাটি ভিজে বতর হবার আনন্দ।

ফোটো তোলানো হয়েছিল।

ছবিটি ধনঞ্জয় মাথার কাছে দেওয়ালে টানিয়েছেন। পরমি কাকী দাঁড়িয়ে আছে যেন রানী।

আশুতোষ ধমসায় ঘা দিয়ে কবিতা পড়েছিল,

"বাৎসল্যের বাহুডোরে বাঁধা থাকো, না থাকা সংসারে
দারিদ্র্যের মাদকতা মহুয়ামাতাল অন্ধকারে
সামান্য ক্ষুধার অন্ন ভাগ কর অসামান্যভাবে
দ্বিধাহীন মমতায় সমতার অম্লান গৌরবে।
শ্রমজীবী-প্রসবিনী, হে আমার মানস-জননী!
কে তোমাকে দাসী বলে? দেবী তবে কোথাও দেখিনি
শাল-মহুলের দেশে, সর্বংসহা অরণ্য-প্রতিমা

স্নেহের কোমল স্পর্শে ভুলে যাই ভৌগোলিক সীমা ॥"

কাকী বলেছিল, অ ধনা!

—কি, কাকী?

—আমার কথা বুলছে?

—হ্যাঁ কাকী! আগেই যে বলল, "সংগ্রামী সাঁওতাল জাতি স্নেহময়ী জঙ্গল জননী"…?

—লাজ লাগাই দিলি তুরা…

—মোটেই না।

ধনঞ্জয় ফিসফিস করে বলেছিলেন, লজ্জা তো তুমিই দিয়েছ সকলকে। এমন করে সর্বস্ব দান করে সমাজের শিক্ষিত, বড় লোকেদের লজ্জা দিয়েছ।

পরমি কাকী নিদারুণ লজ্জাই দিয়েছিল। তার সর্বস্ব দান দেখে লজ্জাতেই হয়ত বেশ কিছু দান পাওয়া যায়। কমিটিতে তাঁকেও নেওয়া হল যখন, তখন প্রভঞ্জন মাহাতো কুয়াটি সংস্কার করে বাঁধিয়ে দেন। তাঁর নামাঙ্কিত ফলকও তিনিই তৈরী করে দেন। সাওনা সরেন স্বাধিকারেই কমিটি মেম্বার হয়।

স্কুল জমে উঠেছিল।

তারপর বাহাত্তরের নির্বাচন হল পরমি কাকী, আমার চিরস্নেহময়ী জঙ্গলজননী। মায়ের কাছে যে স্নেহ পাইনি তা তোমার কাছে পেয়েছি।

আর সাওনা!

সে বলেছিল, আমাক্ তু অক্ষর চিনাতে পারিস? কমিটিতে আমি বুকাটা লাজ লাগে!

তখনি পরমি কাকী! কাজের বান ডেকেছে মনে, সন্ধ্যায় তিনদিন ছেলে মেয়েদের কোচিং। পয়সা দাও, দু'চার টাকা দাও। আর চারদিন নিরক্ষরদের সাক্ষর করা, সে কাজ আমি আর রূপচাঁদবাবু করতাম। সাওনা অজ-আম অবধি পৌঁছেছিল, তারপর পারে নি।

ঘরটা তোমার চলে গেল পাড়ার প্রান্তে। তুমি আসতে, জানতে চাইতে, সরকার মানি নিল ইস্কুল? টাকা দিছে?

পরমি কাকী! আমরা বাহাত্তর থেকে সাতাত্তরের মধ্যে একবার মাত্র স্কুল পরিদর্শন করাতে পেরেছিলাম। সেটা ১৯৭৩ সালের শেষে। সেটা করানো গিয়েছিল বলেই আজ স্কুল হয়তো অনুমোদন লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

ছয়

ইস্কুলের কপাল যে পাথরচাপা হয়ে যায়। সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য ছুটোছুটি করে ধনঞ্জয়রা অদৃশ্য কাচের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বারবার ফিরে আসেন। সে কথা বুঝেই কি পরমি সরেনও ভেঙে পড়ছিল?

জানি না পরমি কাকী। জানি না। তবে তুমি আসতে বিকালে। দাঁড়াতে অর্জুন গাছের নিচে, স্কুলের মাঠে ছেলেমেয়েরা খেলত, চেয়ে দেখতে।

স্কুলও তো এক অবস্থায় থাকে নি। কমিটি বদলে গেছে। শিক্ষক বদলে গেছে। প্যারীলাল সিং চলে গেছে ছোটতরণ প্রাইমারি স্কুলে। মহেশ মুর্মু তো গেল গ্রামীণ ব্যাঙ্কে। মথুর মাহাতো বললেন, আমাদের জমানা নেই, স্কুলের বিষয়ে কিছু করবারও নেই।

এমন সময়ে, আমি যখন প্রণববাবুর সঙ্গে সেকেণ্ডারি এডুকেশনের ডিরেক্টারের আপিসে কলকাতায়, আপিসের ঘরে ঘরে ঘুরছি আর ঘুরছি, তখন যে তুমি অসুস্থ, তা তো জানি নি।

ধনঞ্জয় কলকাতায় শুনে এসেছিলেন, শালবাড়ি স্কুলের ব্যাপারে মেদিনীপুর আপিস না জানালে কিছু করা যাবে না।

নির্বাচিত সদস্যকে মোটে ঘামানো যায় নি। তিনি জানতেন যে বাহাত্তরে জিতেছি, সাতাত্তরে পড়ে যাব। কোথায় শালবাড়ি, কে পরমি সরেন, কোথায় ইস্কুল, সে সব কথা কে ভাবে!

মাথায় ও ঘাড়ে তোমার যন্ত্রণা হত ?

জানি না, তুমি কখনো বল নি।

তুমি শুধু বলতে জানতে, মুড়ি খা বাপ, মুখখান শুকায়ে গিছে, ইস্কুল করছিস, মোর নাম জানাছিস ইখান হতে যি ছানাটা বেরায়, বড় ইস্কুলে ঢুকি যায়। পড়া খুব ভাল হয়। আমি শুনছি।

আমার বুক ছিঁড়ে যেত।

তুমি আর সাওনা যদি বলতে, আমাদের ঠকিয়ে জমি নিলি, টাকা নিলি, ইস্কুল অনুমোদন করবার মুরোদ নেই সে কথা বলিস নি?

তা বললে এত অপরাধবোধ হত না।

তুমি বলতে, হুই যাবে ভাস্তা, ভাবিস কেনে ?

সাওনা বলত, হুই যাবে। তু ভেবে মরিস কেনে ?

সাওনা আরও বলত, ভুট লিয়েছে যারা, তারা সবারে লেজে খেলায়। পরভনজন মাইতো বুলে, লাল ঝাণ্ডার কালে ইস্কুল করছে, তাদের ধরুক গা ? আর মথুরবাবু বুলে, আপুন কি আমাদের দিন ? উ কেও দিবে না সহজে।

সাতাত্তরের পর,—গভীর, গভীর শান্তি যে তখন তুমি নেই, সাওনা নেই, বীরেনবাবু বলল, কেন ? অনুমোদন দিতে হবে কেন ? পরমি সরেন, আদিবাসী রমণী সর্বস্ব দান করেছে বলে ? এ রকম দান অনেকে করেছে, যাও যাও !

—অনেকে করেছে ? ভারতবর্ষে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আছে যে সামান্য কৃষক রমণী, নিরক্ষর এক আদিবাসী মহিলা, এমন অবহেলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সবাস্ত জমি দেয়। প্রায় সব জমি বেচে টাকা দেয় ?

চন্দ্রবাবু খুব তেতে বলেছিল। ফলে বীরেনবাবু আরোই বিগড়ে যায়।

কিন্তু তখন, আমি যখন কলকাতায়, বিকেলে আল ধরে ফিরতে গিয়ে মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয়ে তুমি আলেই ঢলে পড়েছিলে ?

তারপর, "ভাস্তা আসুক, বেবস্থা হবে" বলে ঘরেই পড়েছিলে মাটি কামড়ে ?

আমি বাস থেকে নেমেই খবর পাই। দৌড়ে দৌড়ে এসেছিলাম।

তুমি কি বলেছিলে ?

—বিড়াগ্রাম হতে…ডাকতার আনা করাল উরা…মাথার ভিতর …আসপাতালে যেতে বলে……ত নাই। আমার ভরসা নাই… সাওনা ডরি গিছে খুব…

—আমি নেব তোমায় হাসপাতালে।

—কেনে লিবি ? আমার জাহানটো উরা দিবে ?

—না কাকী। হাসপাতালে নেবই তোমাকে। ওষুধ কোথায় ? কি দিয়েছে ?

চাঁপা বলেছিল, খায় নাই।

ওষুধ দেখে আমি কি বুঝব ?

বিড়াগ্রাম থেকে লরি এনে, বিছানা পেতে, চাদরে রোদ আড়াল করে ঝাড়গ্রামে নিয়েছিলাম তোমাকে। তুমি আচ্ছন্ন গলায় বললে, ধনা জানে আসপাতাল রে সাওনা। তুর বাপরে নিছিল, আবার দেখ্ আমারে…

সাওনা কপালে হাত রেখে বসেছিল।

—তু সাওনারে দেখিস ভাস্তা। উরা বুঝে না কিছু। আমি সব সামালি রাখতাম।

—দেখব। দেখব। ভটকাকে খবর দিব ?

—দিস। তা দিস।

হাসপাতাল বলেছিল, ব্রেনে টিউমার সম্ভবত। কলকাতায় নিয়ে যান। একে তো কেস ভাল নয়, আমাদের এখানে…

তুমি যেতে চাও নি।

—মেদিনীপুরে সদর হাসপাতালে নিন তাহ'লে।

—এখানে চিকিৎসা সম্ভব নয় ?

ডাক্তার বলেছিলেন, এখানে ব্রেন স্ক্যান? ই ই জি? পয়সা থাকে প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে যান।

ওরা তোমায় রাখতে চায় নি কাকী। খারিজ করে দিচ্ছিল। তবু খুব মরিয়া হয়ে তোমাকে টাউনের বড় ডাক্তারের কাছেই নিয়েছিলাম।

তিনি বললেন, কলকাতা নিয়ে যান।

আমি বললাম, মাথার অসহ্য যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ দিন।

তুমি সাওনাকে আস্তে কি বললে।

সওনা বলল, মা বাড়ি যাবে।

ডাক্তার বললেন, পাঁচদিন আগে আনেন নি কেন?

তুমি রক্তাক্ত চোখ কষ্ট করে একটু মেলে আমাকে বললে, ঘরকে লিয়ে চল। ইথানে মরব নাই।

এই ডাক্তার বললেন, মেনিনজাইটিস। এ কয়দিন বিনা চিকিৎসায় থাকলেন বেঁচে—টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস নয়, নিউমোকোকাল নয়। ভাইরাস মেনিনজাইটিস বলে মনে হয়। জ্বরও আছে, এখানে টেস্ট করাতে হলে রোগী রাখতে হবে, হাজার দুই খরচ করতে হবে। এখন দেখুন!

তুমি সবাস্তু জমি দিলে, সর্বস্ব দিয়ে সাওনা ইস্কুলের জন্যে আড়াই হাজর টাকা দিল। কিন্তু সে টাকা থাকলে আজ তোমার চিকিৎসা হত।

তুমি বললে, ঘরকে যাব আমি। মাথা ফাটি যায়, সব জানি ঘুম ঘুম, সাওনার কথাও শুনতে পেছি নাই...

ডাক্তার বললেন, লাম্বার পাংচার করলে...

সাওনা বলল, না। মাকে ঘরে লিব।

তুমি ক্ষীণ স্বরে বললে, সাওনার বাপ জানত অষুদ। দমকটকৈ গাছের কাঠ গুঁড়া করে মাথায় লেপে দিত। ব্যথা নামি যেত, সে তো নাই।

কাকা নেই। চামটু লোধা আছে। আছে রানীসলে বনমালী হেমব্রম। গ্রাম দেশে ওরাই ভরসা। আজ সাঁওতালী আদিবাসী চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে কত গবেষণা, কত টাকার খেলা, কত সেমিনার। তাতে আদিবাসী চিকিৎসক, আদিবাসী জনপদ, কারও কোন লাভ নেই। "আদিবাসী" শব্দটা যেন মূলধন। যে পারছে, ব্যবসা করে খাচ্ছে।

চন্দ্রবাবু এসে পড়েছিল। বলল, নাড়ী ভাল নয়। দুর্বলে সবলা গতি সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা। মা ছেলে বলছে ঘরে চল। এক্ষেত্রে ঘরে না নিলে ··

হাতে নেই টাকা, বুদ্ধি দিয়ে বাঁচায় এমন একটা লোক নেই। ঝাড়গ্রাম বা মেদিনীপুরেই আমরা অসহায় কলকাতা তো আমাদের কাছে জঙ্গল।

আমি বললাম, যাবে, বাড়ি যাবে।

—তাই লিয়ে চল্ তু। ইথা মরব কেনী?

ট্রাকে তোমাকে শুইয়ে ধীরগতিতে ট্রাক চালিয়ে পরদিন শালবাড়ি।

সহসা তুমি বললে, তখুন হেঁটে গেছি। হেঁটে আসছি...দিনভর মাঠে কাজ··গোহালে কাজ···ঘরে কাজ···অষুদ পালা তৈরী করার কাজ...বিছাটো রাখি গেল না, কেউ লিল নাই। হারায়ে গেল... আর ইস্কুলটো? সরকার মানল নাই। মানবে, মানবে আমি দেখব নাই।

তোমাকে ঘরে শোয়াতে চামটু ছুটে এসেছিল।

—সরেন বউ। আমারে অষুদ দিতে দিবে?

সাওনা বলল, দাও কেনে, আরাম দাও টু' খানি

—দেব অষুধ।

চামটুর সে কি ব্যাকুলতা।

—সব দেখছি তার কাছে, কত শিখছিলম। অষুদপালা মিলে না, শিকড় বাকল নাই। জঙ্গল কাটি শেঁসান করি দিল গরমেন্‌। জঙ্গল নাই তো লধাও নাই। তবুও আনছি দমকটকৈ কাঠের গুঁড়া।

তোমার মুখে হাসির রেখা।

—সরেন বউ, মাথায় পরলেপ দেই। সাওনার বাপ দিত আমিও দেই। আরাম হবে। আরাম হবে, পাতরখুড়া হতে আনলম। যাক, বেথাবেদনা নামি যাক। অষুদ! ভেকু সরেনের নাম করি। কাজ করো হে! সারন বউ দুটা নাই গ্রামে, দেশেই নাই। কি দেখ ভাস্তা? লধা আসি সানতালরে অষুধ দেয়।

সাওনা সবিস্ময়ে বলে, বাবাও দিত।

কিন্তু সাঁওতাল, লোধা, মুণ্ডা, সকল অদিবাসী কবিরাজ জানে ওষুধ দিতে, অসুখ যখন চেনা।

করোনারি, সেরিব্রাল আক্রমণ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, এনকেফালাইটিস, মেনিনজাইটিস, ক্যানসার, ভাইরাসবাহিত মেনিনজাইটিস, এসব তো ডাক্তারই ধরতে পারে না। দেরি করে। এ সব রোগের অষুদপালা তারা জানবে কি করে?

তাদের যদি শেখানো হত, ছবি ও চার্টের সাহায্যে এ সব রোগের কথা বোঝানো যেত, তারা যা জানে তার উপর গবেষণা করে অষুদপালার জীবকউদ্যান তৈরী করা যেত, তাহলে...

আমি দেখেছিলাম, এ সেতুবন্ধন হয় নি।

সে ঐতিহ্যপরম্পরায় যে জ্ঞান লাভ করেছে তাকে পাত্তা দেয় নি কেউ। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এনে দিতে পারে নি শালবাড়ি গ্রামে পরমি সরেনের দরজায়। বনৌষধির পালয়িত্রী, জন্মদাত্রী প্রাকৃতিক বনকে ধ্বংস করে দিয়েছে আর আজ, সব যখন শ্মশান, তখন পণ্ডিতদের ডেকে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করে "সাঁওতালী মেডিসিন" নিয়ে হইচই করছে, যে সেমিনারে ভেকু সরেন বা চামটু মল্লিক ব্রাত্য। ওদের তো সার্ট, প্যাণ্ট, জুতো, সানগ্লাস নেই। ওরা

তো "করাইডোর" বা "সিটুয়েশন" বা "স্কেডিউল" বলতে শেখেনি। এ সব বহিরঙ্গ ছাড়া আদিবাসীবিশারদ হওয়া যায় না।

এসব ব্যাধিও উন্নাসিক বড়।

ভাইরাসবাহিত মেনিনজাইটিস চামটুর প্রলেপে কোন সাড়া দিল না। সম্ভবত তুমিও আরাম পাও নি কাকী। কিন্তু সাওনার আকুল ও অসহায় ডাক, আয়ু, আয়ু, আয়ু, মা, মা, মা!

তুমি বলেছিলে, ভাল লাগছে। ভাল লাগছে বাপ। ফিসফিস করে বলেছিলে, ইস্কুল? হবে নাই? তারপর বলেছিলে, ঘুম লাগছে।

তুমি চোখ বুজলে, এলিয়ে গেলে। আমরা ভাবলাম, ঘুম। আসলে তো ওটা কোমা।

গুণধর গিয়ে সাইকেলে চাপিয়ে বিড়াগ্রাম থেকে নবনী ডাক্তারকে এনেছিল।

ডাক্তার বলল, কোমা এসে গেছে। কিছু করার নেই।

সে ইনজেকশান বের করেছিল।

সাওনা ওর হাত ঠেলে ফেলে দিল।

বহিরাগত দিকুদের অনুপ্রবেশ ও তোমাদের উচ্ছেদ, এ তো আদিবাসী আজও ঠেকাতে পারে না। সে জানে না রাজনৈতিক দল, জমিলোভী সভ্য মানুষ, সরকারি লোকজন, আদালত, এরা কোন অস্ত্রে লড়ে। উচ্ছেদ হয়ে যায়।

বহিরাগত ভাইরাসবাহী মেনিনজাইটিসকেও ঠেকানো গেল না। সে তোমার পাথরপ্রতিমা দেহ, শ্রমকঠিন হাত ও পদতল, মেঘকুন্তল চুল সব অধিকার করে নিল। তোমার আশ্চর্য প্রাণশক্তিকে উচ্ছেদ করে বের করে দিল। ধীরে, অতি ধীরে তুমি নিভে গেলে।

সাওনা হারাল মা, আমি হারালাম আশ্রয়।

সাত

হ্যাঁ, পরমি সরেনের শেষকৃত্য উপযুক্ত সমারোহে পালিত হয়। তেল হলুদে রঞ্জিত পরমি সরেন তখন উজ্জ্বল এক স্বর্ণপ্রতিমা। ধনঞ্জয় পাশে পাশে চলেছেন।

রূপচাঁদ মাথা নাড়ছেন। বিমূঢ় সাওনার পাশে যাচ্ছেন, নিচু গলায় বলছেন, চৌমাথা আসি গেল, উকে নামা।

খই ও তুলাবীজ ছড়িয়ে দেয় কে।

শ্মশানেও কত কৃত্য। কাকীর ঠোঁটে কি নির্মল হাসি? দেখ্ ধনা, কত লিয়ম পরথা মানবে তবে আমি জ্বলি যাব।

তেলহলুদ মাথাইছে। হাত-পা-মুখ ধোয়ালছে ভটকা, আমার বড় পুত্ত। লতুন বস্তরে ঢাকি দিছে।

কয়েকটি গ্রাম ভেঙে পড়েছিল। সুসজ্জিত চিতা শয্যা, দক্ষিণে মাথা, উত্তরে পা। একটি মুরগি বলি পড়ে। ওই তো কাকীকে নিয়ে যাবে স্বর্গে। ভটকা মুখে আগুন দিল, তারপর অন্য আত্মীয়রা।

ধূ ধূ চিতাগ্নি উর্ধ্বমুখী।

কাকী! আমি তোমার ইস্কুল অনুমোদন করাব। শোনো কাকী, আমি তোমার ইস্কুল...ধনঞ্জয় পাগলের মত হাহাকারে কেঁদে বলে-ছিলেন। এখানে আছেন সবাই। বলেন, শপথ করেন, পারমি সরেন ইস্কুল অনুমোদন না করিয়ে ছাড়ব না। সে ইস্কুলের কথাই বলে গিছে যে! চন্দ্র সিং ওর হাত ধরে টেনে এনেছিলেন।

জাতি হিসাবে পরমি সরেন, সরেন গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক সপ্তর্ষি,—যে না কি টুলু মুর্মুর আত্মজা, মুর্মু গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক কি নীলগাই? তা পরমি সরেনের মৃত্যুতে তো ধনঞ্জয় মাহাতোর অশৌচ হবার কথা নয়।

স্নান করেছিলাম। পাঁচদিন বাদে সাওনারা যখন অশৌচ মুক্ত হল "তেল-নাহান" করে, আমিও মাথায় তেল দিলাম।

আমি করছিলাম, না তুমি করিয়ে নিচ্ছিলে সব? আমি তো আমার বশে ছিলাম না কাকী। ওরা তোমাব অস্থি বিসর্জন দিল। বড় শ্রাদ্ধ হল তোমার। ভাণ্ডান।

আমি তখন আমাতে নেই। আমার মা, জন্মদাত্রী জননী, মমতা, সবাই বলেছিল, পরমি কি তোমার মা ছিল?

আমার কেন, কত জনের মা সে। খুদআমানি, তাও সে ভাগ করে খেতে জানত। আমাকে কতদিন বলেছে, বস্ কেনে? মুড়ি খা কান্‌টোড় আনছি। রস দিয়ে মুড়ি খা কেনে?

অজয়ের মৃত্যুর এক বছর পর বলেছিল, তার ভয় চলি গিছিল, নয় ধনা? হাটে ছাগল কাটে, মাঁস বেচে, তা রক্ত দেখি কান্দি দিছিল একদিন। ময়নার ছেলাটা মরি গেল। তা মরামুখ দেখি ডরি গিছিল। সি ছেলা, তার ভয় ডর কুথা পলাল তাই ভাবি। সানতালের তুক্‌খ দেখি ঘুচাতে গিছিল, তাই ভাবি!

পরমি কাকী!

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যেতে ভটকা তখনি চলে যেতে চায়।

আমরা বললাম, কাকীর শোকসভাটা দেখে যা!

ফোটো তো ওই একটি। তাই থেকেই বড় করে বাঁধিয়ে এনেছিলাম। খুব সুন্দর সভা। সাদা টগরের মালায় মালায় তোমার ছবি ঢেকে যাচ্ছিল।

আশুতোষ দলুই আমার মনের কথাটা বলে দিল!

"সংগ্রামী সাঁওতাল জাতি স্নেহময়ী জঙ্গলজননী
অন্নদার কাছে বর চেয়েছিল ঈশ্বরী পাটনী
তাহার সন্তান যেন মহাসুখে থাকে দুধে-ভাতে,
তুমি চাও "বাস্‌কে দাকা" ভুখা সন্তানের মুখে দিতে।
তোমার স্নেহের ঋণ দিন-দিন বাড়ে এ জীবনে
বিগত শৈশবকাল স্মৃতির শিকড় ধ'রে টানে
জাতি-ধর্ম ভুলে যাই, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে

অকৃত্রিম আত্মীয়তা গ'ড়ে ওঠে অজ পাড়াগাঁয়ে।"

ভটকা অবাক হয়ে দেখছিল। মায়ের সর্বস্বদানে ইস্কুল, মায়ের নামে সভা? অবাক, অবাক সে। সাওনাকে বলেছিল, এখন কি করবি?

—কেন, থাকব?

তাই তো থাকে মানুষ, কাকী! জীবনের দৈনন্দিনতা থাকে, শোকও থাকে। দৈনন্দিনতার দাবি আর শোক তো বিরোধী রাজনীতিক দল নয়। দুটোই থেকে যায়।

ভেকু কাকা মরে যাবার এক মাস বাদে মা বলেছিল তোমাকে, পরমি, তুই পারছিস এখনো ধান টোকাতে, টুং কুড়াতে, মন নিচ্ছে?

তুমি করুণা ভরে বলেছিলে, মাইতো দিদি, সাওনার বাপ চলি গিছে, সি মোরাদের খিদা-তিষ্টা তো লয়ে যায় নাই?

শোক হয়েছে বলে না খেয়ে পড়ে থাকব, কেঁদে চলব, এ বিলাসিতা তো গরিবের সাজে না।

সাওনা আর চাঁপা তো থেকেই গেল।

তুমিও থেকে গেলে।

সাওনা বলেছিল, দিন ভর কাজ কামে বিসরণ হয়্যে থাকি। কিন্তুক সনঝায় ঘরে বসল্যে মায়ের গামোছাটা…মাজনের ডিবাটা… মা যেমন আছে, ছাগলছেলি ঘরে উঠাবে আখুনি। মাথায় রক্ত উঠি গিছিল, লয়? কলকাতা লিলেও মা থাকত না, লয়? কঠিন বেধি হই গেল!

খুব কঠিন!

আর আমাকে তুমি কত কঠিন করে গড়ে দিয়ে গেলে কাকী? বাঁধনা পরবে গ্রামে উৎসবের কলরোল। পাঁচদিনব্যাপী উৎসব। গাই খেলানো চলছিল! মহুয়ামাতাল সাওনা শিঙাল বলদটা নাচাবেই। ওটা ওর লক্ষ্মী। চাষের সময় ওর বদল এ-ও-সে নেয়। খুব তেজাল বলদ। পরমি কাকী ওকে 'নাতি' বলত।

সহসা খুঁটা উপড়ে সেই বলদই সাওনাকে শিং বিঁধাবে পেটে, ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তা কে জানত ?

সাওনাকেও তো বাঁচাতে পারিনি আমরা। তুমি কি সব জেনেই বলেছিলে, লদী মরি যায়, বংশ মরি যায়, পিথিমির লিয়ম হয় ইটা ভাস্তা !

সাওনার সে কি বাঁচার আকাঙ্খা।

—মোরে বাঁচা তুরা। বউটার কেউ নাই আর ইস্কুলটা দেখি যাব। মা দেখল নাই তো আমি দেখি যাব। চাঁপারে মা ডাকতে কেও নাই।

আজ তো চাঁপাই আছে একা।

জীবনের দাবি তো সবচেয়ে বড়। চাঁপার কাছে আছে তার ভাইপো। সে চাষ করে, চাঁপার চলে যায়। যেমন সে আগে করত, তেমনি সে ঘর নিকায়। উঠান নিকায়। ধান শুকায়। দুধ বেচতে পাঠায় বিড়াগ্রামে।

তোমার গামছাটা দেখি না। কুলুঙ্গিতে মাজনের কৌটো আছে। ঘরের দেওয়ালে সাওনার মাথাল।

চাঁপা আমাকে বলে, মাইতো দেওর। মা দেখল না, মায়ের বেটা দেখল না। আমি ইস্কুলটো দেখি যাব তো ?

সাওনা দেখ, কেমন মানুষটা ছিল। মা-গত প্রাণ। বউ-গত প্রাণ। শাক পুড়িয়ে দিলে ভাত খেয়ে নিত। রেড়িওতে সাঁওতালী ভাষায় সংবাদ শুনতে যেত পাশের বাড়ি। কথা খুব কম বলত। ভোট এলে আমাকে শুধাতে আসত কারে ভুট দিব ? আমাদের কে দেখবে ? বল্ তু ? সাচাই মানুষ তো মিলে না। ভুটবাবুরা ভুট লিয়ে চলি যায়।

এরকমই ছিল সাওনা। স্কুল কমিটিতে আছে বলে অক্ষর পরিচয় শুরু করেছিল। আর শালপাতার দনা তৈরি করত মেশিনের মত। সে ছিল দক্ষ চাষী। বিনা সেচে চীনাবাদাম করেছিল একবার।

মোরগ লড়াইয়ে তার মোরগ জিতত। চাঁপাকে সে রূপোর সরু হাঁসুলি পরিয়েছিল লুফসলের বছরে। আর তুমি ভালবাস বলে ও কান্ঠাড় কাঁঠাল কিনে আনত।—চল কেনে আমার সাথ? কান্ঠাড় দানা পুড়াছে বউ। মুটি দিয়ে খাব।—কাঁঠাল বীচিও ও পুঁতে দিত। হোক, গাছ হোক।

এমন একটা মানুষ, যে না কি লক্ষ লক্ষ মানুষের মত, সেই সাওনা কেমন চলে গেল।

ভটকা এসেছিল। সনিঃশ্বাসে বলে গেল, গ্রাম হতে বাবার নামটো উঠি গেল রে।

নাম যায়, নাম আসে।

চাঁপার ভাইপো একদিন ও ঘরের কর্তা হয়ে থেকে যেতে পারে। বেচে দিয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু ওই ঘর-ভিটা-জমি চিহ্নিত, নামাঙ্কিত। রূপকথা যেন। ছিল ভেকু সরেন, সে এক আশ্চর্য কবিরাজ। যুগান্ত সঞ্চিত জ্ঞান ছিল তার। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে সে জানত কোন আলোকলতা তুলতে হয়, কোন সময়ে বাজবারণ। গাছপালা তার সঙ্গে কথা বলত, সে ছিল অরণ্যের বিশ্বাসভাজন।

ছিল একজন পরমি সরেন, যার মত সুন্দরী নেই ত্রিভুবনে। যাকে দেখে মনে হত জগজ্জননী যেন, যার সৌন্দর্য সমভ্রম জাগাত। তার ছিল অঢেল চুল, টানা ভ্রু, টানা চোখ, পাথর প্রতিমার মত কোমর, বুক, হাত, গলা চিবুক। সে মাথায় ধান নিয়ে ফিরত যখন, মনে হত মাঠের লক্ষ্মী। সাম্রাজ্ঞীর সহজাত দার্ঢ্য অরণ্যের মত মমতাময় হৃদয়, স্বামীর উপর অপার ভালবাসা, সব ছিল তার। দেখ, দেয়ালে তার আঁকা লতায় কত ফুল আজও ফুটে আছে।

ছিল একজন সাওনা সরেন, যে ছিল বড় মা-গত প্রাণ, যে বউকে বড় ভালবাসত আর সন্তান নেই বলে আরেকটি বিয়ে করতে যায়নি। বউ আর মা আর ক্ষেত-গরু-মুরগি-ছাগলে ছিল তার প্রাণ। শীতের নদীর মত শান্ত সে। বড় আত্মসম্মানী। মায়ের কথায় অবহেলে

জমিভূমি দান করতে দিয়েছিল মাকে। কোনও আপত্তি করেনি।

এইসব মানুষ খুব বড় মাপের ছিল হে। কত কষ্টে, অর্জিত সামান্য জমিভূমি তারা পরের ভালর জন্যে দান করতে পারত। শিক্ষার জন্যে। ওই স্কুল হলে তাদের কোনও লাভ নেই। ওই মহান মহান দানের মূল্য বোঝার মানুষ নেই। সে সব হিসেব ওরা করেনি। নিজ বাসভূমে চির পরবাসী আদিবাসী পরমির এ কাজ তো মহান আদর্শ।

বললে বলত, লাজ লাগছে রে।

সাম্রাজ্ঞী যেন। প্রকৃত সভ্যতার ধারয়িত্রী যেন। দিয়েছি, নামের জন্যে দিইনি। দিয়েছি, ফুরিয়ে গেছে। আমার কাজ আমি করেছি। তুরাদের কামটো তুরা কর্। জীবনে সময় বড় কম রে বাপ! কাম করি যা।

ধনঞ্জয় উঠলেন বিছানা ছেড়ে। হ্যাঁ, মনে মনে করজোড়ে পরমি কাকীর জীবন ঘিরে প্রদক্ষিণ করছিলেন। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিলেন।

কি ভীষণ নীরব উপেক্ষা বারবার।

সাতাত্তরে বীরেনবাবু বিধায়ক। একাশিতে তোতাবাবু।

তারপরেও তোতাবাবু।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মথুর মাহাতো অঞ্চল প্রধান।

মথুরবাবু কমিটির সভাপতি। কিন্তু কমিটিও তো বদলে বদলে যায়।

লোধাপাড়ার ব্যাপারটিই ছিল শোচনীয়তম।

সরকারি অনুমোদন পেলে আদিবাসী শিক্ষার্থী পায় সরকারি অনুদান। অনুদান না পেলে তাদের পড়া হয় দুর্ঘট।

কত মুসাবিদা করে বারবার চিঠি লেখা হয়েছিল।

গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল প্রধান, জেলা পরিষদ সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতি সভাধিপতি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সচিব, শিক্ষা অধিকর্তা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী—

প্রত্যেককে প্রথমে আলাদা আলাদা চিঠি দিই পরমি কাকী। কোনবার তোমার কথা লিখতে ভুলিনি। প্রতিবার চিঠি লেখার আগে আলোচনা করা হত।

বস্তুত, শালবাড়ি গ্রামবাসীরই ছিল মূল দায়িত্ব। স্কুল অনুমোদন পাচ্ছে না, সম্মান থাকছিল না। অভিভাবকদের সাহায্য, নিজেদের চাঁদা, এই দিয়ে দিয়ে…এই দিয়ে দিয়ে…

ধনঞ্জয় হাত মুখ ধুলেন। জামা পরলেন। পায়ে পরলেন রবারের চটি।—বেরচ্ছি, দোর দাও।

– দিচ্ছি, তুমি এস!

এখন মমতা কাপড় ছাড়বে, সন্ধ্যা দেবে। এক গাল মুড়ি খাবে। তারপর স্টোভে রান্না গরম করবে, চালের গুঁড়োর রুটি। বাড়িতে আর সব কাজ করে মুকুন্দ।

গরু তোলা, খড় কুচানো, চাষ দেখা—মমতা ওর সহায়তায় সব চালিয়ে নেয়। ধনঞ্জয় কিছুকাল না থাকলেও বোধহয় এ বাড়ির কোনও জায়গা শূন্য হবে না।

ধনঞ্জয় বেরিয়ে আসেন।

শিক্ষকদের মাইনে দিতে হয়েছে যৎসামান্য। গুণধর চলে গেছে। অশিক্ষক কর্মচারী এখন দীনু পাত্র। করণিক ধনঞ্জয় কোনদিন বেতন নেননি। সন্ধ্যার কোচিং থেকে যা পেয়েছেন, পঞ্চাশ, ষাট।

এখন অবশ্য পনেরোজনকে পড়ান। একশ টাকা হয়।

বৃদ্ধ সূর্য সিং বলেন, বি এ পাস করল না ধনঞ্জয়, কিন্তু বাংলা ইংরেজী অঙ্ক চর্চা করে করে খুব শিখেছে।

প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েদেরও ইংরেজী শেখান। বারো আনা অবৈতনিক। চার আনা বৈতনিক।

চন্দ্র সি বলেন, ভূতের বেগার খাটিয়ে খাবে?

—ভূতের বেগার নয় কাকা! প্রাইমারিতে সবাই পাস, ইংরেজি শিক্ষা তুলে দিয়েছে পঞ্চম শ্রেণীতেও ইংরেজী নাই ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরেজী বর্ণপরিচয়ে শুরু, নূতন রীতিতে কঠিন পরীক্ষা। আমাদের গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়ের পক্ষে কঠিন

—খুব কঠিন বটে।

—ভাল স্কুল আছে জানি। ইংরেজী মাধ্যম স্কুল আছে জানি কিন্তু সাধারণ স্কুলে, ছেলেমেয়েরা বছর বছর ইংরেজীতে ফেল করছে। ভর্তি হয় কম, ভর্তি হলেও নাম কেটে যাচ্ছে। প্রাইমারি থেকে বাংলা বা অঙ্ক বা ভূগোল বা ইতিহাস কি শিখছে তাও কে খবর রাখে? মানিক টুডুর বাপ বলল, ছেলে পাস করল

কিন্তু সে কি শিখল, আদৌ কিছু শিখল কিনা, তা বোঝার ক্ষমতা বা সময় গোপাল টুডু বা অন্য জাতিবর্গের অভিভাবকদের নেই। কিছু না শিখে সামান্য শিখে কেমন করে ওই ছেলেমেয়েরা উঁচু ক্লাস অবধি পৌঁছবে?

দশ ভাগ পৌঁছবে, নব্বই ভাগ পৌঁছবে না। এরা একুশ শতকের দিকে ধাবমান মিছিলের দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। জমিতে দশ ভাগের মালিকানা, জমিও সন্তানদের অন্নদানে অক্ষম, চাকরি নেই, কাজ নেই।

—সব তো পারি না কাকা। অক্ষম, সামান্য মানুষ। তবে ইংরেজীটা শিখালে তারা যেয়ে জলে পড়ে না।

—হ্যাঁ! অনুমোদন নাই, ঘর মেরামত করতে পারি না, তবু আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়ে তরুণ, পাটাপুতা, বিড়াগ্রামে সগৌরবে ভর্তি তো হচ্ছে।

আমরা মহেশ্বর হাঁসদার কাছেও গেলাম কাকী। তিনি তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, অরগানাইজিং স্কুলে পড়া ভাল হয়। শিক্ষকরা জানে, না পড়ালে অনুমোদন নাই, বেতনও নাই।

বলা যেত, অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুলে হাজারের বেশি বেতন দেন, পড়াশোনা হয় কি? সব স্কুলে শিক্ষক কি স্কুলে আসেন? আদিবাসী ছাত্রের যে তালিকা দেখিয়ে টাকা পায় স্কুল, সে তালিকা কি সত্য?

বলিনি।

সবকিছুই তো এখন রাজনীতির আলোকে দেখা হয়। আমরা যেন বিনা দোষে দোষী। আমাদের কোনও ন্যায্য আবেদনও শোনে না কেউ। চলতে চলতে ধনঞ্জয়ের গর্ব হল। অনুমোদন নেই। তবু তোমার নামিত স্কুলের সতেরো বছর কেটে গেল। রোজ দরজা খুলেছি, ঝাঁটপাট দিয়েছি। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করেছি বই। যে যেখানে আছে, একখানি হলেও বই চেয়েছি।

বইয়ের আলমারিটা রোজ দেখি।

কত বার এই কথাগুলো লিখে দোরে দোরে পাঠিয়েছি তুমি তো জান না।

চাঁপা বলে যায়, ইস্কুল না হলে তুমি বাঁচবেক নাই মাইতো দেওর। আমি বলেছি হতেই হবে।

চোখ বুজে ধনঞ্জয় বলতে পারেন আবেদনের বয়ান।

"মাননীয় —

একটি বিশেষ বিদ্যালয় অনুমোদনের প্রর্থনা...

মেদিনীপুরের শালবাড়ি গ্রামে পরমি সরেন নাম্নী এক দরিদ্র আদিবাসী রমণীর সর্বস্ব দানে ১৯৭১ সালে গড়িয়া ওঠে...

এই বিদ্যালয় না থাকিলে শালবাড়ি, ডাহিপাড়া, ছোট কাড়রা, কুসমা, মাকাল, দাদিরা, রানীসল, কাড়া, ভেড়ামুড়া, হরিণমুড়া, নামোতা, পাতরখুড়া, ছেটেতরন, দিশারায়, চৌদ্দটি গ্রামের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক পর্যায়ের পর আর পড়িতে ..

নিকটতম পঞ্চম শ্রেণী ও তদূর্ধ্ব বিদ্যালয় তরন, পাটাপুতা ও বিড়াগ্রামের দূরত্ব যথাক্রমে......

এই সকল গ্রামের অধিবাসীদের গণস্বাক্ষর ও টিপসহি এই সঙ্গে সংযোজিত...

স্কুলের ছয়টি মাটির ঘর, টালির ছাউনি, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চি আলমারি- চারজন অভিজ্ঞ শিক্ষক-করণিক সহ একজন অশিক্ষক কর্মচারী (তুইজন হইল)-তুই শতাধিক শিক্ষার্থী, বিড়াগ্রাম গ্রামীণ ব্যাঙ্কে, সামান্য স্থায়ী আমানত আছে।

১৯৫০ সালে মেদিনীপুর স্কুল পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করেন। দ্রষ্টব্য D.P.I. MEMO NO··· (ফটোকপি দেখুন)...

স্কুলের পক্ষ হইতে গ্রামবাসীগণ অঞ্চল প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি, জিলা পরিষদ সভাধি···

পুনঃ পরিদর্শন করিয়া অনুমোদন ব্যবস্থা করিবার সকল আবেদনই বৃথা···

এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীতে উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সুযোগ পায়।

লোধা সমেত অন্য গরিব ছাত্ররা, অনুমোদন নাই, অনুদান নাই বলিয়া...

আদিবাসী রমণী পরমি সরেনের সর্বস্ব দানের এই একক দৃষ্টান্তকে সম্মান করিয়া বর্তমান রাজ্য সরকার ·”

গোলকধাঁধায় ঘুরেছি পরমি কাকী।

—“স্কুলের অ্যাস্টে জানান।”

সাতবার জানিয়েছিস্ট স্কুলের অ্যাসেট।

“গ্রন্থাগার ঃ—শিশু ও কিশোর সাহিত্য ১৪৫০, শিক্ষা ও বিজ্ঞান (যথা ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়) ১৫, রেফারেন্স্ বই, ১৫০।

আসবাবপত্র :—চেয়ার নয়টি, টেবিল ছয়টি, আলমারি তুই, বেঞ্চি...

আবাসন ব্যবস্থা ঃ—হস্টেল নাই। জমি আছে, হইতে পারে।

সেনিটারি ব্যবস্থা :—পাকা সেনিটারি শৌচালয় তিনটি। ছাত্র-দের, ছাত্রীদের, শিক্ষক ও অশিক্ষক...

প্রাপ্ত সাহায্য :—সরকার তরফে কিছু মিলে নাই।

ক্রীড়া ব্যবস্থা :—১১০ গজ × ৭০ গজ ক্রীড়াঙ্গন এবং ফুটবল, ভলি, ক্যারম ইত্যাদি...

(বিঃ দ্রষ্টব্য :—এই স্কুলের ছাত্র অনিল পত্র জিলায় স্থান পাই-য়াছে এথোলেটে)।

পানীয় জল :—স্কুলের নিজস্ব পাকা কুয়া আছে।"

জানিয়ে গেছি, জানিয়ে গেছি, পরমি কাকী। ১৯৮৩-তে শেষ জানিয়েছি।

মলয় বলে গেল, অনুমোদন পেলে তোমার কি ?

—আমারই তো সবচেয়ে বেশি এসে যাবে। কতদিনের চেষ্টা, পরমি কাকীর নামটা....

মলয় স্মিত মুখে শুনল। ওর মধ্যে খুব পালিশ এসে গেছে আচারে ব্যবহারে। আমার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করছে না কিন্তু অসীম সৌজন্যে শুনে যাচ্ছে।

ফিশারি আপিসে ভালই কাজ করে। পুখুরিয়াতে জমি কিনেছে। পুখুরিয়া ঝাড়গ্রামের কাছে। ঝাড়গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে। বাড়ি হলেই মাকে নিয়ে যাবে।

—স্কুল অনুমোদন হলে তোমার কাজ তো থাকছে না বেশিদিন। রিটায়ার করার বয়স তো চলে এল।

—রিটায়ার আমাকে করায় কে ? পরমি সরেন স্কুলের জন্যে কাজ আমি করে যাব।

--বাবা! একবার নিজের কথা ভাব। অবৈতনিক শিক্ষা দান। আজকাল কেউ করে ?

--আমি তো করছি। সতেরো বছর সংসার হতে একটা পায়সা নিই না।

—ও তো গরিবের মত বাঁচা।

মলয় খুব হেসে বলল, তুমি বিড়ি খাও, খাদির জামা পর। ছেলেমেয়ে মিশন স্কুলে পড়ছে। ওরা বলে দাদু কেন পুত্তর ম্যান বাবা?

—ঠিকই বলেছে।

—ধর তোমার যদি কিছু হয়…তখন তো এখানে মাকে ফেলে রাখা যাবে না।

—রাখবে কেন, নিয়ে যেও।

—এ সব জমিজমা

—তোমরা আর মা যা মানে হয় কারো।

—দাদুর উইল অনুযায়ী…

—তোমরাই সব পাবে। ঈশ্বর না করুন, তোমার মা যদি আগে যান, আমি সব ছেড়ে দেব। আমার তো একবিঘা জমি আছে, নিজে চাষ করব হাল লাঙল ধার করে, ঘর তুলে নেব, কোচিঙে পড়াব।

—আমার পক্ষে সেটা…

—অপমানজনক হবে? আমি নিরুপায়!

—ঘুষঘাষ দিলে স্কুলটা হয়ে যেত।

—না মলয়। সেটি হবে না।

মমতা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

—ছেলে দিচ্ছে, ভাল কাপড় পর না কেন?

—যাদের সঙ্গে ঘুরি, ভাল কাপড় মানায় না।

—বাবা! ওসব দিন চলে গেছে। রাজনীতি না করলে এখন আর চলে না। মোটা কাপড়, খালি পা, ও নিয়ে রাজনীতি এখন গ্রামেও চলে না।

ধনঞ্জয় বলেছিলেন, ওটাই দরকার। ওটা প্রথম পাঠ মলয়। ভুল কিনা জানি না, সঠিক কিনা তাও জানি না, কিন্তু ভুলতে পারি না, অজয় ব্যাগে মোটা কাপড়, গামছা নিয়ে খালি পায়ে এসেছিল।

—লাভ কি হল?

—সব লাভ একরকম হয় না।

—তুমি তো মারদাঙ্গাও করছ না, একটা স্কুল নিয়ে…

—সব লড়াইও একরকম হয় না। রাজনীতির চিত্র এখন কিরকম, তা দেখ। কিন্তু কেউ বলতে পারবে না, ধনঞ্জয় মাহাতো লড়াই ছেড়েছে। কোন লোধাকে ধরা করল, পণ কেন নাই, পঞ্চায়েতী কুয়া দিবে না কেন, —যে সকল অধিকার কাগজে দাগ, তা আদায় করার জন্য ওদের সঙ্গে রেখে এইসব ছেঁড়া কাজ নিয়ে ছেঁড়া লড়াই আমার। কিন্তু মলয়, এগুলি প্রাথমিক কাজ আমার কাছে। প্রথম পাঠ পড়াই শেষ হল না। তোমার কাছে যেয়ে তোমার পড়া পড়ব, তেমন সময় কি এ জীবনে হবে?

—তুমি পরিবারটাকে দূরেই রাখলে।

—হয়ত পারস্পরিক ছিল ব্যাপারটা। তবে হ্যাঁ, মায়ের জন্য যা কর তাতেই আমি কৃতজ্ঞ। আমি তোমার মাকে তো দিতে পারিনি কিছু। আমার মা বাবার জন্যেও যা করেছে তোমার মা করেছে। ধনী মানী ঘরের মেয়ে ছিল। সরষার তেল মাখেনি, কাঁচা দুধের ননী মাখত। ময়ূরেশ্বর মাহাতোর আদরের মেয়ে ছিল। তোমার মা খড় কুচাত, বাসন মাজত, আমার বুক ফেটে যেত।

মমতা অবাক অবাক।

—মলয় রে! তবু যা হোক তোর বাবা বলল। আমাকে এ জীবনে বলেনি, শুনব ভাবিনি। শুনলাম দুটা ভাল কথা, জীবনে যখন ঝিঙা ফুল ফোটে। বুকের ভিতর কথাগুলা নিতে পারলাম না।

মমতা কান্না চাপতে ভিতরে চলে যান। পরমি কাকী! আমার জীবন বা কিরকম তাই বল। বাবা-মা-স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে, কারো আমি আপনজন হতে পারিনি। তোমার স্কুলে করণিক। আজ অবসর নেবার সময় এসে যাচ্ছে।

স্কুলের সামনে এসে গেট খুলে দাওয়ায় বসলেন। অজয় কি বুঝত? অজয় কি বুঝত না? জানি না। তুমি বুঝতে।

—ইস্কুলটা···

তোমার শেষ কথা।

সাওনার শেষ কথা।

হ্যাঁ কাকী, ইস্কুলটা।

দরজায় দরজায় শুধু প্রত্যাখ্যান। আমাদের সামনে শুধু অন্ধকার। এমন সময়ে মথুরবাবু বলল, আশুতোষকে নিয়ে খুব নাচছে সবাই এখন। তারে এনে একটা সংবর্ধনা দেওয়া উচিত হয়। কলকাতায় নিল তাকে। তার কাছে কলকাতার মানুষজন আসছে। অনেকদিন গ্রামে কিছু হয় না হে!

সে তো তোমাদের জন্যেই মথুরবাবু। গ্রামে তোমরা মানুষ দিয়ে মানুষকে ভাগ করছ। ভাগফলটা তোমাদের ভাগশেষ শূন্য। তুমিও কি তার বিষময় পরিণাম বুঝছ এখন ?

—সানতালপাড়ায় তিন দলে তিনবার বাঁধনা। মাহাতো পাড়ায় বাঁধ না করম কয়েক ঘরে। লধাপাড়া শীতলা পূজা আলাদা করে। ভূমিজরা সিংবোঙা, গড়াই ঠাকুর, কালীপূজা আলাদা করে। আশুতোষকে সংবর্ধনা জানালে অঞ্চলে আমাদের একটা সুনাম হবে। আগে হলে ভাবতাম না। বেটা ঝাড়খণ্ডী কবিতা লিখে। কিন্তু কলকাতায় যখন নাম করে ফেলেছে ··

পরমি কাকী, রাজধানীই সেই মাছের চোখ। যে কোনও অর্জুন সে চোখ বিদ্ধ করলে গ্রাম ভাবে এ জনাকে আদর করা দরকার।

তোমার ইস্কুলেই হয় সংবর্ধনা।

আশু চিরকালই ভাবপ্রবণ। ওকে চামটুর ছেলে পরেশ, যে নাকি ঘোর মার্কোসবাদী, বর্তমানে কমিটি মেম্বার, সে ওকে বলেছে, লধাদের কথা লিখি দুলাইন্ দেন দেখি। ছানাগুলা পঢ়তে পারে নাই, আমরা আজও জঙ্গল ঠেঙাই···

আশু পড়েছিল,

"আজন্ম আরণ্যচারী ছিন্নমূল লোধা নরনারী

কুড়ায় জ্বালানী কাঠ, শিকড়-বাকড় ধন্বন্তরী
রৌদ্র দগ্ধ দ্বিপ্রহরে অর্ধমৃত ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
কন্দ-মূল, ছিঁড়ে-খোঁড়ে, নিদারুণ জঠর জ্বালায়।
আসন্ন প্রসবা নারী, যৌবনের ম্লান যবনিকা,
অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ অনিশ্চিত জীবন-জীবিকা
বাঁচার সংগ্রাম করে সারাদিন বিরামবিহীন
ভূমিহীন ভূমিকায় অপরাধী লোধা অর্বাচীন।
স্বদেশের সংবিধানে, ইতর, তস্কর, ছোট জাত
রান্নাঘরে চুরি করে চুপি চুপি খায় ফেনভাত
প্রহারের ভয়-ডর করে না পেটের তাড়নায়
চোখা চোর কেটে পড়ে : ভুখা চোর ধরা পড়ে যায়...”

তারপরই বলেছিল,

নিরক্ষরা সাঁওতাল জননী হে পরমি, প্রণমি
সর্বত্যাগে মহীয়সী, ধনী মানী সবারে সরমি
এ দানের গরিমারে চিত্রিবে এমন কবি কোথা ?
প্রস্তরের গম্ভীরতা, হৃদয়ে বর্ষার কোমলতা ?
যাহার অনেক বিত্ত, সে নারকী দিতে নাহি জানে...

ভাই সব! মাথায় বাঁধলাম মালা। আর বুকটা আমার ফেটে গেল। আজও এ স্কুল অনুমোদন পায় নাই। এক টাকা দান করলেও বাবুরা দেখে ফটো উঠল কিনা, দূরদর্শন ছবি তুলল কিনা। সাংবাদিকরা ফটাফট লিখে কিনা। এ গুলান নাগরী কৌশল।

পরমি সরেন তা জানত না, মানত না। সে নীরবে দিয়ে গেছে। নীরবে চলে গেছে। কোন রাজনীতিক কানাগলিতে ইস্কুলের বিষয়টি ঢুকে আছে কে জানে!

ভাই সব! আমিও এবার কাঠবিড়ালীটা, সেতুবন্ধনে লাগব। ইস্কূল অনুমোদন পায় নাই, এ বড় লজ্জার কথা হয়ে আছে গো!

ধনঞ্জয় চেপে ধরেছিলেন।

— কি করবি তু ?

— দেখি কি করি ?

ধনঞ্জয়কে আড়ালে নিয়ে বলেছিল, ইস্কুলের কথা ঈশান, মেদিনীপুর বারতা, সবুজ নিশানে অনেক লিখেছি। লিখি নাই, বল তু ?

— লিখছিস।

— কলকাতার কাগজে উঠাব। কলকাতার লোক এনে দেখাব। এক কথা! যেমন বেরাবে, তেমন তোমরা জেরক্স করাবে, উচ্চ শিক্ষা-মন্ত্রীরে যেয়ে ধরবে। 'হ্যাঁ' বাক্য নিয়ে আসবে। তিনি যা বলবে, করবে।

হ্যাঁ কাকী, আশুতোষ তার গুণগ্রাহী, তাকে নিয়ে মাতোয়ারা সাংবাদিককে চুপেচুপে এনেছিল।

গ্রামে ঘোর সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইনি আশুর বন্ধু বলে কাটানো গেল।

ছেলে নয়। আধাবয়সী লোক। মুখই খোলে না, কথাই বলে না। শুধু শুনছিল, লিখছিল, আমাদের কাগজপত্র দেখছিল। মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন।

— এ গ্রাম কি নকশাল আন্দোলনে ছিল ?

— পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল এসেছে ? কি বললেন, অনেকদিন পরে ?

— লোধা উন্নয়নে স্পেশাল টাকা…লোধাপাড়াটা দেখি।

— আশা করি সব ঠিকঠাক খবর দিলেন ?

— পরমি সোরেনের বাড়িটা…

— তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে একবার কথা…

— পরমি সরেনের ছবি একটা…না না, ছেলে ম্যাটার করে না। মেয়েদের ব্যাপারটা এখন পাঠক খাচ্ছে, মানে নিচ্ছে…ও! শী ওয়াজ এ বিউটি!

সব লিখে নিয়ে ফটাফট, ছবি তোলা হয়। তারপর ভাড়া করা জীপ (সাংবাদিক ভাড়া করেছিল) ভোঁ করে ধুলো উড়িয়ে যায়। গুণধর বলে, আশুবাবুর খুব তেল হয়েছে।

—তোদের ভাষা আমি বুঝি না। সে নাম করেছে। যোগ্য সম্মান পাচ্ছে—

—আমাদের সময় ও তো লিখে…

—হ্যাঁ, এক কাগজে লেখে, কুঠারটো উঠাইবাক, হঁ!/জোতদার গুলানের মাথা লামাই দিব্য হঁ!/নয়া সরকার নয়া জোতদার বানাইছে!/—আরেক কাগজে লেখে, ভেস্ জমিগুলান আজ ভূমিহীন দখল লিয়্যাছে মাতারি বাবু!/তুমার তেরঙ্গা কারবার আজ চলবোক নাই!

—এ কি মন্দ লিখে?

—আশুতোষ কবি। কবিতার জন্যে ভাঙা ঘরে থাকে। রোজ বাসায় জুটে না। ধান্দাবাজি, স্যালোর দোকান, ভটভটিয়া করে কবিতা লিখে না।

—বোঝেন তবে! আপনি সব পথ থাকতে কাঙাল, সেও তাই।

হঠাৎ তেতে গুণধর বলে, লধার কথা! সাঁওতালের কথা! ভূমিজ লিয়ে লিখছে নাই।

—ওকেই বলিস। সব লিখবে। অরণ্য পঞ্চালিকা তো শেষ হয়নি এখনো।

পরমি কাকী! আশুতোষ পাথর সরিয়েছিল, জলের ক্ষীণ ধারা এই প্রথম দেখলাম। খবর যেদিন বেরয়। সেদিন আশুতোষ পাঁচ-খানা কাগজ নিয়ে চলে আসে।

—চক্ষু খুলে দেখ্ তুই।

কি আশ্চর্য ছিল সে সংবাদ। অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট। পরমি সরনের ছবি, স্কুলের ছবি। গোবর হাতে চাঁপার সলজ্জ হাসি। সাব হেডিং, ভারতে বিরল মহান দৃষ্টান্ত। অবশ্য রিপোর্টে

তোমার মৃত্যু হয়ে যায় যক্ষ্মায়। বিনা চিকিৎসায়। সাওনা বাস চাপা পড়ে। আমি হয়ে যাই শিক্ষক। চন্দ্রবাবু হয় চন্দ্র ভূমিজ সিং।

তবু আমাদের দুঃখের কথা অনেক লোক জানল।

ভীষণ গাল খেতে হল অঞ্চলে।

—আমাদের উপর তো আস্থা নেই। যাও, ওই প্রতিক্রিয়াশীল বর্জুয়া কাগজের কাছে যাও।

আমরা এবার কোমর বাঁধলাম। চল, কলকাতাতেই যাব।

লালবাড়ির ভিতরে কোনদিন ঢুকিনি। পাস করাইনি গেটে। সাংবাদিকদের চেষ্টাতেই আমরা মন্ত্রী অবধি পৌঁছাতে পারি।

এই প্রথম জানলাম যে ১৯১৯ মধ্যে স্কুল পরিদর্শন হলে জুনিয়ার হাই ক্ষেত্রে সেটাই যথেষ্ট।

—দেখব কথা দিচ্ছি, দেখছি দেখব।

আমরা চলে এলাম পরমি কাকী।

তারপর ?

সেই উত্তরই তো এসেছে গো কাকী।

মন্ত্রী বলেছেন—

—এটা পরিষ্কার যে বিদ্যালয়টি ১৯৭৫-এর পূর্বে স্বীকৃতির জন্য পদ্ধতি অনুসারে আবেদন জানান পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে।

কাকী! তখন কেন স্বীকৃতি দিল না ?

—বিদ্যালয়টির স্বীকৃতি পাবার পক্ষে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় এ কাগজপত্র। এটাই যথেষ্ট।

তারপর ব্যাখ্যা।

নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রতি বছর অর্থ বিভাগের কাছে আবেদন করা হয়। অর্থ বিভাগ যতগুলি বিদ্যালয় স্থাপনে সম্মতি দেয়, শিক্ষা দপ্তর ঠিক ততগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারে।

গত বছর নিতান্ত আর্থিক সঙ্কট জন্য...এ বছর এখনাবধি···নিয়ম এরকম :—